ব্যাচেলর অব এডুকেশন

শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল

Teaching Learning Skills and Techniques

EDBN 1402

রচনা

মোঃ আবুল বাশার
শেখ শাহবাজ রিয়াদ
সুইটি বৃজেট গোমেজ
রিজওয়ানুল হক
মীর আবু সালেহ শামসুদ্দিন

মূল্যায়ন

প্রফেসর মোঃ আজহারুল ইসলাম
প্রফেসর অজিত কুমার দত্ত
খুরশীদ আক্তার

সম্পাদনা

মোঃ আবুল বাশার

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল
EDBN 1402
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0104-5

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	ইউনিট ১: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ পর্যালোচনা	
১.১	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা: মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১
১.২	জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পর্যালোচনা	৮
	ইউনিট ২: শিখন-শেখানোর জন্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ	
২.১	শিখন-শেখানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তাৎপর্য ও এর প্রভাব এবং শিখন-শেখানো সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উপর আলোচনা,পর্যালোচনা ও সংশোধন	১৮
২.২	শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন এবং শিক্ষক হিসেবে পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ	২৬
	ইউনিট ৩: শিক্ষক যোগ্যতা	
৩.১	যোগ্যতার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা , শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা	৩৩
৩.২	বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতা বিবেচনা করা এবং বি,এড শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো পর্যালোচনা করা	৩৪
	ইউনিট ৪: আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা	
৪.১	আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার ধারণা,শোনার দক্ষতা ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলন	৩৯
৪.২	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সর্ম্পকের ভূমিকা ও গুরুত্ব	৪১
৪.৩	ফিডব্যাক গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি:জন হেরন ফিডব্যাক মডেল	৪২
৪.৪	ভূমিকাভিনয় কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানা	৪৬
৪.৫	সাদা-কালো বোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন	৪৯
	ইউনিট ৫: শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা	
৫.১	আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা, কৌশল ও গুরুত্ব	৫১
৫.২	শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ঃ অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও সামাজিক দিক এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিরাপত্তার জন্য কৌশল নির্ধারণ	৫৪
৫.৩	শিক্ষার্থী আচরণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান: ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক	৫৫
৫.৪	প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা অনুশীলন	৫৭
৫.৫	অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কৌশল এবং জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের কৌশল	৫৯
৫.৬	পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ ও সমাধানের উপায় অনুসন্ধান এবং সময় ব্যবস্থাপনা	৬১
	ইউনিট ৬: শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার দক্ষতা	
৬.১	শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিখন সূত্রগুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে রূপান্তর	৬৪
৬.২	শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির পার্থক্য ও শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব	৭৪
৬.৩	মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প, সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয় কৌশল অনুশীলন	৭৬

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬.৪	একক কাজ, পোস্ট বক্স,কার্যকর দল পুনর্বিন্যাস,সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার কৌশল অনুশীলন	৭৯
	ইউনিট ৭: পাঠ পরিকল্পনা	
৭.১	উত্তম ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো শনাক্তকরণ ও অনুশীলন	৮৩
৭.২	প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে একটি বিশ্লেষণধর্মী ও পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	৯৪
৭.৩	ছদ্ম শিক্ষণ ও অনুশিক্ষণের মাধ্যমে একক কাজ, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, অভিনয়, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন	১০০
৭.৪	মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অনুসন্ধান এবং শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশল অনুশীলন: সুস্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা, লিখিত ও মৌখিক	১০৫
৭.৫	শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ: ধারণা ও অনুশীলন এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল	১১১
৭.৬	বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন: উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন	১১৬
৭.৭	বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাস	১২০
৭.৮	ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন বিবেচনা	১২৪
৭.৯	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণের উপায় এবং মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল	১২৭
৭.১০	অসবেল-এর অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায়	১৩০
	ইউনিট ৮: শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ	
৮.১	শিখন সামগ্রী ও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের ধারণা এবং উপকরণ প্রদর্শন ও কার্যকর ব্যবহার	১৩৭
৮.২	শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ: সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ ও সংগঠন	১৪২
৮.৩	শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার এবং উপকরণ সংরক্ষণের উপায়	১৪৩
	ইউনিট ৯: পেশাগতভাবে উন্নয়নের উপায় ও দক্ষতা	
৯.১	শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারণা ও গুরুত্ব এবং পেশাগত উন্নয়নের উপাদান	১৪৬
৯.২	চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন	১৫০
৯.৩	পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা	১৫৯
৯.৪	পেশাগত শিখন সমাজ (পিএলসি) এবং এর গুরুত্ব	১৬০
৯.৫	ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনলিপির প্রয়োজনীয়তা ও উন্নয়ন কৌশল	১৬২
৯.৬	প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিফলন দিনলিপি, পাঠদান অনুশীলন জার্নাল, শিক্ষক প্রশিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	১৬৫
	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	১৭৩

ইউনিট ১ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ পর্যালোচনা

একটা দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দর্পণ সে দেশের শিক্ষানীতি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, করণীয় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে জাতীয় শিক্ষানীতিতে। এছাড়াও সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষার বিভিন্ন দিক যেমন- কারিগরি শিক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া শিক্ষাসহ নানা দিক নিয়ে শিক্ষা নীতিতে দিক নির্দেশনা থাকে। শিক্ষানীতি আমাদের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের দিক নির্দেশক হিসেবেও কাজ করে। এ ইউনিটে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপে বিন্যাস করা হয়েছে-

১.১ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা: মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

১.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর পর্যালোচনা।

১.১ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা: মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষা আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম হাতিয়ার। সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা মানব অভিযাত্রার অনুপ্রেরণা। শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা বা নীতি আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলাই শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণস্পন্দন। শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় উন্নয়নের বাহক হিসেবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণীত হয়েছে। তা প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা সমূহ [রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ধারা-১৭] বিবেচনায় রাখা হয়েছে ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও আর্দশ এবং আমাদের সংবিধানের মূল দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে। সব রকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষানীতির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা অর্জন শিশুর মৌলিক অধিকার। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে যাতে শিশু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ হতে পারে, নব নব অধিকারে নিজেদের নিয়োজিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গঠন করতে পারে তার ইঙ্গিত শিক্ষানীতিতে প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীর মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির [যেমনঃ ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা,সহজ জীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি] বিকাশ ঘটানো, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা, শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করার কথাও শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতা বোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা, শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত দৃঢ় করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা, দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সুবিধা অবারিত করার কথা বলা হয়েছে। আবার শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো, পরিবেশ সচেতনা সৃষ্টি করা, প্রসারমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করার জন্যও নির্দেশনা আছে।

শিক্ষানীতির বিষয়বস্তুকে মোট ২৮টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ভাগ গুলো হলো (১) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (২) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা (৩) বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (৪) মাধ্যমিক শিক্ষা (৫) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা (৬) মাদ্‌রাসা শিক্ষা (৭) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (৮) উচ্চশিক্ষা (৯) প্রকৌশলশিক্ষা (১০) চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা (১১) বিজ্ঞানশিক্ষা (১২) তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা (১৩) ব্যবসায়শিক্ষা (১৪) কৃষিশিক্ষা (১৫) আইনশিক্ষা (১৬) নারীশিক্ষা (১৭) কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা (১৮) বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড এবং ব্রতচারী (১৯) ক্রীড়াশিক্ষা (২০) গ্রন্থাগার (২১) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন (২২) শিক্ষার্থী কল্যাণ ও নির্দেশনা (২৩) শিক্ষার্থী ভর্তি (২৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৫) শিক্ষকগণের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব (২৬) শিক্ষাক্রম,পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক (২৭) শিক্ষা প্রশাসন (২৮) শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ। তাছাড়া সংযোজন-১-এ বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান এবং সংযোজনী -২তে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্যসচিব ও সদস্যদের নাম লেখা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষার মেরুদণ্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা পা, উচ্চ শিক্ষা মাথা এই দুই-এর সংযোগে সৃষ্টি হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ চমৎকারভাবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

নতুন শিক্ষা কাঠামোয় নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, নয়তো অর্জিত বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপঃ

- শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা।
- কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য, বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।
- মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করে প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক জ্ঞান সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার ভিত শক্ত হবে।
- বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর জন্যও যতদিন প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি সমর্থন করা।
- নির্ধারিত বিষয়ে সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা।

কৌশল

শিক্ষার মাধ্যম

১. এই পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে মূলত বাংলা তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য-অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি ইংরেজি মাধ্যমেও শিক্ষা দেওয়া যাবে। বিদেশীদের জন্য সহজ বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

২. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।

৩. ধারাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজন-ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।

৫. মাধ্যমিক স্তরে মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদ্‌রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ।

অবকাঠামো এবং শিক্ষক ও স্টাফ

৬. বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণি খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণিসমূহে পাঠদানের জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়নে অর্থের জোগানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৭. সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৮. বিজ্ঞান-শিক্ষাদানকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি-সংবলিত বিজ্ঞানাগার থাকতে হবে এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থী ও অনগ্রসর অঞ্চল

৯. বিভিন্ন কারণে সংকুচিত সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সম-সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহের অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন

১০. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ (যেমন অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহায়তা (যেমন শিক্ষকের বেতন-ভাতা, বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত

১১. শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ : ৩০-এ উন্নীত করা হবে।

শিক্ষক-নিয়োগ

১২. সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ

১৩. সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন

১৪. দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। উভয় পরীক্ষা হবে সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবং পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

১৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

অন্যান্য

১৬. সকল ক্যাডেট কলেজ মৌলিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ এবং সাধারণ ধারায় পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

১৭. 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন যেহেতু একটি বিদেশি ধারায় হয় সেহেতু 'ও' এবং 'এ' লেভেলকে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তবে উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ দু'টি বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে 'ও'লেভেল উত্তীর্ণকে এস.এস.সি এবং 'এ' লেভেল উত্তীর্ণকে এইচ.এস.সি-র সমমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৮. সংস্কৃত ও পালি বিষয়ে প্রচলিত আদ্য, মধ্য ও উপাধি কোর্সটি প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে সব ধারার জন্য অভিন্ন বিষয় বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ধারা সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক বিষয় সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি আধুনিক শিক্ষা কোর্স প্রচলন করা হবে।

১৯. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশের আলোকে সনাতন পদ্ধতির সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সার্টিফিকেট / উপাধির সমতাবিধান করা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান,ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থ বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ৫টি এইচ.এস.টি.টি.আই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৪টি সরকারি প্রশিক্ষণ কলেজেই বিএড ডিগ্রি দেওয়া হয়। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও দূর শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বিএড ডিগ্রি প্রদান করছে। এছাড়া ১০৬ টি বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। এগুলোতে ভৌতব্যবস্থা, প্রশিক্ষকের মান এবং প্রদত্ত প্রশিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে খুবই নিম্নমানের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং যুগোপযোগী নয়। তাই প্রশিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে দক্ষতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ-

- শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিখন-শিখানো কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগীকরণে সহায়তা দান।
- শিক্ষকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি জাগ্রত করা।
- শিক্ষকদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের জরুরী সমস্যাগুলোর সাথে পরিচিত করা এবং তাদেরসাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করা।
- শিক্ষকদের আচরণিক দক্ষতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা এবং দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।
- শিক্ষণের জন্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং তা ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

- নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা ও কৌশল বৃদ্ধি করা।
- গবেষণাপত্র তৈরি ও প্রতিবেদন পেশের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করা।
- সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক শ্রেণির শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিয়ে পাঠদানে উৎসাহিত করা।
- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ক্ষুদ্রজাতিসত্তা এবং প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের বিশেষ শিখন চাহিদা অনুসারে শিখন সেবা প্রদানের কলাকৌশল অর্জনে সহায়তা করা।
- সমস্যাদি বিশ্লেষণে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সকল স্তরের শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এর সর্বোচ্চ অনুশীলনে উৎসাহিত করা।
- দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন থেকে কার্য সম্পাদনের জন্য শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা।
- গবেষণা কাজে অংশগ্রহণের জন্য আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহিত করা।

কৌশল

১. নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের বুনিয়াদী ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য চারমাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের তিন বছরের মধ্যে যথাক্রমে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন ও বিএড কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ করা হবে।

৩. প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হবে। নতুন কার্যক্রমে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়নের আধুনিক কলা-কৌশল সংযোজন করা হবে। ইন্টার্নসিপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যবহারিক পাঠদানের মেয়াদ দুই পর্যায়ে কমপক্ষে নয় মাস করা হবে (ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য ১৮ মাস মেয়াদী ডিপিএড কোর্স চালু করা হয়েছে)।

৫. সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)এ দেওয়া হচ্ছে এবং এটি চলমান থাকবে। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষককে তিন বছর অন্তর বিষয়ভিত্তিক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বেগবান করার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬. শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকুরির মধ্য ও উচ্চ স্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দকেও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।

৮. দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলোতে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা করা হবে।

৯. প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

১০. প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।

১১. সকল শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হবে যাতে সকল একাডেমিক ষ্টাফ এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে পারেন।

১২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে। কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তা বিশেষ ব্যবস্থায় দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

১৩. বিভিন্ন পর্যায়ের ও ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।

১৪. শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

১৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা হবে।

১৬. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৭. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে নিম্নমানের বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

সংযোজনী - ১

বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিধান

১৭. রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

সংযোজনী - ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। দুই জন কো-অপট করা সদস্যসহ কমিটির চূড়ান্ত গঠন নিম্নরূপ ঃ

কমিটির নামের তালিকা

চেয়ারম্যান	**জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী**
কো-চেয়ারম্যান	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
সদস্য-সচিব	অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা।
সদস্য	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
	অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
	অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক মুহঃ জাফর ইকবাল বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
	অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক ড. জারিনা রহমান খান লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
	অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
	অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা
	জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)
	জনাব মোঃ আবু হাফিজ অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)
	মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা ও সিলেট
	বেগম নিহাদ কবির ব্যারিস্টার, সিনিয়র পার্টনার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস
	অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
	অধ্যাপক শাহীন মাহ্‌বুবা কবীর ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

১.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২

শিক্ষাক্রম শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। "Curriculum" শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Currere থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ Course of study। কারো কারো মতে Curriculum শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ Currer থেকে। এর অর্থ ঘোড়া দৌড়ের পথ। একজন শিক্ষার্থী কী পড়বে, কে পড়াবে, কোথায় পড়বে, কীভাবে পড়বে, শিখন সামগ্রী কীরূপ হবে, কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশনার সমষ্টিতে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়।

সাধারণ অর্থে শিক্ষার অনুক্রমই হল শিক্ষাক্রম। কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষাক্রম হচ্ছে স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা কর্তৃক পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টি যা শিক্ষার্থী একক বা দলীয়ভাবে স্কুলের ভেতরে বা বাইরে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হলো শিক্ষানীতির প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম হিসেবে উপস্থাপিত হওয়া। এটি এমন একটি দলিল যেখানে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ ফলপ্রসূ পাঠদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট পাঠ অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখনফল অর্জন করবে তা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া শিখনফল অর্জনের কৌশল সম্পর্কে এবং কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হলে পাঠদান অধিক ফলপ্রসূ হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাস্তবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থী কী জানে এবং তার ভিত্তিতে আর নতুন কী কী শিখতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তামূলক ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করার ক্ষমতা যাচাইয়ের সাথে সাথে শিখন অর্জন যাচাই করার দিক নির্দেশনাও এখানে রয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মূলত সমসাময়িক কালকে বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। তবে রাষ্ট্রীয় দর্শন ও আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, উন্নত দেশের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম, অগ্রগতি বিবেচনায় রেখে আমাদের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষানীতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি সরকারের সার্মথ্যও বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ পাঁচ বছর অতিক্রম করে বেশ ভালভাবেই এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম,শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের জানা আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষক শিক্ষায়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নিয়ে শিক্ষকগণের আলোচনা,পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখানে মূলত ২০১৭-তে বি.এড কোর্সের শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বৈশিষ্ট্য

- সাধারণ, মাদ্রাসা ও ইংরেজি শিক্ষাধারাসহ সকল ধারার শিক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার এডুকেশন সংযোজনের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয় সংযোজন।
- জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য, তথ্য অধিকার, অটিজম ইত্যাদি বিষয়বস্তু সংযোজন।
- ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয় সংযোজন।
- যুগের চাহিদানুসারে সকল স্তরের প্রচলিত বিষয়াদির বিষয়বস্তু আধুনিকায়ন এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে (ক) হিউম্যান রাইটস এন্ড জেন্ডারস্টাডিজ (খ) পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (গ) হিউম্যান রিসোর্সডেভেলপমেন্ট এবং (ঘ) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি নতুন বিষয়াদি সংযোজন।
- ধর্ম শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান।
- ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান। দেশাত্মবোধ বিকাশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস।
- বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ।

- মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে ব্যবহারিক চারটি দক্ষতা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা শ্রেণিকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন।
- শিখন-কৌশল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল করা অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক,চিন্তা উদ্দীপক ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশের সুযোগ প্রদান।
- যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন,জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস। অর্থাৎ প্রতিটি তত্ত্ব, সূত্র ও নীতি শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক করার সুযোগ প্রদান। হাতে কলমে করে শেখা ও দলগত আলোচনা করে শেখার ওপর গুরুত্ব প্রদান।
- শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি।
- শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান।
- অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন।
- শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ,জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান।
- বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস।
- প্রতি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায়ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি। জাতীয় দিবসসমূহে স্কুল খোলা রেখে দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণ।
- প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বন্ধ করা।
- সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার।(সূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,ঢাকা,২০১২)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর রূপরেখা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামীর শিক্ষা চাহিদার ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে এনসিটিবি মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিস্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে তুরে ধরা হলো:

লক্ষ্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জন সম্পদ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

ক) শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
খ) শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিক গুণাবলি, যেমন- নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সদাচার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নান্দনিকতাবোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও ন্যায়বিচারবোধ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত করা।
গ) মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা।
ঘ) শিক্ষার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুসংহত জ্ঞানের ভিত রচনা তথা এর ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার প্রতি আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম করে গড়ে তোলা।

ঙ) শ্রমের মর্যাদা, কাজের অভ্যাস ও কাজ করতে আগ্রহী হওয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বিকশিত করা যাতে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় ধরনের কাজ সম্পাদনে নৈতিকতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে।
চ) সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রমিত বাংলা ভাষার দক্ষতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করা এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।
ছ) বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নান্দনিক সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সখ্য উপভোগ ও উদঘাটনে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিকশিত করা।
জ) আধুনিক কর্মক্ষেত্র , উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগের প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।
ঝ) শিক্ষার্থীকে গাণিতিক যুক্তি , পদ্ধতি ও দক্ষতার সাথে পরিচিত করানো এবং জীবনঘনিষ্ঠ ও বিশ্বের পারিপার্শ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য গণিতের প্রায়োগিক দক্ষতা বিকশিত করা।
ঞ) শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করা।
ট) শিক্ষার্থী যাতে জীবনমান উন্নয়নের জন্য জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান ও সমাধানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
ঠ) দেশে এবং বহির্বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণের জন্য ঐ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।
ড) খাদ্য ও পুষ্টি, শারীরিক সক্ষমতা, রোগ-ব্যাধি, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, জীবনদক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করা।
ঢ়) শিক্ষার্থীর মনে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সহায়তা করা।
ণ) শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙালি এবং ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর নারী-পুরুষ, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, সংস্কৃতি, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা।
ত) শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি-খেলাধুলা, শরীরচর্চা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা।
থ) জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী ও যোগ্য করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, আধুনিক কর্মক্ষেত্র এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সুদৃঢ় করা।
দ) সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব , সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা।
(তথ্যসূত্রঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,ঢাকা,২০১২)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বিষয় কাঠামো

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে নবম ও দশম শ্রেণির প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট এবং অন্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট। তবে টিফিন বিরতির পরবর্তী পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৪৫ মিনিট। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটি পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট।

সাধারণ শিক্ষা ধারায় নবম - দশম শ্রেণির বিষয়-কাঠামো নম্বর ও সময় বণ্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১. বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২. ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩. গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/ বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৮
	৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬. ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭.শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	মোট	৮০০	২১	৩৩৬	৬৭২

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময়বণ্টন (ক্লাস পিরিয়ড)		
শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. পদার্থবিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০. জীববিজ্ঞান /উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২.জীববিজ্ঞান/ উচ্চতর গনিত/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা / সংগীত/বেসিক ট্রেড/ শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া*	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	১৩০০	৩৬	৫৭৬	১১৫২
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০. ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১. বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	ভূগোল ও পরিবেশ/ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/ কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/ সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	১৩০০	৩৬	৪৭৬	১১৫২
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮.বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯. ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.অর্থনীতি /পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা/ চারু ও কারুকলা/ কৃষিশিক্ষা/ গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/ আরবি / সংস্কৃত/পালি/ সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া *	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট	১৩০০	৩৬	৫৭৬	১১৫২

দ্রষ্টব্য:

- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা যেকোন একটি শাখা নির্বাচন করে নির্বাচিত শাখার আবশ্যিক বিষয়সমূহ নিতে হবে।
- সপ্তাহে ৬ দিন দৈনিক ৬ পিরিয়ড ক্লাশ হবে।
- প্রথম পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৬০ মিনিট এবং অন্যান্য পিরিয়ডের ব্যাপ্তি ৫০ মিনিট হবে।

  ***শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শাখার ও মানবিক শাখার শিক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নিতে পারবে।**

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ : শিখনফল

কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ হল শিখনফল। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী এগুলো আয়ত্ত করে। আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জিত হয়ে থাকে বিধায় একে আচরণিক উদ্দেশ্যেও বলা হয়। শিখনফল পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হয়।

শিখনফল লেখার নিয়ম

১. শিখনফল লিখতে হবে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষকের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। অর্থাৎ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী তাদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য কী কাজ সম্পাদন করতে পারবে, তা স্পষ্ট পরিভাষায় ব্যক্ত করতে হবে।
২. শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিখনফল চিহ্নিত করতে হবে।
৩. শিখনফল সকর্মক ক্রিয়া বাচক শব্দে লিখতে হবে। উপযুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ প্রকাশ করা হয়। যেমন; শিক্ষার্থী ফুলের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। এ উদাহরণে শনাক্ত করা ক্রিয়াপদটি শিক্ষার্থীর এমন আচরণকে প্রকাশ করছে যা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। যার ফলে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হলো কিনা, তা সহজেই পরিমাপ করা যায়।
৪. শিখনফল সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে বিষয়, শ্রেণি ও অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল দেওয়া হয়েছে। যাতে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশীজ এই তিনটি ক্ষেত্রের শিখনফল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে নবম-দশম শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় (বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু) থেকে উল্লিখিত ৩টি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত শিখনফল উদাহরণ হিসেবে ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে তুলে ধরা হলো-

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানা বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভূপ্রাকৃতিক গঠন কীভাবে জনসংখ্যার বিস্তরণে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বাংলাদেশের ভূমি ব্যবহারের ওপর জনবসতি বিস্তারের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় সচেতন হবে এবং অভিযোজনে সক্ষমতালাভ করবে।

(সূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,ঢাকা,২০১২)।

শিক্ষাক্রম ২০১২: শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ অর্থাৎ শিখনফল অর্জন যে কয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২তে শিখনফল অর্জন করানোর জন্য কতগুলো শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এসকল পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সাধারণ ধারণা প্রদান করা হলো।

পদ্ধতি ঃ পদ্ধতি হলো শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠ্যক্রম এগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ, যোগ্যতা, প্রবণতা, কৌতুহল ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষক যে সকল রীতি-নীতি কৌশল বা নিয়ম কানুনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশন করে থাকেন তাকে শিক্ষাদান পদ্ধতি বলা হয়। সুতরাং বলা যায় পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট শিখনযোগ্যতা বা শিখনফল অর্জনকে কেন্দ্র করে শিখন-শেখানো কার্যাবলি সুন্দর ও সুচারুভাবে পরিচালনার সামগ্রিক রূপ।

কৌশল: কৌশল হল শিখন-শেখানো পদ্ধতি বাস্তবায়নের সমুদয় কার্যাবলির সূচক বিশেষ। এটি দক্ষতানির্ভর চেতনা। এটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর্যায়ক্রমিক ধাপ হিসেবে পরিগণিত। পদ্ধতিকে সঠিক ও যথাযথভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করা হয়। শিক্ষণ পদ্ধতি সীমিত সংখ্যক এবং তা পূর্বনির্ধারিত কিন্তু কৌশলের সংখ্যা অসীম এবং তাৎক্ষনিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করেই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি: যে পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা পালন করেন তাকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হয়। এখানে শিক্ষক থাকেন মূখ্য ভূমিকায় আর শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ। এখানে শিক্ষার্থীর চাওয়া-পাওয়া, বুঝা-না বুঝা, ভালো লাগা-মন্দ লাগা ও তার ভূমিকার মূল্যায়ন করার সুযোগ কম।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি : যে পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষার্থীর ভূমিকা মূখ্য পক্ষান্তরে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ তাকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকে। এখানে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, মতামত ধারণার স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং নিজ কাজ করার মাধ্যমে শেখার সুযোগ লাভ করে। এখানে শিক্ষক সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২- এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি ও কৌশলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো:

প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা বা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোন স্থানে প্রদর্শনের সুযোগ থাকতে পারে। যেমন- ভূগোলের ল্যাবরেটরি, সেমিনার কক্ষ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব বাস্তব ধারণা প্রদান । বিষয়বস্তু প্রদর্শনের সময় শিক্ষক যথেষ্ট সক্রিয় থেকে উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় থাকলেও শিক্ষকের কৌশলের কারণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনেকের কাছে প্রদর্শন পদ্ধতি একটি সনাতন পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত হলেও আধুনিক যুগে দক্ষ শিক্ষকের সুনিপুণ কৌশলের কারণে অনেক সময় এটিও একটি সক্রিয় পদ্ধতি হতে পারে।

প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদানের পদক্ষেপসমূহ-

- শিক্ষকের উপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ;
- শ্রেণিকক্ষকে প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত করা;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- উপকরণের দৃশ্যমানতা নিশ্চিতকরণ;
- আর্কষণীয় উপস্থাপন।

প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা

প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধাসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- একসাথে অনেক শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থীদের মাঝে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়;
- বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করার কারণে শিখন-শেখানো আরও আকর্ষণীয় হয়;
- শিক্ষকের শিখন দক্ষতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষার্থীদের শিখন তুলনামূলক টেকসই বা স্থায়ী হয়;
- সুপরিকল্পিতভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়।

দলগত সহযোগিতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি

দলগত সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া

দলে ভাগ হওয়ার পূর্বেই সমবেত ক্লাসে শিক্ষক স্পষ্ট করে দলগত কাজ বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষক দলের একজনকে একটি কাজের জন্য দলনেতা মনোনয়ন দিবেন। পর্যায়ক্রমে দলের প্রত্যেককে দলনেতার দায়িত্ব দিবেন। শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে বসবে। দলের প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তারপর আলোচনা শুরু করবে। একজন কথা বলার সময় অন্যরা মন দিয়ে শুনবে। কথার মাঝে কেউ কথা বলবে না। তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘ বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত হলে দলনেতা ভদ্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। দলের প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। আলোচনার মাধ্যমে তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন করবে।

কারো কথা অপছন্দ হলে বা মনঃপুত না হলে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, পরে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যাবে। তবে রাগ করা বা অশোভন আচরণ করা যাবে না। জোর করে অন্যদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। আলোচনার ফলাফল দলের সিদ্ধান্ত হিসেবে লিখতে হবে এবং সবাইকে মেনে নিতে হবে। পরবর্তীতে সমবেত ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশানুসারে ঐ আলোচনার দলনেতা দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অন্য দলের প্রশ্ন থাকলে দলের পক্ষে যে কোন একজন উত্তর দিবে।দলগত কাজ চলার সময় কোন মতানৈক্য বা সমস্যা দেখা দিলে দলনেতা হাত তুলে শিক্ষকের নির্দেশনা চাইবে।

এছাড়াও শিক্ষাক্রমে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি,অনুসন্ধানমূলক কাজ-এর বর্ণনা রয়েছে। শিক্ষাক্রমের শিখন-শিখানো নির্দেশনা অংশে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশলের উল্লেখ রয়েছে। যেমন- একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দৃশ্যকল্প, ছোট দলে মৌখিক উপস্থাপন, প্রতিবেদন লিখন,প্রশ্ন-উত্তর, পর্যবেক্ষণ, মাঠ জরিপ, ছক পূরণ, মানচিত্র প্রদর্শন, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন অংশগ্রহণ, পোস্টার/ চার্ট প্রদর্শন ইত্যাদি। (সূত্রঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১২)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২: মূল্যায়ন

সাধারণ অর্থে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হলো শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত পূর্বনির্ধারিত শিখনফল শিক্ষার্থী কতটা অর্জন করেছে তা নিরূপণই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। যদিও মূল্যায়ন কথাটির বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন প্রধানত দুই ধারার। যেমন-

(ক) গঠনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন

(খ) সামষ্টিক মূল্যয়ন।

আমরা পাঠ চলাকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীর অর্জন মূল্যায়ন করে থাকি। এ মূল্যায়ন ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন। আবার আমরা নির্দিষ্ট সময় শেষে বা কার্যক্রম শেষে বার্ষিক পরীক্ষা , এসএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করে থাকি। এ ধরনের মূল্যায়ন হলো সামষ্টিক মূল্যায়ন। ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় ধারার মূলায়নেরই প্রয়োজন আছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ-

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিহ্নিত শিখন-দুর্বলতা তাৎক্ষণিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা যেমন- শোনা, বলা, পড়া ইত্যাদি কম সময়ে কম খরচে ও সহজে পরিমাপ করে ধাপে ধাপে নির্দেশনা দেওয়া এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে এসব বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।
- শিক্ষার্থীর অবেগীয় দিকসমূহ বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তার ব্যবহৃত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে বা দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।

শিক্ষাক্রম ২০১২: ধারাবাহিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ তে বাংলাদেশের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের কথা রয়েছে-

- বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন।
- আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

- বিষয়শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন।
- প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ২০%

প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন

ক্ষেত্র	নম্বর
ক) শ্রেণির কাজ	১০
খ) বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ	০৫
গ) শ্রেণি অভীক্ষা	০৫

প্রতি বিষয়শিক্ষক কর্তৃক স্ব-স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০% নম্বরের ভিত্তিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে নির্ধারিত ছকে মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

শ্রেণির কাজ

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের ধরনের তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি মানচিত্র, লেখচিত্র) আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ-এ ধরনের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে তিনটি শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে (বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমূখী শিক্ষা ইত্যাদি) ঐসব বিষয়ে একটি ব্যবহারিক কাজ ও দুটি শ্রেণির কাজের রেকর্ড রাখা হবে।
- বিষয়শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করে প্রতি সাময়িকে (ছয় মাসে) ৩ বার মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

বাড়ির কাজ

- শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে, শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিখন-সহায়তা দেবেন। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক বাড়ির কাজ দেবেন।
- লক্ষ্য রাখতে হবে বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করায় উৎসাহিত না করে। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন বাড়ির কাজে থাকে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্সে শিখন-শেখানো কার্যক্রম কলামে প্রদত্ত বাড়ির কাজ নমুনা হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে।
- প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজগুলো এমন হবে যা শিক্ষার্থী ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে। শিক্ষক প্রতি সাময়িকে শ্রেণিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাড়ির কাজ দেবেন। তবে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দুটি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের জন্য তিনটি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দুটি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির অন্যান্য বিষয়ের জন্য তিনটি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে প্রতি সাময়িকে দুটি বাড়ির কাজের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত বাড়ির কাজগুলোকে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের বাড়ির কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ

- অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমস্যা-সমাধান দক্ষতা ও চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে। অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিনের প্রয়োজন হতে পারে। শিক্ষক বিষয়টি নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানমুলক কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তথ্য সংগ্রহের পর্যবেক্ষণ টুল্‌স/সিডিউল/প্রশ্নমালা প্রণয়ন শিক্ষক করে দেবেন। তথ্য সংগ্রহ অনুসন্ধান কাজের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শিক্ষার্থী নিজেরা সম্পন্ন করবে। তথ্য সংগ্রহ যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রতিবেশী এবং নিকট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তথ্য সংগ্রহে শিক্ষার্থী যেন ব্রিবতকর অবস্থায় না পড়ে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। বিজ্ঞান বিষয়সমূহের জন্য তথ্য সংগ্রহ গবেষণাগারে পরীক্ষণের মাধ্যমে হতে পারে। অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরুর সমগ্র প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেবেন।

- প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষার্থী তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল প্রণয়ন এবং ফলাফলের ওপর মতামত দেবে। সমগ্র কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। প্রতিবেদনে সম্পন্ন কাজের বর্ণনা থাকবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা শিক্ষক দেবেন। অনুসন্ধানমূলক কাজ শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে সম্পন্ন করবে। তবে তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল প্রণয়ন, ফলাফলের ওপর মতামত প্রদান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে। এ কাজের মূল্যায়ন হবে একক মূল্যায়ন। নবম ও দশম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সাহায্য নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। শিক্ষক যে কোনো নম্বরের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ দিতে পারেন। তবে এতে প্রাপ্ত নম্বরকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বরে রূপান্তর করে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। রূপান্তরের পর ভগ্নাংশ নম্বর হলে ভগ্নাংশ নম্বর হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে অভীক্ষা নেওয়া হবে। তবে অধিক নম্বরপ্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বর রেকর্ড রাখা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখানোর পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ের ধারাবাহিক কাজ আছে ঐসব বিষয়ে দুটি ব্যবহারিক ও একটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনটি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড রাখা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের মানদন্ড শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময়ে ঐ বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কাজকর্ম যথারীতি চলবে।

আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তির উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী শুধু মেধাবী হলেই হবে না। তাকে ভালো মানুষও হতে হবে। ভালো মানুষের গুণাবলি অর্জন করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করতে হবে। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মকান্ডে মূল্যায়ন করা যায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বহু কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবে। এগুলো হলো দৈনিক সমাবেশ, খেলাধুলা ও ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম , শিক্ষা সফর ও পরিদর্শন, জাতীয় দিবস উদযাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বয়েজ স্কাউটস গার্লস, গাইড, বিএনসিসি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যক্রম ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের আচরণ ও মুল্যবোধ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে আসা যায়। শিক্ষাক্রমে আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যে গুণাবলি ও মূল্যবোধ পরিমাপের আওতায় আনা হয়েছে সেগুলো হলো- নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব, সততা, শৃঙ্খলা,সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা ও সময়ানুবর্তিতা। শ্রেণিশিক্ষক অন্যান্য বিষয়শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষে ছয় মাসব্যাপী দুটি সাময়িকে ভাগ করা হবে। প্রতি ছয় মাসে এক সাময়িক হিসাবে প্রতি শিক্ষা বছরে দুটি সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি সাময়িক পরীক্ষা শেষে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরকে একত্রিত করে দুটি সাময়িকে পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের সমন্বয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি বা কার্যক্রমে উন্নীত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির নির্দেশনা অনুসারে সংগঠিত হবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে বিষয়শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষাক্রমে প্রদত্ত অধ্যায়সমূহকে দুটি সাময়িকের জন্য বণ্টন করবেন। বিদ্যালয়ের কার্যদিবসের পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে অধ্যায়সমূহকে দ্বিতীয় সাময়িকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। তবে অষ্টম ও দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে (জেএসসি, এস.এস.সি) এই নির্দেশনা প্রযোজ্য নয়। বিষয়শিক্ষক সে অনুসারে পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সাময়িক শেষে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা শিক্ষাক্রমে বিষয় এবং পত্রের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বরে হবে। উল্লেখ্য যে,শিক্ষাক্রম রূপরেখার বিষয়কাঠামোতে বিষয়ের পূর্ণ নম্বর দেওয়া আছে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের প্রশ্ন থাকবে। একটি হচ্ছে বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অপরটি হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রে তিন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে। এগুলো হচ্ছে (ক) সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (খ) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং (গ) অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন। বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার চার স্তরের প্রশ্ন আনুপাতিকহারে থাকবে। সকল অধ্যায়কে পরীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পূর্বে নির্দেশক ছক তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে একটি উদ্দীপক থাকবে এবং উদ্দীপকের সাথে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টি দিয়ে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা) যাচাই করা হবে। নম্বর প্রদান নির্দেশিকা অনুসরণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বলতে কী বোঝায়?

২. মাধ্যমিক শিক্ষা কী?

৩. শিক্ষাক্রম-এর ধারণা দিন।

৪. শিখনফল কী?

৫. পদ্ধতি ও কৌশল বলতে কী বোঝায়?

৬. মূল্যায়ন কী?

৭. ধারাবাহিক মূল্যায়ন কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো লিখুন ।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২- এর আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৪. মূল্যায়ন কী? ধারাবাহিক মূল্যায়নের ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ২ : শিখন-শেখানোর জন্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

বিশ্বাস মূল্যবোধের প্রথম সোপান। ধর্ম ও বিশ্বাস যেমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তেমনি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বাস ছাড়া যেমন ধার্মিক হওয়া যায় না তেমনি বিশ্বাস ছাড়া মানুষও হওয়া যায় না। যে মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না এবং যে মানুষ নিজে বিশ্বাসী নয় সে কোন মানুষই নয়। মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠেছে সেদিন যেদিন সে বিশ্বাস করেছে যে আমি মানুষ। স্রষ্টাকে বুঝতে হলে তাঁর সৃষ্টিকে বুঝতে হবে। সবার আগে বুঝতে হবে নিজেকে। নিজেকে বোঝা মানে বাস্তবকে বোঝা, বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে জীবন ও জগৎকে বোঝা এবং সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করা। মানুষের মানবতা বা মূল্যবোধ গড়ে ওঠে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। কোন সমাজে মানুষের বিশ্বাস কতটা আলোকিত তা দৃশ্যমান হয় সেই সমাজে উন্নত মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে। শিখন-শেখানোর জন্যে বিশ্বাস ও মূলবোধের বিষয়বস্তুকে এ অধ্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যাস করে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ শিখন-শেখানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তাৎপর্য ও এর প্রভাব এবং শিখন-শেখানো সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংশোধন;

২.২ শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন এবং শিক্ষক হিসেবে পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ।

২.১ শিখন-শেখানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তাৎপর্য ও এর প্রভাব

কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে। মানুষের ধর্মীয় অনুশাসন ও মূল্যবোধও বিশ্বাসকেন্দ্রিক। বিশ্বাস মানুষের জীবনাচরণে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বাসের সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিও জড়িত। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সাথে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে তার আচরণে ও মানসিকতায় মানবিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দেশীয় মূল্যবোধের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মূল্যবোধ শিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণেও প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এ তিনটির মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে যা শিক্ষার্থীকে একজন পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করার জন্যে বিশেষভাবে সহায়ক। এখানে শিখন-শেখানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধের তাৎপর্য ও এর প্রভাব এবং শিখন- শেখানো সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংশোধন সম্পর্কিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বাস

বিশ্বাস মানুষের মনের একটি বিমূর্ত ধারণা। শিশুর জন্মের পরেই তার মনে এ ধারণা জন্মাতে শুরু করে। মা-বাবা বা অন্যান্য যারা শিশুর সেবাযত্ন করেন, তারা যদি স্নেহ-মমতার সাথে, সঠিকভাবে তার চাহিদা পূরণ করতে পারেন, তবে শিশুর মধ্যে বিশ্বাসের প্রথম অনুভূতি জন্মাতে থাকে। একে মনোবিজ্ঞানী এরিকসন বলেছেন মৌলিক বিশ্বাস।

কোন ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, রীতি-নীতি প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। আমরা কোন কিছুতে বিশ্বাস করি, কারণ-

- সেটি দেখেছি, পর্যবেক্ষণ করেছি, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।
- এমন কারোর কাছে বিষয়টি শুনেছি যাকে অবিশ্বাস করা যায় না।
- এমন একটি ঘটনা যা কোনভাবেই অবিশ্বাস করা সম্ভব না।

বিশ্বাস মানুষের মনের এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যা তাকে কোন কিছুর প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যেমন ধরা যাক, আপনার একান্ত পরিচিত লোক আপনার কাছে দুই হাজার টাকা ধার চাইলেন। তিনি এক মাস পরে টাকাটি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এক মাস পরে ঐ ব্যক্তি আপনাকে টাকাটি ফেরত দেবেন কি-না এ ব্যাপারে আপনার সরাসরি জানা নেই। যে লোকটি আপনার কাছে ধার চেয়েছেন হয় তাকে ধার দেবেন না হয় ধার দিতে অসম্মতি জানাবেন। ধার দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে আপনি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন?

যেহেতু টাকা সত্যিই সে ফেরত দেবে কি-না এ ব্যাপারে আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই সেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি তাকে যতটুকু জানেন তারই আলোকে যদি আপনার মনে হয় যে, লোকটি প্রতিশ্রুতি পালন করবে তবেই আপনি তাকে টাকা ধার দেবেন। এক্ষেত্রে ধার দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হলো বিশ্বাস।

তার অতীত আচরণ থেকে যদি আপনার এ বিশ্বাস হয় যে, টাকাটা সে ফেরত দেবে না তাহলে আপনি তাকে ধার দেবেন না। আপনি যে তাকে অবিশ্বাস করলেন এটিও পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই। সুতরাং এটিও বিশ্বাস। এক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাস হল- সে টাকা ফেরত দেবে না।

সুতরাং বলা যায়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই এমন কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে, যে পরোক্ষ জ্ঞান বা ধারণার মাধ্যমে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা-ই বিশ্বাস।

বিশ্বাসের অবস্থা

উল্লিখিত উদাহরণের ভিত্তিতে বিশ্বাসের তিনটি অবস্থা হল

১. **ইতিবাচক বিশ্বাস**

   এক্ষেত্রে বিশ্বাস হচ্ছে, লোকটিকে ধার নেওয়া টাকা ফেরত দেবে।

২. **নেতিবাচক বিশ্বাস**

   লোকটি ধার নিলে টাকা ফেরত দেবে না। এটিকে নেতিবাচক বিশ্বাস হিসেবে গণ্য করা যায়।

৩. **সন্দেহজনক বিশ্বাস**

   লোকটিকে টাকা ধার দিলে সে টাকা ফেরত দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

বিশ্বাসের কারণ

বিভিন্ন কারণে বিশ্বাস অর্জিত হয়। নিচের মাইন্ড ম্যাপে তা তুলে ধরা হলঃ

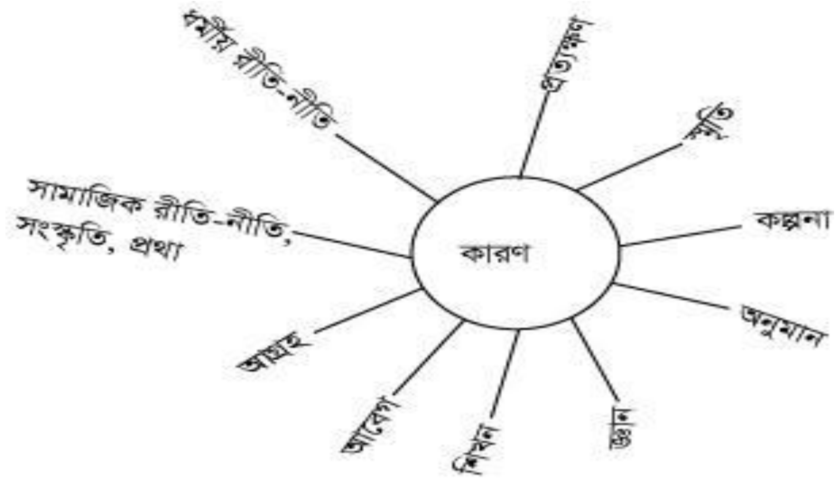

চিত্র ১: বিশ্বাসের কারণের মাইন্ড ম্যাপ।

বিশ্বাসের কারণসমূহ নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল–

প্রত্যক্ষণ

সাধারণভাবে প্রত্যক্ষণ হল, পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন কিছু দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া এবং স্বাদ গ্রহণ করা। সুতরাং আমরা নিজেরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি তা আমরা বিশ্বাস করি।

স্মৃতি

কোন ব্যক্তির স্মৃতিতে সংরক্ষিত অতীত ঘটনাবলি তার বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করে।

কল্পনা

মানুষ যখন কিছু কিছু কল্পিত বিষয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পায় তখন তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

অনুমান

কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষ যা অনুমান করে যখন বাস্তবে সেটি ঘটে যায় তখন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হয়।

জ্ঞান

জ্ঞান বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে ঐ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটাতে সক্ষম বলে অন্যরা বিশ্বাস করবে। আবার যার শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আছে তিনি আণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্বাস করবেন।

শিখন

ব্যক্তি যে বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সে শিখনের ভিত্তিতে পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে বলে মানুষ বিশ্বাস করে।

আবেগ

ক্রোধ, ভয়, শ্রদ্ধা মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মায়। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ থাকলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগই সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। ভীরু মানুষ অবাস্তব বিষয়ে সহজেই বিশ্বাস করে। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে বিশ্বাস করে।

আগ্রহ

কোন ব্যক্তির যে বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বেশি ঐ বিষয়ে সে বেশি সময় ও শ্রম দেয়। যেমন- যার বিদেশে চাকরি করার আগ্রহ আছে সে-ই আদম বেপারিকে বিশ্বাস করবে।

সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি, প্রথা

বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বংশ পরম্পরায় আমরা সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি, প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাকি, যার পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে না।

ধর্মীয় রীতি-নীতি

ধর্মীয় রীতি-নীতিতে আমরা বিশ্বাস করি বলেই তা পালন করে থাকি অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি।

বিশ্বাসের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক

আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে থাকি। তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন-

- শৈশবে কে বাবা তা মায়ের কাছে শুনে বিশ্বাস করতে হয়েছে।
- বাংলা ভাষা শেখার জন্য অ, আ,ক, খ এবং ইংরেজি ভাষার জন্য A, B, C, D তে বিশ্বাস করতে হয়েছে ।
- শেখার জন্য শিক্ষণের কথা, বই পুস্তকের কথা বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যে বিশ্বাসী হতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, শিক্ষার সাথে বিশ্বাসের সর্ম্পক রয়েছে।

মূল্যবোধ

সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন আমাদের সকলেরই কাম্য। আর প্রকৃত সুখ আসে জীবনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও সঠিক চর্চার মাধ্যমে। মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Value এটি গঠিত হয়েছে তিনটি ল্যাটিন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে। শব্দগুলো হচ্ছেঃ VALE (অর্থাৎ strength বা শক্তি), VAL (অর্থাৎ worth বা মূল্য) এবং VALU (অর্থাৎ valor বা সাহস, পরাক্রমা, বিক্রম, শৌর্য)। সামষ্টিকভাবে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে ‘সব উত্তম জিনিস’।

কাজেই মূল্যবোধ কথার অর্থ মূল্যবান, মর্যাদাবান বা শক্তিশালী হওয়া। আমার জানা, পরিচিত বা নিজের আয়ত্তে যা-কিছু আছে, তার চেয়েও অধিকতর মূল্যবান, যা কিছু সঞ্চয় করে রাখার মত তা-ই মূল্যবোধ।

জন্মের পর থেকে শিশুর জীবনের বহুমুখী বিকাশ হয়। এই বিকাশের লক্ষণ প্রকাশ পায় ব্যক্তির আচরণের মধ্যে। আচরণবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায়, শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার জন্মগত আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনতে থাকে। এই পরিবর্তিত নতুন আচরণকে বলা হয় অর্জিত আচরণ। এই অর্জিত আচরণগুলো সৃষ্টি করে, শিশু বা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত

কতগুলো অর্জিত জৈব-মানসিক প্রবণতা । যেমন- বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু কতগুলো অভ্যাস গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতগুলো স্থায়ী অনুরাগ গড়ে ওঠে। আরও পরে সেন্টিমেন্ট, মনোভাব ইত্যাদি জৈব-মানসিক প্রবণতাগুলো গড়ে ওঠে। পরিণত বয়সে এসব জৈব-মানসিক প্রবণতাগুলোর অভিজ্ঞতার ফলে সমন্বয় ঘটে। এ ধরনের সমন্বয়ের ফলে, যে সর্বশক্তিসম্পন্ন জৈব-মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে, তা ব্যক্তির সবরকম আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই জৈব-মানসিক সংগঠনই হল মূল্যবোধ।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

জীবনের বিভিন্ন স্তরে আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের মূল্যমান বা আর্দশমান থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং, ব্যক্তিজীবনের মূল্যবোধ, তার আচরণক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে ভিন্নরূপ গ্রহণ করতে পারে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন জীবনের প্রত্যেকটি মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দুটি দিক রয়েছে। একটি হল তার প্রকাশমান দিক, যাকে আচরণমূল্যে পরিমাপ করা যায়। অপরটি হল-তার আন্তরিক দিক, যাকে তাৎক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। মূল্যবোধের এই আন্তরিক দিকটিকে জীবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন, শিক্ষা যেহেতু একটি আদর্শ সামাজিক প্রক্রিয়া, সেহেতু তার একমাত্র দায়িত্ব হওয়া উচিত, মূল্যবোধের এই আন্তরিক দিকটি বিকাশের চেষ্টা করা। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তত ছয় ধরনের মূল্যবোধ বিকাশের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এগুলো হল- (১) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ (Economic Value), (২) সামাজিক মূল্যবোধ (Social Value),(৩) শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ (Physical and Recreational Value), (৪) নৈতিক মূল্যবোধ (Moral Value), (৫) সৌন্দর্যের মূল্যবোধ(Aesthetic Value), (৬) বৌদ্ধিক মূল্যবোধ (Intellectural Value), (৭) ধর্মীয় মূল্যবোধ (Religious Value)।

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

সাধারণভাবে যেসব বস্তুর বিনিময়ে অর্থ লাভ করা যায় সেসব বস্তুর আর্থিক মূল্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেসব বস্তুর আনন্দ প্রদানের সক্ষমতা আছে সেগুলোকে আর্থিক মূল্যসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে বস্তুসামগ্রীর বা জীবন উপভোগের সংযুক্তি আছে বলেই তার আর্থিক মূল্য রয়েছে। বস্তুজগতের সঙ্গে আনন্দানুভূতির সংযোজন প্রয়োজন। আর এ সংযোজনের জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ। সুতরাং পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে উপভোগ্য বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আনন্দানুভূতির সংযোগ স্থাপন করে ব্যক্তিজীবনে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায়। ব্যক্তির আর্থিক কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশ পায় । এজন্যেই শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

সামাজিক মূল্যবোধ

যথাযথ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ওপর মানুষের সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন নির্ভর করে । যে ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সমাজে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম তিনিই সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত। মনোবিজ্ঞানীগণ মনে করেন,ব্যক্তির আন্তরিক মূল্যবোধের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যথাযথ সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ করা দরকার। যেমন বন্ধুত্ব বলতে আমরা যে সম্পর্ককে বুঝাই তার মধ্যকার মানসিক সন্তুষ্টির মূলে আছে ব্যক্তির এ ধারণার প্রতি এক মূল্যবোধ। একে বলা হয় বন্ধুত্বের মূল্যবোধ। তেমনি স্নেহ, ভালবাসা এগুলো একেকটি সামাজিক মূল্যবোধ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি সমাজ সম্পর্কিত কতগুলো মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায় তবে সেগুলোর প্রভাবে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে সেইসাথে তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের দক্ষতারও উন্নয়ন ঘটবে।

শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ

মানুষের জীবনের বিভিন্ন রকম চাহিদার মধ্যে জৈবিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিজীবনে এসব জৈবিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলো এমনভাবে পরিতৃপ্ত হতে হবে যাতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আদর্শ পথে হয় এবং সবশেষে ব্যক্তি আদর্শ জীবনের অধিকারী হতে পারে। এজন্য ব্যক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে এসব শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পরিতৃপ্ত করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। তবেই এ ধরনের কার্যাবলি ব্যক্তিজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং শারীরিক ও বিনোদনমূলক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

নৈতিক মূল্যবোধ

জীবন চলার পথে ব্যক্তি তার কাজের পথ স্বাধীনভাবে বাছাই করে থাকে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যক্তির কী করণীয়, কী করণীয় নয় সে বিষয়ে প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ব্যক্তির এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তার জীবনের সফলতা বা ব্যর্থ হওয়া নির্ভর করে। তাছাড়া এই সিদ্ধান্তের যথার্থতার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়। যে ধরনের মূল্যবোধের মাধ্যমে এই ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার করা যায়, তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলা হয়। নৈতিক মূল্যবোধ জাগরণের মাধ্যমে, ব্যক্তি সারা জীবন তার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আচরণগত সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। জীবন-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ভাল-মন্দ বা উচিত-অনুচিত বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে এই মূল্যবোধগুলো কেন্দ্রিভূত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। আবার অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এমন ধরনের অভিজ্ঞতার অনুশীলন করাতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো জাগ্রত হয়। এই অর্থে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করা শিক্ষার অন্যতম দায়িত্ব।

সৌন্দর্য সম্ভোগের মূল্যবোধ

এক বিশেষ ধরনের অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতা-ই হচ্ছে সৌন্দর্য সম্ভোগ। এ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। সৌন্দর্য সম্ভোগ তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা কোন বস্তু, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে পূর্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এককভাবে প্রত্যক্ষ করি এবং তার ওপর আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রয়োগ করি। বস্তুজগতে এভাবে প্রত্যক্ষণ, উন্নত ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক। আর এজন্য যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলে সৌন্দর্য সম্ভোগের মূল্যবোধ।

বৌদ্ধিক মূল্যবোধ

শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Development) । সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াকেই বৌদ্ধিক বিকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু, মানুষের জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল যে, কোন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জ্ঞানার্জনে সম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিজীবনে বৌদ্ধিক বিকাশের প্রকৃত তাৎপর্য সত্য অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগ্রত করা। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয় তখনই ব্যক্তিজীবনের বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন করা যায়। দার্শনিকরা বলেছেন, ব্যক্তি যখন জ্ঞানের সামগ্রীর মধ্যে আনন্দানুভূতি লাভ করবে, তখন তার মধ্যে বৌদ্ধিক মূল্যবোধ (Intellectual Value) জাগ্রত হবে। আর ব্যক্তি তখনই সত্যের অনুসন্ধান বা প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে যখন তার মধ্যে বৌদ্ধিক মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে, পাঠ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান পাওয়ার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ হয়। আর এই ধরনের বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থী জীবনব্যাপী জ্ঞানানুসন্ধানে উৎসাহিত হয়। তাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বৌদ্ধিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ

সবশেষে, মানুষের আচরণে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব ব্যাপক। যখন কোন বস্তুকে সর্বশক্তিমান বা ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে মহান হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তখনই তাকে বলা হয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (Religious Experience) বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (Spiritual Experience)। এই জাতীয় অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বিস্তৃত এবং উদার। বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা অর্জন করার এই ধরনের ক্ষমতাকে ব্যক্তির চারিত্রিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থীরা যখন কতকগুলো মৌলিক সার্বজনীন বিশ্বাসের দ্বারা নিজের আচরণকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে তখনই তাদের চারিত্রিক বিকাশ সাধন সম্ভব হবে। তাই বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রচেষ্টাই হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। এজন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (Spiritual Experience) বিকশিত হয় সেদিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

শিক্ষা এবং মূল্যবোধের বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যথাযথ শিক্ষা, ব্যক্তিজীবনে আদর্শ মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক। কেননা, ব্যক্তিজীবনে মূল্যবোধের বিকাশ সব সময় অভিজ্ঞতা নির্ভর। মূল্যবোধের বিকাশ কেবল প্রথাগত শিক্ষাকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, কারণ ব্যক্তি সারা জীবনই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। একারণে বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ সময়ের কথা বিবেচনা করে, সঠিক কী মূল্যবোধ বিকাশের প্রচেষ্টা করা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মূল্যবোধের দুটি দিক আছে- ব্যক্তিগত (Subjective) ও বস্তুগত (Objective) দিক। কখনও আমরা মূল্যবোধ বলতে ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে বুঝাই, আবার কোন সময় বস্তুর গুণ বা ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে (Behavioral Characteristic)

বুঝাই। মনোবিদ ও শিক্ষাবিদগণের মতে, মূল্যবোধের এই দুটি দিক ব্যক্তিজীবনে পর্যায়ক্রমে আসে। প্রকৃত মূল্যবোধের বিকাশ হয় বস্তুগত অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উত্তরণের মাধ্যমে। সে কারণে বিদ্যালয়ে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্রম অনুসরণ করা উচিত। অর্থাৎ মূল্যবোধ বিকাশের জন্য প্রথমত: শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্তভাবে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করাতে হবে। দ্বিতীয়ত: শিক্ষার্থীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা তাদের পাঠ্যক্রম থেকে লাভ করা অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবনে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। অভিজ্ঞতার পুণর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সেগুলোর সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে সেগুলোকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করবে।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংশোধন

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ভূমিকা রয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে উভয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গুরুত্ব রয়েছে। একজন শিক্ষকের বিশ্বাস তার পেশাগত কাজে তাকে অনুপ্রেরণা যোগায়, আবার এই শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধই একজন শিক্ষার্থীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে। নিম্নে শিখন -শেখানো সম্পর্কিত শিক্ষকের কতিপয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস উল্লেখ করা হল –

- স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস;
- শিক্ষকের আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস;
- নিজ পেশা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা, বিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি;
- শিক্ষকতা পেশায় বিষয়জ্ঞানের সাথে সাথে এর প্রয়োগ এবং পদ্ধতিগত ও ব্যক্তিগত কলাকৌশল ব্যবহার;
- শিখনের অনুকূল পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ এ কথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে ;
- শিক্ষক সঠিক ও শুদ্ধভাবে পড়াবেন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সম্ভাষণ, মৌখিক অভিব্যক্তি, শারীরিক ভাষা, উপকরণের ব্যবহার, ব্যবহৃত উদাহরণ, প্রশ্ন করার দক্ষতা, উত্তর আদায়ের দক্ষতা, বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার দক্ষতা ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারলে শিখন অবশ্যই আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ হবে;
- শিক্ষার্থীর মেধা যতটুকুই থাকুক শিক্ষক তার ব্যক্তিগত কলাকৌশল প্রয়োগ করে সহজেই শিক্ষার্থীদের মন জয় করে তাদের পাঠে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং দীর্ঘক্ষণ তা ধরে রাখতে পারেন ;
- শিক্ষকতা পেশার জন্য শিক্ষকের সর্বপ্রকারের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি থাকতে হবে।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও দায়িত্ব

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা;
- সকল শিক্ষার্থীর শেখার সক্ষমতা রয়েছে, শিক্ষকের দায়িত্ব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- শেখার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম অংশগ্রহণমূলক ও প্রায়োগিক হতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদেরকে আত্মবিশ্বাসী, সৃজনশীল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলতে শিক্ষক নিজে তা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহী করে তোলা;
- শিক্ষার্থীরা যেন তাদের অভিজ্ঞতা, কল্পনা, তথ্য ও প্রয়োগকে সমন্বিত করতে পারে এজন্য শিক্ষককে পরিকল্পনা ও উদ্দীপনা দিতে হবে;
- শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখবে, শিক্ষক তাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন;
- কার্যকর পাঠ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন;
- শিক্ষক তার পেশাগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবেন;
- শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিজেও কিছু শিখে থাকেন, তাই বিভিন্ন পাঠে তিনি নিত্য নতুন কৌশল ব্যবহার করবেন;
- পাঠে সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত শিক্ষকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কতিপয় বিশ্বাস থেকে শিক্ষকের মধ্যে যেসব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তা নিম্নরূপঃ

- নিয়মানুবর্তী হওয়া;
- পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়া;
- প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা;
- নিয়মিত ডায়েরি লেখা ও অনুসরণ করা;
- ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে তদনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়া;
- শিক্ষার্থীর মতামতের গুরুত্ব দেওয়া;
- শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের প্রশংসা করা;
- নম্বর প্রদানে নিরপেক্ষ থাকা;
- বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা করা;
- সময়ের প্রতি সচেতন হওয়া;
- সর্বদা সত্য কথা বলা
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর কতিপয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিম্নরূপঃ

- নিয়মানুবর্তী হওয়া;
- কার্যকর শিখনের জন্য নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকা;
- শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষককে শ্রদ্ধা,সম্মান ও অনুসরণ করা;
- শ্রেণিতে মনোযোগী থাকা ;
- জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে অন্যকে সেবার মনোভাব গড়ে ওঠে;
- শিক্ষা মানবীয় গুণাবলি তৈরি করে;
- শিক্ষকের নির্দেশানুযায়ী নির্দেশিত কাজ যথাসময়ে করা উচিত;
- কৃতিত্ব অর্জনের জন্য নিয়মিত পড়ালেখা করা প্রয়োজন;
- শিক্ষক যা বলেন মঙ্গলের জন্যই বলেন;
- নান্দনিক সচেতনতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি।

শিখন শেখানো সম্পর্কিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংশোধন

শিখন শেখানো সম্পর্কিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ওপর শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক ৫/৬ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কয়েকটি দল গঠন করবেন। শিখন- শেখানো কার্যক্রমে তাদেরবিশ্বাস ও মূল্যবোধ কী কী হতে পারে তা তারা পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিরূপণ করবেন। এরপর তারা তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করবেন। সব ক'টি দলের উপস্থাপন শেষে শিক্ষক এ বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করবেন এবং ফিডব্যাক প্রদান করবেন তথা সংশোধন করবেন।

আধুনিক যুগে মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছে। আর এ সংকট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্তমান মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবনের চাহিদার সংঘাতের ফলেই সৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে মূল্যবোধই সৃষ্টি করি না কেন, পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনে পরিবেশের সাথে সংঘাতের সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর এজন্যই মূল্যবোধেরও সংকট হবে। ব্যক্তিজীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় এক বিশেষ ধরনের অভিযোজন সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন শিক্ষক-শিক্ষার্থী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও থাকতে হবে। পরিবারে পিতামাতা, বড় ভাইবোন, গুরুজন যারা রয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই সমাজে এটি প্রতিফলিত হবে। কেউ যখন তার পিতামাতা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা,সম্মান প্রদর্শন করেন তখন তা তার সন্তানের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। পরিবারে শিশুটি যা শিখে এসেছে তার অনুশীলন বিদ্যালয়ে না হলে তখনই দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সৃষ্টি হয়। একইভাবে সে বিদ্যালয়ে যে মূল্যবোধ শিখে আসে তা পরিবারে ও সমাজে অনুশীলনের সুযোগ থাকতে হবে।

বর্তমানে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিবার ও বিদ্যালয়ে যারা মূল্যবোধ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের কর্ণধার তাদেরকে এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে ভাবতে হবে। মূল্যবোধকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে রেখে দিলে হবে না। এটি কোন কোর্স করেও শেখানো সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও অনুশীলন করতে হবে।
মূল্যবোধ গঠনের প্রথম ও প্রধান পর্যায় হল পরিবার। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হল –

- পিতামাতার পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ;
- পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক;
- সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- সন্তানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক;
- পরিবারের দাদা-দাদী, নানা–নানী, চাচা-চাচী, ফুফু, খালা সকলের সাথে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা;
- ঘরে যদি কোন সাহায্যকারী থেকে থাকেন তার প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও তার শ্রমের প্রতি মর্যাদা দেওয়া;
- পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, ধর্মীয় রীতিনীতি লালন ও অনুশীলন। সর্বোপরি এগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করা;
- নিজের কাজ নিজে করার মধ্য দিয়ে দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার বিকাশ;
- পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন করানো;
- গৃহ শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজে নিজেই বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের পড়া, বাড়ির কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া;
- শ্রেণিতে মনোযোগী থেকে প্রয়োজনে অস্পষ্ট বিষয়গুলো শিক্ষককে প্রশ্ন করে সুস্পষ্ট করার মধ্য দিয়ে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে অনুপ্রেরণা প্রদান করা;
- কোন সন্তান, পিতামাতা যাতে ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফোন, ফেইসবুক, ইন্টারনেটের ব্যবহার অবশ্যই অর্থপূর্ণ হতে হবে;
- সন্তানের সাথে পিতামাতাকে মানসম্পন্ন সময় (Quality Time)অতিবাহিত করতে হবে;
- পিতামাতার আয়ের উৎসের বৈধতা নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিবারটি একক না যৌথ তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

বর্তমানে বেশিরভাগ পরিবারই একক পরিবার। এখানে পিতামাতা চাকুরিজীবী হলে সন্তানরা একাকীত্বে ভোগে। ফলে মূল্যবোধ গঠনকারী উপাদানগুলোর প্রয়োগ ও অনুশীলনের সুযোগ কম থাকে। সেক্ষেত্রে পিতামাতাকেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে কীভাবে তারা তাদের সন্তানদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবেন। এক্ষেত্রে করণীয়গুলো যা হতে পারে:

- সন্তানদের কোয়ালিটি টাইম দেওয়া;
- তাদের কাউন্সেলিং করা যে, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক কারণেই পিতামাতাকে জীবিকা নির্বাহের জন্যে চাকরি করতে হচ্ছে। এটি বিবেচনায় এনে তাদের স্বপরিচালিত হতে হবে। প্রয়োজনে তাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ত্যাগস্বীকারও করতে হতে পারে। এসব বিষয় বিবেচনায় এনে তাদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে না দিয়ে ভাল মন্দ বিবেচনা করে তারা কীভাবে সুপরিচালিত হতে পারে সে বিষয়ে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা;
- সন্তানদের ভাল-মন্দ, আনন্দ ও কষ্ট পরস্পর ভাইবোনদের সাথে এবং পিতামাতার সাথে শেয়ার করার সুযোগ করে দেওয়া;
- নিজের ঘরেই আনন্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে করে অযথা যান্ত্রিকতার আশ্রয় নিয়ে অন্যায়ভাবে অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হয়ে সময় অতিক্রান্ত না করে;
- নিয়মিত ধর্মীয় রীতিনীতির অনুশীলন করার অভ্যাস গঠন;
- বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ ও ভালবাসার অভ্যাস গঠন এবং প্রতিশোধ প্রবণতা পরিহার;
- পিতামাতা ও সন্তান প্রত্যেকের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও অনুশীলন।

বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা অনেকাংশেই কমে গেছে। যৌথ পরিবারের সন্তানদের আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্র অনেক বেশি বিধায় এখানে মূল্যবোধের বিকাশও তুলনামূলক সহজতর। যৌথ পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ক ও শ্রদ্ধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রও বিস্তৃত। সেজন্যেই এখানে সন্তানরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মেই মূল্যবোধ চর্চা করতে পারে এবং ভুল থাকলে তা সংশোধন করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূল্যবোধ গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শ্রেণিশিক্ষক উভয়েই মূল্যবোধ গঠন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন যা নিম্নরূপ :

- বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের সময়মত উপস্থিতি;
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারিদের সমন্বয়ে বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ;
- নিয়মিত বাড়ির কাজ আদায় ও ফিডব্যাক প্রদান;
- শ্রেণিতে পাঠ বুঝতে না পারলে শিক্ষককে প্রশ্ন করে বুঝে নিতে সহায়তা করা। শিক্ষকেরও দায়িত্ব তার শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠ বুঝতে পেরেছে কি না তা যাচাই করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কোচিং নিরুৎসাহিত করা। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় দিয়ে অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা। যারফলে ঐ শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে;
- প্রতিটি পাঠ্যবিষয় যেমন বাংলা, ইংরেজি, গণিতসহ সকল বিষয়েই মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্র রয়েছে। শিক্ষক প্রথমে নিজে সেগুলো শনাক্ত করবেন এবং পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে তা অনুশীলন করাবেন;
- কোন শিক্ষার্থী ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাকে কাউন্সেলিং করে ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত করা এবং সাথে সাথে তার পিতামাতাকেও সচেতন করে কাউন্সেলিং করা;
- বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের মূলধারায় একীভূত করা হচ্ছে, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এসব শিশুদের প্রতি প্রধানশিক্ষক, সহকারীশিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সহমর্মি ও স্নেহশীল হতে হবে। এমূল্যবোধের অনুশীলন যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে করতে পারে সেজন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে। এটি একটি টিমওয়ার্ক। এখানে একজনের অসহযোগিতা সম্পূর্ণ কাজটিকে ব্যহত করবে যা মূল্যবোধ গঠনে নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে এবং এসকল শিক্ষার্থীকে নিজের সন্তান, ভাই, বোন অর্থাৎ পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আনন্দদায়ক করে তোলা যাতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষকভীতি দূর করে শিক্ষককে আরও শিক্ষার্থীবান্ধব হতে হবে;
- খেলাধুলাসহ সবধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে হবে;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে;
- সর্বোপরি পরিবার থেকে অর্জিত মূল্যবোধগুলো বিদ্যালয়ে অনুশীলন করতে হবে।

২.২ শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন এবং শিক্ষক হিসেবে পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ

বিষয়বস্তু, শিক্ষকের গুণাবলি, শিখন পরিবেশ এসব উপাদান শিক্ষার্থীর বিশ্বাস গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। যে ব্যক্তি ইতিবাচক বা কল্যাণকর গুণাবলিকে মূল্য দেন তিনি শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজ পেশা ও শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি তার গভীর বিশ্বাসই তাকে একজন দক্ষ ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ ও আদর্শ জীবন গঠনে বিশ্বাস এক গভীর মূলমন্ত্র হিসেবে কাজ করে।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও অনুশীলন

কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে মানুষের বিশ্বাস গড়ে ওঠে। বিশ্বাস হতে পারে কোন বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা কোন তথ্য বোধগম্য হওয়া এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যাচাই করার পর এই বোধের সত্যতা সম্বন্ধে স্থায়ী ধারণা হলে তাকে জ্ঞান বলা যায়। ঐ পূর্বলব্ধ জ্ঞান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যুক্তির সাহায্যে বিচার করে সত্য বলে সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে নতুন জ্ঞান জন্মায়। এভাবে মনের মধ্যে যেসব সত্য উপলব্ধি হয় সেগুলোকে জুড়ে যে তত্ত্বের জাল বোনা হতে থাকে তাদের গ্রহণযোগ্য অনুমোদনই হলো বিশ্বাস।

এ জ্ঞানের বিশেষত্ব হল শুধু পূর্বের অভিজ্ঞতাই নয়, ভবিষ্যত পরিস্থিতি ও অজ্ঞাত পরিস্থিতি সম্বন্ধেও এর দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য বিশ্বাসকে বজায় রাখে। বিশ্বাস হতে পারে একজনের ব্যক্তিগত কল্পনা। কোন কিছুকে ভাল বলে বিশ্বাস না হলে তাকে মন্দ বলেই সন্দেহ হবে। মানুষ তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। যেমন- একজন ব্যক্তি মানবিকতায় বিশ্বাসী। তিনি জীবজগতের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল। এখানে তার বিশ্বাস তাকে মানবিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সে কারণে তিনি মানবিক আচরণকে গুরুত্ব দেন বা মূল্য দেন।

আমাদের জীবনকে যা গুরুত্ব প্রদান করে, মূল্যবান করে তোলে তা-ই এক কথায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আমাদের কর্মে প্রতিফলিত হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাস নানা ধরনের হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শারীরিক ও বিনোদনমূলক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্য সম্ভোগের/নান্দনিক, জ্ঞানমূলক/বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাসগুলো অনুশীলন

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যে সাধারণ বিশ্বাসগুলো প্রয়োজন সেগুলো বিদ্যালয়ে অনুশীলনের জন্য নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে-

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাস

শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সামাজিকীকরণ হয়, তবে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য শিক্ষককে দু'দিক থেকে কাজ করতে হবে। যেমন-

প্রথমত: শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজের আর্থিক কাঠামোটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সমাজের আর্থিক কাঠামোটিকে বজায় রাখতে এবং তার উন্নতি সাধনে ব্যক্তির ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীর যেসব বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন তা হল-

- বিভিন্ন শিল্প সংস্থা কীভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান;
- কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান;
- উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকা;
- উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে জ্ঞান;
- সরকারের অর্থনৈতিক ভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণ;
- অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রথা সম্পর্কিত জ্ঞান।

এ ধরনের ব্যক্তিগত সচেতনতা আনার জন্য বিদ্যালয় কতগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন-

- শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ক্ষমতা, আগ্রহ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করলে,তারা সামাজিক অর্থনীতিতে কতটুকু সহায়তা করতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন হতেপারে;
- শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে, তাদের মধ্যে কতগুলো চারিত্রিক গুণের বিকাশ হয়, যেগুলো তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে;
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত আর্থিক সুপরিচালনার ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিজেদের চাহিদার সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। নিজের উপভোগের সামগ্রী সঠিকভাবে নির্বাচন করার ক্ষমতা, ব্যক্তিজীবনের স্থায়ী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থী এ বিষয়ে, উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ লাভ করলে, তাদের আত্মনির্ধারণ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মসমন্বয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

শারীরিক ও বিনোদনমূলক সচেতনতা

শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক ও বিনোদনমূলক সচেতনতা শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত করা সম্ভব। এজন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ও বিনোদনমূলক কার্যাবলির গুরুত্ব ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে এ সংক্রান্ত আচরণগুলো সম্পাদনের অভ্যাস গঠন করতে পারে, সে বিষয়ে বিদ্যালয়কেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষককে তিনটি পর্যায়ে কাজ করতে হবে-

প্রথমত: শিক্ষার্থীদের এ সংক্রান্ত জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে। এ জ্ঞান সরবরাহের জন্য শিক্ষক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তা নিতে পারেন। দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়। বিনোদনমূলক কাজগুলো অঙ্গসঞ্চালনমূলক বিধায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জ্ঞান এসব কাজের উপযোগী তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষার্থীদের দিক থেকে পূর্বোক্ত জ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। জৈবিক চাহিদাগুলোর সঙ্গে ঐসব জ্ঞানের সম্পর্ক কী এবং দৈহিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যাভ্যাস কীভাবে শিক্ষার্থীদের চাহিদা তৃপ্তিতে সহায়তা করতে পারে, এসব বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। সুস্বাস্থ্য এবং সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় অবসর বিনোদনের প্রচেষ্টা ব্যক্তিসত্তা বিকাশে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে পারলে তাদের মধ্যে আশানুরূপ আচরণ সৃষ্টি হবে। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীদের আচরণগত ত্রুটিগুলো নির্ণয় করা ও সেগুলোকে পূর্বোক্ত জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যাসহ পরিবর্তনের চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত: যেহেতু শারীরিক ও বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির দৈনন্দিন আচরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত সেহেতু, এ আচরণগুলো অভ্যাসের স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন আর এজন্য প্রয়োজন অনুশীলন। এই অনুশীলন প্রত্যক্ষভাবে নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের মাধ্যমেই সম্ভব। সেজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতিপয় নির্দিষ্ট কার্যাবলি নির্ধারণ করে তা সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হবে। সেগুলো নিম্নরূপ-

- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শারীরিক শিক্ষামূলক কার্যাবলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও বিনোদনমূলক কাজের চর্চার সুযোগ দেওয়া যায়;
- কর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিনোদনমূলক কার্যাভ্যাস গঠন করা সম্ভব;
- শারীরিক ও বিনোদনমূলক কার্যাবলি শিক্ষার্থীকে নিজের ক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, নিজের জৈবিক চাহিদা অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্বাচনে সক্ষম হয় এবং চাহিদার সঙ্গে নিজের ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

সামাজিক বিশ্বাস

যে ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম সে-ই সামাজিকভাবে পরিণত। সামাজিক দিক থেকে পরিণত ব্যক্তি নিজের ও অন্যের প্রত্যাশা পূরণের উপযোগী প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় আচরণগত আদর্শ বিভিন্ন রকম। এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি জীবনাদর্শগত সংঘাতের সৃষ্টি করে। এজন্য আধুনিক চিন্তাবিদগণ সামাজিক বিশ্বাসের নির্দিষ্ট কতগুলো সার্বজনীন মূল্যমান নির্ধারণের কথা বলেছেন। যা একদিকে যেমন ব্যক্তির সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়ে সামাজিক অগ্রগতির পথকে সুগম করবে। সার্বজনীন এই সামাজিক বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাশা এবং ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যের প্রত্যাশার সার্থক সমন্বয়। এ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়কে যেসব পর্যায়ে কাজ করতে হবে তা হল-

- প্রথমেই শিশুকে তার নিজস্ব চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এজন্য বিদ্যালয় তাকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবে।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক চাহিদাগুলোর প্রকৃত স্বরূপ জানতে সাহায্য করতে হবে। একইসাথে শিক্ষার্থীদের সামাজিক রীতিনীতি, নিয়ম কানুন ইত্যাদি সম্পর্কে জানাতে হবে। কারণ, সামাজিক চাহিদা ও রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সমাজ তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে শিক্ষার্থীরা তা নির্ণয় করতে পারবে না।
- শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চাহিদার সাথে সামাজিক চাহিদার সমন্বয় করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণের কাজ হবে সামাজিক পরিবেশে। শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয়গুলোতে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা সমাজের অনুরূপ পরিবেশে নিজেদের চাহিদার সঙ্গে সামগ্রিক চাহিদার সমন্বয় ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে যে প্রতিক্রিয়া করার সুযোগ পাবে তা থেকেই তাদের মনে এক ধরনের সার্বজনীন বিশ্বাস জাগ্রত হবে।
- সামাজিক বিশ্বাস গঠনের প্রক্রিয়ায় যে তিনটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তা হল–জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা, মূল্যায়ন ও সমন্বয় সাধন। জ্ঞান আহরণের পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়, মূল্যায়নের পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করে কর্মসম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং সমন্বয় স্তরে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে তাদের আচরণগত নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সৌন্দর্য সম্ভোগ বা নান্দনিক বিশ্বাস

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু আছে তাকে সুন্দর হিসেবে উপলব্ধি করা ব্যক্তিসত্তার একটি বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্য যেমন সবটুকু বস্তুগত নয়, ব্যক্তির অনুভূতির সঙ্গে জড়িত, তেমনি সৌন্দর্য সম্ভোগও কোন নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া নয়। সৌন্দর্যের মূলে আছে এক ধরনের মানসিক সংগঠন। এ বোধ মানুষের মনকে কলুষতা মুক্ত করে। এর দু'টি আচরণগত দিক আছে। একটি দিক হল -

ব্যক্তিকে বস্তুজগতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করা এবং অপর দিকটি হল – সুন্দরের সৃষ্টি। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবনে এ চেতনা জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বোধ জাগ্রত করতে হলে নিম্নের কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করতে হবে :

- শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য, গণিত, সঙ্গীত, নৃত্য, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ফুটে উঠবে;
- শিক্ষার্থীর মন থেকে যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার প্রবণতা দূর করার জন্য বিষয়বস্তুর তাৎপর্য উপলব্ধির দিকে জোর দিতে হবে;
- শিখনকে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। শুধু স্মৃতির স্তরে শিখন দ্বারা সৌন্দর্য সম্ভোগের বোধ সৃষ্টি করা যাবে না;
- শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আসবে;
- সৌন্দর্যবোধের একটি দিক হল সুন্দরের সৃষ্টি। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সুন্দরের সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবেন। তারা যেন তাদের কাজের মধ্যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে সেজন্য শিক্ষক তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহ দিবেন।

জ্ঞানীয়/বৌদ্ধিক বিশ্বাস

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকগণ জ্ঞানমূলক তথ্য পরিবেশন করলেও শিক্ষার্থীরা ঐ তথ্যগুলো আয়ত্ত করার মধ্যেই তাদের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখে। তারা এই তথ্যের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। ব্যক্তির মধ্যে বৌদ্ধিক বিশ্বাস জাগ্রত করতে হলে সে স্বাধীনভাবে তার জ্ঞানের ক্ষেত্রকে নির্বাচন করতে সক্ষম হবে এবং যে কোন প্রাপ্ত তথ্যের তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিশ্বাস জাগ্রত করতে হলে বিদ্যালয়কে সুপরিকল্পিতভাবে এ উদ্দেশ্যে নিচের কাজগুলো করতে হবে–

- শিক্ষার্থীদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন করতে হলে শিক্ষককে এমন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের সামগ্রী নির্বাচন করতে হবে যেগুলো শিক্ষার্থীর বাস্তবজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ;
- শিক্ষককে শিখন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য শ্রেণিতে এমনভাবে তথ্য পরিবেশন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরা তা বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- শিখনের সময় তথ্য মুখস্থ করার চেয়ে ধারণা গঠনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে,যাতে শিখন প্রক্রিয়াকে উন্নত স্তরে সংগঠিত করা যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে তাদের অভিজ্ঞতাকে পরিচালিত করতে পারবে।
- বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ধারণার মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে সমন্বয় সাধন করতে পারে সেজন্য কিছু প্রয়োগমূলক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞান আহরণের প্রতি স্পৃহা জাগ্রত করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই ছাড়াও অন্যান্য বই পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিবেন।

নৈতিক বিশ্বাস

ব্যক্তির নৈতিক ক্রিয়া সাধারণভাবে কতগুলো সামাজিক আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা নৈতিক আচরণকে সামাজিক আচরণের মূল্যায়িত রূপ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ নৈতিক আচরণরকে ব্যক্তি নির্ধারিত ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজস্ব জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে যখন কোন প্রতিক্রিয়া বা আচরণের যৌক্তিকতা বিচার করে, তখনই সেই আচরণকে বলা হয় নৈতিক আচরণ। প্রত্যেক নৈতিক আচরণেরই সামাজিক সংস্পর্শ আছে। ব্যক্তি যখন তার নিজের আচরণকে নিজস্ব যুক্তি দ্বারা মূল্যায়ন করতে পারে তখন নৈতিকতা বোধ জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করতে হলে নিচের কাজগুলো করতে হবে –

- শিক্ষার্থীদের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে। বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো যেমন ইতিহাস,ভূগোল, চারু ও কারুকলা,জীববিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা বোধ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারে।
- শুধুমাত্র তথ্য বা জ্ঞান সরবরাহ করে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। যে পর্যন্ত না অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যক্তিগত আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংযুক্ত করা যায় সে পর্যন্ত অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে চালিকাশক্তি সৃষ্টি হয় না। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক আচরণ সম্পাদনে উৎসাহিত করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাধারণ কিছু অভ্যাস গঠনে সহায়তা করতে হবে। একবার এ অভ্যাসগুলো গঠিত হলে তা দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণগুলো স্বতস্ফূর্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।
- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে সে বিষয়ে তাদের সহায়তা করতে হবে। এজন্য তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে তাদের আত্মসচেতন করে তুলতে হবে।
- বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতা ও কর্মঅভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি শিক্ষার্থীদের মনে দয়া, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির মত বিমূর্ত ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করে সেন্টিমেন্ট গড়ে তোলা যায় তবে এগুলো পরবর্তীতে তাদের আচরণের যথার্থতা নির্ধারণ করবে।

ধর্মীয় বিশ্বাস

ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যে কোন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষকে এমন এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাস করতে হয় যাকে সৃষ্টি করার অধিকার তার নেই। তাই সে সর্বশক্তিমান এক স্রষ্টাকে বিশ্বাস করেছে কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন নামে। এই সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাসকে বলা হয় আধ্যাত্মিকতাবোধ। ব্যক্তিজীবনে আদর্শরূপ ফুটিয়ে তুলতে হলে এই সর্বজনীন আধ্যাত্মিকতাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। এ বোধ যে কোন ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে। এই বোধই মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলবে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে হলে নিচের কাজগুলো করতে হবে-

- শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জ্ঞান সরবরাহ করতে হবে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে;
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সব ধর্মের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে এবং সবকিছুর মূলে যে একটি সর্বজনীন বিশ্বাস কাজ করছে তা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করতে সহায়তা করবেন;
- সংকীর্ণতামুক্ত এ ধরনের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কর্তব্য নির্ধারণে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম হবে;
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচির অন্তর্গত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ধর্মীয় মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হবে।
- বিদ্যালয়ে এমন কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত বিশ্বাসকে প্রয়োগ করতে পারে;
- সংকীর্ণ সংস্কারমুক্ত জ্ঞানসরবরাহ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে অনুশীলন করার সুযোগ পায় সে বিষয়ে কার্যকর কর্মসূচি ও পরিবেশ রচনা করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনে যে কোন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকাশ শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক কী কী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিকাশ করতে চান তা নির্ধারণ করতে হবে। এগুলো বিকাশের জন্য সঠিক ও কার্যকর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকটি বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষককে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দেশ করতে হবে। পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব শিক্ষকের। শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হবে চিন্তনমূলক স্তরে এবং সহায়ক উদাহরণ ও উপকরণের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরা যাতে পরিপূর্ণভাবে আচরণ সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ অনুকূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা জীবনে কাঙ্ক্ষিত আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মূল্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন তিনি নিজেও যেন সেই মূল্যবোধের অধিকারী হন সে বিষয়ে তাকে সচেষ্ট হতে হবে।

বিভিন্ন বিষয় পাঠদানের সময়ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারেন। যেমন- সাহিত্যের বিষয়গুলো পাঠদানের সময় ঐ বিষয়ের গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, সারাংশ, ভাবসম্প্রসারণ থেকে বিভিন্ন মূল্যবোধ চিহ্নিত করা এবং অনুশীলন করা। আবার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে সামাজিক ও পরিবেশগত কিছু মূল্যবোধ অনুশীলন করানো যেতে পারে। জীববিজ্ঞান বিষয়ে মাটি দূষণ,পরিবেশ রক্ষা ও বিপর্যয়, বন সুরক্ষা, জীব বৈচিত্র ইত্যাদি মূল্যবোধ অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞানে শব্দ দূষণ, নিউটনের গতির সূত্রের ইতিবাচক ব্যবহার, তেজস্ক্রিয়তার ইতিবাচক ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের এসিড/রাসায়নিক দ্রব্যাদির নেতিবাচক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে। একইভাবে আইসিটি বিষয়, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা প্রতিটি বিষয়ের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে যার কিছু কিছু শিক্ষাক্রমেও উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের আন্তরিকতা ও সৃজনশীলতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ জাগ্রত করার দায়িত্ব অনেকাংশেই শিক্ষকের ওপর বর্তায়।

শিক্ষক হিসেবে পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য নির্ধারণ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন আবশ্যক। এই পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে। পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাজীবীদের কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। শিক্ষকও যেহেতু একজন পেশাজীবী, সুতরাং শিক্ষককেও কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। সেগুলো হল-

- পেশার প্রতি আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা;
- দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকা;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমসহ সকল কাজে দক্ষতা প্রদর্শন;
- শিক্ষার্থীর মন মানসিকতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা;

- শেখার আগ্রহ ও সাম্প্রতিক তথ্য জানার আগ্রহ;
- নিরলস জ্ঞানচর্চায় মগ্ন থাকা;
- সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারলে তাঁর পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এজন্য শিক্ষক নিজেকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন।

- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে যান কি–না;
- শিক্ষার্থীর চাহিদা সম্পর্কে সচরাচর সচেতন থাকেন কি–না;
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেন কি–না;
- শিক্ষার্থীকে ভাল কাজের জন্য প্রশংসিত করেন কি–না;
- অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন কি–না;
- তাদের সমস্যা সমাধানে কতটুকু আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে থাকেন;
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হয় কি–না;
- পেশা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য সম্বলিত বই পড়ার অভ্যাস আছে কি–না;
- নিজ উদ্যোগে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন কি–না;
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন কি–না ।

শিক্ষক নিজেই যখন নিজেকে আত্মবিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন করবেন এবং এর উত্তরের প্রেক্ষিতে আত্মবিশ্লেষণে কোন ঘাটতি চিহ্নিত করে তা সমাধানে সচেষ্ট হবেন তখনই তার পেশাগত উন্নয়ন সাধিত হবে।

শিক্ষক হিসেবে ব্যক্তিগত লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের ও সমাজের নিকট একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের তথা সমাজকে কতটুকু দিতে পেরেছেন সেটাই তার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একজন ভাল শিক্ষকের যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হল –

- শিখন-শেখানো দক্ষতা
  – পাঠ পরিকল্পনা তৈরির দক্ষতা;
  – নির্দেশনা প্রদানের দক্ষতা;
  – জটিল পাঠ ব্যাখ্যার দক্ষতা;
  – শিক্ষার্থীদের সমস্যা ধৈর্যসহকারে শোনা ও বোঝার দক্ষতা;
  – দক্ষভাবে শ্রেণি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ;
  – অভীক্ষা ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দক্ষতা;
  – অভীক্ষা ও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের দক্ষতা।
- শিখন- শেখানো কার্যক্রম সংক্রান্ত জ্ঞান
  –বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের গভীরতা;
  – পাঠ্যসূচির জ্ঞান;
  –বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত জ্ঞান;
  – পদ্ধতি ও কৌশলগত জ্ঞান;
  – পরীক্ষা পদ্ধতিগত জ্ঞান;
  – জাতীয় শিক্ষানীতি সংক্রান্ত জ্ঞান।
- শিখন-শেখানো দৃষ্টিভঙ্গি
  – শিখন সম্বন্ধীয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি;
  – বিষয় সংক্রান্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি;
  – ধৈর্য ও সহনশীলতা;
  – সুসংগঠিত কার্যক্রম;
  – জেন্ডার সচেতনতা;
  – দায়িত্ব সচেতনতা;
  – কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিখন-শেখানো কৌশল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনলিপি (Reflective Diary) সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকের গুণাবলি অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। এ অনুশীলন সারা জীবনব্যাপী এবং ধারাবাহিকভাবে চলবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষক তার নিজের কাছে একটি ডায়েরি রাখবেন এবং প্রতিদিন তার ক্লাসের পরে নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখবেন। এ ধরনের ডায়েরির নাম প্রতিফলন ডায়েরি।এ ডায়েরিতে কী কী তথ্য থাকবে এবং কখন লিখবেন তা নিচে উল্লেখ করা হল–

- প্রতিদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর ঐ ক্লাসের সবল দিক ও দুর্বল দিক ;
- শিক্ষক কীভাবে ক্লাসটি আরও ভাল করতে পারতেন এ ব্যাপারে আত্মসমালোচনা ও মতামত;
- সহকর্মী শিক্ষক অথবা সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পর ঐ ক্লাসের সবল দিক, দুর্বল দিক এবং ঐ শিক্ষকের সাথে পরামর্শক্রমে ঐ ক্লাসের উন্নয়নের দিক;
- সহযোগী শিক্ষক অথবা বিষয় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অন্যান্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ শেষে উক্ত ক্লাসের সবল, দুর্বল ও উন্নয়নের দিক;
- বই পড়ে, ইন্টারনেটে, সতীর্থদের সাথে আলাপ আলোচনা করে ভাল শিক্ষক তৈরি সংক্রান্ত মতামত, পদ্ধতি বা তথ্য পেলে তা ডায়েরিতে লিখতে হবে। প্রতিদিন ডায়েরি লেখার পর আবার নিয়মিত পড়তেও হবে। বিশেষ করে শ্রেণি কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় ডায়েরি খুলে পড়তে হবে এবং সে অনুযায়ী ক্লাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ক্লাসে যেতে হবে। আর এ অনুশীলন চলবে সারা জীবনব্যাপী।

সুতরাং শিক্ষক হিসেবে সমাজে, বিদ্যালয়ে ও জনগোষ্ঠীর কাছে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে হলে শিক্ষককে কর্মের প্রতি আত্মনিয়োগ ও দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। তাই পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশ , জাতি, সমাজ ও শিক্ষার্থীর নিকট নিজেকে অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পরিচিত করা।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?

২. কী কী কারণে বিশ্বাস অর্জিত হয়?

৩. বিশ্বাস ও শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কিত –ব্যাখ্যা করুন।

৪. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়?

৫. শিখন-শেখানো সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো উল্লেখ করুন।

৬. শিখন-শেখানো সম্পর্কিত শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো লিখুন।

৭. শিখন-শেখানো সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একজন শিক্ষক কীভাবে বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন?

২. শিক্ষক হিসেবে পেশাগত উন্নয়নের জন্য আপনার ব্যক্তিগত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? আপনি কীভাবে এ লক্ষ্য অর্জন করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৩ : শিক্ষক যোগ্যতা

শিখন শেখানোর মধ্য দিয়ে কোনো জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর কেউ তার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা হয়। এ অধ্যায়ে যোগ্যতার সাধারণ ধারণার পাশাপাশি যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য,আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা এবং বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শমানগুলো ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যাস করে আলোচনা করা হয়েছে-

৩.১ যোগ্যতার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা, শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা;
৩.২ বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতা বিবেচনা করা এবং বি,এড শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো পর্যালোচনা।

৩.১ যোগ্যতার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা, শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা

যোগ্যতার ধারণা

যোগ্যতা বলতে কোন কাজ করার বা করতে পারার গুণ, সামর্থ্য বা সক্ষমতাকে বুঝায়। The ability to do something successfully or efficiently is competency.(https://en.oxforddictionaries.com/)। যোগ্যতা বা সামর্থ্যগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনযোগ্য হবে। একই সাথে সেগুলো যাচাই বা মূল্যায়নযোগ্য বা পরিমাপযোগ্য হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি'র সমন্বয়ে গঠিত সামর্থ্যগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা হয় সেগুলোকে যোগ্যতা বলে। A competency is the capability to apply or use a set of related knowledge, skills, and abilities required to successfully perform "critical work functions" or tasks in a defined work setting. Competencies often serve as the basis for skill standards that specify the level of knowledge, skills, and abilities required for success in the workplace as well as potential measurement criteria for assessing competency attainment.
(http://www.instruction.greenriver.edu/avery/faculty/pres/tesol04/comptetencies3.htm)। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষার বিভিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু আছে। ১৯৮৬ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। দেশব্যাপী প্রথম শ্রেণিতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৯২ সালে। যে শিক্ষাক্রমে কোন স্তরের শিক্ষা শেষে প্রত্যেক বিষয় ও শ্রেণির নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো ক্রমানুসারে অর্জন করার লক্ষ্যে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাকে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলে।

যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য

১. যোগ্যতাসমূহ অবশ্যই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনযোগ্য পরিপূর্ণ ও দৃশ্যমান প্রকাশ হতে হবে।
২. যোগ্যতাসমূহ অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হতে হবে।
৩. যোগ্যতা অর্জনকারী বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা যাবে।
৪. শিখনফলের (learning objectives) সাথে যোগ্যতার (Competencies) পার্থক্য আছে। শিখনফল তত্ত্বীয় জ্ঞান ও প্রয়োগিক দক্ষতার সমন্বয়ে গঠিত হয়। কিন্তু যোগ্যতা হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রায়োগিক ও দৃশ্যমান অবস্থা। এ জন্য বলা হয় Competencies, therefore, may incorporate a skill, but are more than the skill; they include abilities and behaviours, as well as knowledge that is fundamental to the use of a skill.(http://www.talentalign.com/skills-vs-competencies-whats-the-difference/)
৫. শিখনফলের মতই যোগ্যতাসমূহ লেখার সময় সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য এবং আচরণিক পরিভাষায় লিখতে হয়। শিখনফলের মাধ্যমে যেখানে শুধু প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে জানা যায় সেখানে যোগ্যতার মাধ্যমে সে অর্জনগুলো কীভাবে অর্জন ও প্রয়োগ করবে তা নিশ্চিত করা হয়।
৬. যোগ্যতা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান ও উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা

পেশাগত জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ে গঠিত একগুচ্ছ টেকসই গুণাবলি, যোগ্যতা সামর্থ্য, যা একজন শিক্ষককে নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদনে সামর্থ্যবান করে তোলে তাই আদর্শ শিক্ষকের যোগ্যতামান। তবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকার ওপর শিক্ষণ যোগ্যতা কেন্দ্রীভূত থাকলেও শিক্ষকতা যে কোন নির্দিষ্ট কার্যভার থেকে অধিকতর ব্যাপক বিষয়। শিখন শেখানোর মধ্য দিয়ে কোনো জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর কেউ তার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনের সময়ে তা কাজে লাগাতে পারলে সেই জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গিকে তার একটি যোগ্যতা বলা হয়। আদর্শ শিক্ষকযোগ্যতামানের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় A characteristic and measurable pattern of knowledge, skill and ability, demonstrated through behaviors, which underlies and drives exceptional performance.
(https://www.med.umich.edu/umhshr/doc/Definition_of_a_Competency.pdf)

শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের শিক্ষক,শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমের অনেক সবলদিক থাকা সত্ত্বেও একটি দুর্বল দিক হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থা। বর্তমানে আমাদের দেশে পাবলিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের নামে যে লিখিত পরীক্ষা সংস্কৃতি চলছে তাতে শুধু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত দিকটিই পরিমাপ হয় কিন্তু তাদের কর্মদক্ষতা (মনোপেশীজ) এবং বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দিকগুলো (আবেগিক) সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। যার কারণে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবেই মুখস্থমুখী, পরীক্ষামুখী, নম্বরমুখী, সার্টিফিকেটমুখী সর্বোপরি প্রাইভেট ও কোচিংমুখী হয়ে পড়েছে। আমাদের শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও শিক্ষক মূল্যায়নে একই সমস্যা বিরাজমান। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় যেখানে শিক্ষকগণের মনোপেশীজ দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল সেখানে তত্ত্বীয় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক মূল্যায়ন হবার ফলে প্রকৃত এবং অনুপ্রাণিত শিক্ষক খুঁজে পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। আমাদের নবীন শিক্ষকগণের মধ্যে লুক্কায়িত আছে অপার সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতা। শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষাক্রমে যুগান্তকারী পরিবর্তন না আনতে পারলে গুণগত শিক্ষা অর্জনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ শিক্ষাব্যবস্থাকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা, মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা ও গবেষণার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মেধাবী প্রজন্মকে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেন্ট -২য় পর্যায় মাধ্যমিক শিক্ষকগণের যোগ্যতা চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৩.২ বাংলাদেশের ম্যাধমিক শিক্ষক যোগ্যতা বিবেচনা করা এবং বি,এড শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো পর্যালোচনা

পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে কোন জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পর মাধ্যমিক স্তরের কোন শিক্ষক যদি তার বাস্তব জীবনে সেই লব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারে তাহলে সম্মিলিত সাফল্যকে ঐ শিক্ষকের যোগ্যতা বলে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান পটভূমিতে সময় এসেছে এ স্তরের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা এবং কীরূপ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করল তা সুনির্দিষ্ট করা। এর জন্য প্রয়োজন গুণগত মানসম্পন্ন যোগ্য শিক্ষকসমাজ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একথা সত্যি যে এত বছর পরও আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের যোগ্যতামান নির্ধারণ করা হয়নি। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে,অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি হবে যারা শুধুমাত্র বর্তমান চাহিদা মেটাবার যোগ্য শিক্ষার্থীই নয়, ভবিষ্যত জীবনে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুখী মানুষ এবং সমাজ ও জাতির মানবসম্পদে পরিণত হতে শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে তৈরি করবে।

শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীন টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেট (টিকিউআই-সেপ-দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের অধীন শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পরামর্শক বিভিন্ন কর্মশালা ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সভা, সেমিনার করে শিক্ষক যোগ্যতার চারটি প্রধান ক্ষেত্র উদ্ভাবন করেন। এই চারটি ক্ষেত্র হলো-

১. পেশাগত জ্ঞান (Professional Knowledge)
২. পেশাগত অনুশীলন (Professional Practice)
৩. শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি(ICT Integration in Teaching Profession)
৪. পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (Professional Learning Ethics and Values)

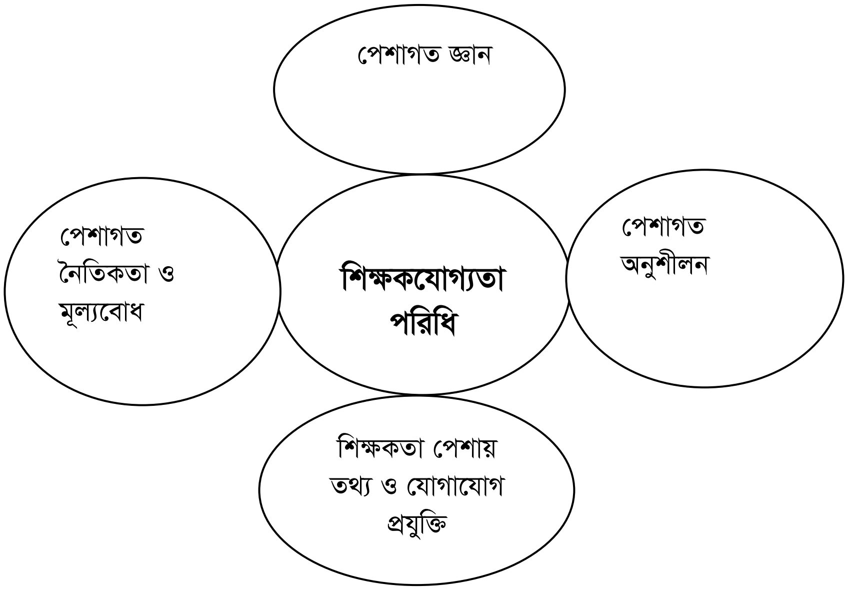

চিত্র ২: শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্র

উপরোক্ত শিক্ষক যোগ্যতার প্রধান চারটি ক্ষেত্রে আবার প্রত্যেকটির জন্য সুনির্দিষ্ট উপক্ষেত্র ও যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পেশাগত জ্ঞানক্ষেত্রের ১৮টি, পেশাগত অনুশীলনক্ষেত্রের ১২টি, শিক্ষাগত পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিক্ষেত্রের ৮টি এবং পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধক্ষেত্রের জন্য ১৫টি এবং সর্বমোট ৫৩টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শমান
(Secondary Teachers Competency Standard)

ক্ষেত্র	উপক্ষেত্র	সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা
১. পেশাগত জ্ঞান ১৮ টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা	১.১ বিষয়বস্তুর জ্ঞান	১.১.১ বিষয়বস্তুর ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদর্শন করতে পারা ১.১.২ বিষয় সর্ম্পকে সমসাময়িক জ্ঞান অনুসন্ধান করা ১.১.৩ শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জ্ঞান প্রদর্শন করা ১.১.৪ বিষয়বস্তু/বিষয় এর মধ্যে আন্তঃসর্ম্পক শনাক্ত করা
	১.২ বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগ	১.২.১ শিক্ষণসংক্রান্ত বিষয়জ্ঞান সহজতরভাবে প্রয়োগ করা ১.২.২ শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত কৌশল ও দক্ষতা অনুধাবন ও প্রয়োগ করা ১.২.৩ শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণমূলক/সমালোচনামূলক চিন্তনে উৎসাহিত করা ১.২.৪ ভাষা দক্ষতা প্রদর্শন করা ১.২.৫ বৈশ্বিক সচেতনতাকে উৎসাহিত করা ১.২.৬ শিক্ষণ নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ করা

ক্ষেত্র	উপক্ষেত্র	সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা
	১.৩ শিক্ষার্থীর উন্নয়ন	১.৩.১ শিক্ষার্থীদের বর্ধন ও বিকাশ সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকা ১.৩.২ শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন ও বর্ধন চিহ্নিতকরণ ও সমর্থন দেওয়া ১.৩.৩ শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা নির্দেশনা ও যত্ন প্রদান করা ১.৩.৪ শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। ১.৩.৫ শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা ১.৩.৬ প্রতিটি শিশুকে একটি ইতিবাচক ও প্রতিপালনমূলক সম্পর্কযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা ১.৩.৭ লিঙ্গ সমতা ও একীভূত শিক্ষা উৎসাহিত করা ১.৩.৮ শিক্ষার্থীদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সচেতনতা প্রদর্শন করা
২.পেশাগত অনুশীলন ১২টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা	২.১ শিখন-শেখানো পরিকল্পনা	২.১.১ পাঠ পরিকল্পনা ও শ্রেণি কার্যাবলি সংগঠিত করা ২.১.২ বিভিন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করে শিখন কার্যাবলি বিন্যস্ত করা ২.১.৩ একীভূত শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও সংগ্রহ করা
	২.২ শিখন-শেখানো কলাকৌশল	২.২.১ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সহায়তা দানে কার্যকর শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা ২.২.২ কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা ২.২.৩ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য যথাযথ শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করা ২.২.৪ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ২.২.৫ বাস্তব শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করা
	২.৩ মূল্যায়ন	২.৩.১ কার্যকর মূল্যযাচাই পদ্ধতি ও কৌশল শনাক্ত করা ২.৩.২ ফলপ্রসূভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা ২.৩.৩ মূল্যযাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ব্যবহার করা ২.৩.৪ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা
৩.শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ০৮টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা	৩.১শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা	৩.১.১ শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্র কৌশল চিহ্নিত করা
	৩.২তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা	৩.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারের মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা ৩.২.২ যোগাযোগ প্রযুক্তি (ইন্টারনেট) ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং সহ-সৃষ্টির দক্ষতা থাকা।
	৩.৩শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন	৩.৩.১ পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করা ৩.৩.২ শিখন-শেখানো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করা। ৩.৩.৩ মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন বুঝে করতে পারা। ৩.৩.৪ একীভূত শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারা।
	৩.৪জীবনব্যাপী পেশাগত উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩.৪.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নের জন্য আত্ম-প্রতিফলন অনুশীলন করা।

ক্ষেত্র	উপক্ষেত্র	সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা
৪ পেশাগত শিখন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (Professional Learning Ethics and Values) ১৫টি	৪.১ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুশীলন	৪.১.১ পেশাগত নৈতিক মান প্রদর্শন করা ৪.১.২ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করা
	৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব	৪.২.১ বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও নীতিসমূহ অনুধাবন করা ৪.২.২ বিদ্যালয়ের রূপকল্প সংস্কৃতি(culture)ও বৈশিষ্ট্য(ethos)এর সাথে অভিযোজিত হওয়া ৪.২.৩ বিদ্যালয়ের রূপকল্প ও ব্রত পরিপূরণ করা ৪.২.৪ যত্নশীল ও আন্তরিকতাপূর্ণ বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচর্যা করা ৪.২.৫ বিদ্যালয়ের রূপকল্প(vision),ব্রত (mission) পর্যালোচনায় অবদান রাখা
	৪.৩ পেশাগত শিখন, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব	৪.৩.১ নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে কর্ম-সম্পর্ক স্থাপন করা ৪.৩.২ শিক্ষার্থীর শিক্ষা নির্দেশনা প্রদানে সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা ৪.৩.৩ নিজ বিদ্যালয় এবং আশ পাশের বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সাথে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করা ৪.৩.৪ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে অবদান রাখা ৪.৩.৫ বিদ্যালয়ে নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদর্শন করা ৪.৩.৬ শিক্ষকতা পেশায় নেতৃত্ব প্রদান করা।
	৪.৪ কমিউনিটি সম্পৃক্ততা	৪.৪.১ বিদ্যালয়ের বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা ৪.৪.২ শিক্ষা সম্পর্কিত কমিউনিটির পরিষেবা এবং স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ করা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক যোগ্যতা প্রমিতমান

(Secondary Teachers' Competency)

বাংলাদেশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক যোগ্যতা প্রমিতমান চারটি স্তরে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ একজন শিক্ষকের পুরো কর্মকালকে চারটি স্তরে বিভক্ত করে স্তরভিত্তিক যোগ্যতার প্রমিতমান চিহ্নিত করে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. নবীন শিক্ষক (Beginning Teacher)

এ জাতীয় যোগ্যতাগুলো শিক্ষকগণ শিক্ষকতা পেশায় যোগদানকালের যোগ্যতা বা ভিত্তিযোগ্যতা হিসেবে প্রদর্শন করেন। নবীন শিক্ষকগণ শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সদ্য উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েট। এদেরকে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ (Continuous Professional Development-CPD)দেয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২. বিকাশমান শিক্ষক (Developing Teacher)

এ স্তরের শিক্ষকগণ যদিও একটি নির্দিষ্ট মাত্রার শিক্ষক যোগ্যতা প্রদর্শন করেন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কাজের মাধ্যমে এবং সিনিয়র সহকর্মীদের থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। অধিকন্তু বিষয় ও পেডাগজিভিত্তিক সিপিডি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতাকে আরো মজবুত করেন।

৩. অগ্রসরমান শিক্ষক (Advanced Teacher)

এ জাতীয় শিক্ষকগণ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সন্তোষজনক যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারেন। এঁরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পেশাগত শিখন সমাজের মাধ্যমে সহকর্মীদের নেতৃত্ব, পরামর্শ ও বিশেষ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেন।

৪. পারদর্শী শিক্ষক (Expert Teacher)

এ স্তরে শিক্ষকগণ উচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিখন-শেখানো দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তাঁদের এ গভীর পাণ্ডিত্য নবীন সহকর্মীদের শিক্ষণযোগ্যতা উন্নয়নে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শমান (উদাহরণ)

ক্ষেত্র ১: পেশাগত জ্ঞান

ক্ষেত্র ১.১: বিষয়বস্তুর জ্ঞান যোগ্যতার বিবরণ ঃ শিক্ষক এমন একটি সহায়ক শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যেখানে সকল শিক্ষার্থী কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুগুলো সহজে শিখতে পারবে ।			
সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ১.১.১ : বিষয়বস্তুর ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদর্শন করতে পারা			
স্তরভিত্তিক যোগ্যতা			
নবীন শিক্ষক	বিকাশমান শিক্ষক	অগ্রগামী শিক্ষক	পারদর্শী শিক্ষক
❑ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদর্শন/উপস্থাপন করতে পারবেন। ❑ প্রধান প্রধান শিখনীয় ক্ষেত্রগুলো সর্ম্পকে স্পষ্ট/মৌলিক ধারণা লাভ/প্রদান করবেন।	❑ বিষয়বস্তুর ওপর তিনি সন্তোষজনক ধারণা প্রদর্শন করতে পারবেন। ❑ বিষয়বস্তুর বিভিন্ন ধারণার ওপর প্রচলিত বিভ্রান্তি দূর করতে সহায়তা করবেন	❑ বিষয়বস্তুর ওপর তিনি সমন্বিত ধারণা প্রদর্শন করতে পারবেন। ❑ বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান শিখনীয় ক্ষেত্রগুলোর সাথে সর্ম্পক স্থাপনে সক্ষম হবেন। ❑ প্রধান প্রধান শিখনীয় ক্ষেত্রগুলোর সাথে সাম্প্রতিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গতিধারা ও আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর পূর্ণ ধারণা প্রদর্শন করতে পারবেন।	❑ বিষয়বস্তুর ওপর তিনি সম্প্রসারিত ধারণা হাতে-কলমে প্রদর্শন করতে পারবেন। ❑ প্রধান প্রধান শিখনীয় ক্ষেত্রগুলোর অন্তর্গত ও বহির্গত বিষয়বস্তুর ধারণার অর্থবহ ও সমন্বিত ধারণার সূচনা করতে সক্ষম হবেন। ❑ শিক্ষণ-শিখন ক্ষেত্রসমুহের বাইরেও বিভিন্ন দিকের প্রতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও কৌতুহল উজ্জীবিত ওসমৃদ্ধ করা

আশা করা যায় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শমান প্রক্রিয়া নিশ্চিত হলে অদূর ভবিষ্যতে গুণগত শিক্ষক পাওয়া নিশ্চিত হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যোগ্যতা বলতে কী বোঝায় ?
২. যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য কী কী ?
৩. আদর্শ শিক্ষক যোগ্যতামানের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষক যোগ্যতার ক্ষেত্রগুলো কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক. মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শমানগুলো লিখুন।
   খ. শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২. ক. বাংলাদেশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক যোগ্যতা প্রমিতমানগুলো বর্ণনা করুন।
   খ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষক যোগ্যতা প্রমিতমানগুলো বাস্তবায়নের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করুন।

ইউনিট ৪ : আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা

আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা জীবন দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা অপরিহার্য। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যোগাযোগ বলতে বোঝায় শ্রেণিতে বিদ্যমান শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক অবস্থা ও আবেগিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি কার্যকর যোগসূত্র তৈরি করা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কথা বলা, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা, কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরের ওঠানামা করানো, বাক্যে উপমা ব্যবহার, পাঠ ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা, প্রশ্ন করা, উচ্চতর চিন্তনদক্ষতা বিকাশ উপযোগী প্রশ্নের ব্যবহার করা, যথোপযুক্ত শিক্ষণ-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা, আনন্দ ও হাস্যরস সহকারে পাঠদান করা, ইত্যাদির কুশলতা বা দক্ষতাকেই শ্রেণিকক্ষভিত্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বলে। শিক্ষণ-শিখনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে এরকম আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ অতীব প্রয়োজন। এ ইউনিটে আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার বিভিন্ন উপাদান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিটের বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপে বিন্যাস করে বর্ণনা করা হয়েছে-

৪.১ আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার ধারণা, শোনার দক্ষতা ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলন;
৪.২ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কের ভূমিকা ও গুরুত্ব;
৪.৩ ফিডব্যাক গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি:জন হেরন ফিডব্যাক মডেল;
৪.৪ ভূমিকাভিনয় কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানা;
৪.৫ সাদা-কালো বোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন।

৪.১ আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার ধারণা,শোনার দক্ষতা ও কণ্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলন

আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার ধারণা

মৌখিক ও শারীরিক ভাষা এবং লিখিতভাবে নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার সামর্থ্য, অন্যের কথা সক্রিয়ভাবে এবং মনোযোগ দিয়ে শোনার দক্ষতা, অন্যকে দোষারোপ না করে কথা বলার দক্ষতা, অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ করার দক্ষতার সমষ্টিকে যোগাযোগ দক্ষতা বলে। Good communication helps to improve relationships with family, friends, teachers and other adults.(http://extension.udel.edu/factsheets/communication-skills-for-you-and-your-family/)। আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বলতে বোঝায় দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার দক্ষতা। এটাকে এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির সম্পর্ককে বোঝায়। যে ব্যক্তির আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা রয়েছে সে ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন জনের সম্পর্ক অতি উন্নত এবং সহজেই তিনি অন্যব্যক্তির সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে ও সম্পর্ক ধরে রাখতে পারেন। দৃঢ় প্রত্যয়মূলক দক্ষতা, ‘না’ বলার দক্ষতা,আলাপ আলোচনার দক্ষতা,অন্যকে স্বমতে আনার দক্ষতাসমূহ আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত। একটি বিদ্যালয়ে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বলতে বোঝায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক সম্পর্ক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্ক, বিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ও শিক্ষক কর্মচারী সম্পর্ক,শিক্ষক ও অভিভাবক সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করার ফলেই বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জিত হয় যা আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু যোগাযোগ দক্ষতা।

আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার বৈশিষ্ট্য হলো-

- অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার সামর্থ্য;
- সম্পর্ক ছেদ করতে হলে গঠনমূলকভাবে তা করার সক্ষমতা;
- নিজের যুক্তিসংগত মত প্রতিষ্ঠায় অটল থাকা, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ প্রত্যাখান করা;
- অন্যের কাজ ও অবদানকে সম্মান প্রদর্শন করা;
- অন্যকে ভালো কাজ করতে প্রভাবিত করার সামর্থ্য।

যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

যোগাযোগ দক্ষতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। এর মূল উদ্দেশ্য হল নিজের মনের কথা বা উক্তি অপরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির কিছু উপায় নিম্নরূপঃ

১। শব্দের সমন্বয় ও শারীরিক ভাষা

নিজের ধারণা ও অনুভূতি ভাগ করে নিয়ে কথা বলার মতই মুখের অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভঙ্গিমা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কথা বলার সাথে অঙ্গভঙ্গির প্রকৃত সমন্বয় মনের ভাবকে অন্যের কাছে স্পষ্টতর করে তোলে । শ্রোতাদের সাথে সংযুক্ত থাকার অন্যতম উপায় হল চোখে চোখ রেখে কথা বলা। চোখে চোখ রাখলে শ্রোতাদের সাথে সংযোগ তৈরি হয় এবং তারাও বক্তার বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যের সাথে অনুভূতির সঙ্গতি থাকা জরুরি। নেতিবাচক কথা বলার সময় মুখে হাসি না থাকার যৌক্তিকতা নেই।

২। মনোযোগী শ্রবণ

কার্যকর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল শ্রবণ। বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে অন্যদের কথাও শুনতে হবে এবং তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরে নিজের গোছানো বক্তব্য প্রদান করতে হবে।

৩। শব্দের সঠিক ব্যবহার

কথা বলার সময় সঠিক শব্দ ব্যবহার করা জরুরি। কোন শব্দ ব্যবহারে নিশ্চিত হতে না পারলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। সঠিক উচ্চারণ এবং কথা বলার গতি ও শব্দের তীব্রতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত যাতে অন্যদের আগ্রহ ধরে রাখা যায়। জড়তা কাটিয়ে কোন বিষয়ের ওপর স্পষ্ট বক্তব্য শ্রোতারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। শ্রোতাদের কাছ থেকে সাড়া নিয়ে তাদের মতামত জানলে আত্মবিশ্বাস জন্মায়।

৪। নিয়মিত অনুশীলন

যোগাযোগ দক্ষতাকে উন্নত করার জন্য অনুশীলন আবশ্যক। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে দেখে শেখাটাও অনেক সাহায্য করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে ভালভাবে কথা বলা যায়। উন্নততর যোগাযোগকারী হওয়া তেমন কঠিন নয়। সঠিক জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত ক্রিয়ার মাধ্যমেই যোগাযোগ দক্ষতাকে শাণিত করে তোলা সম্ভব।

শোনার দক্ষতার অনুশীলন ও আবিষ্কার

ভাষার দক্ষতা অর্জনের চারটি ক্ষেত্র শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মধ্যে শোনার দক্ষতা অর্জন প্রথম এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তবে সাধারণত বলার দক্ষতা অর্জনে মানুষ যতটা সাবধান, শোনার ক্ষেত্রে ততটাই উদাসীন থাকে। শ্রবণদক্ষতা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ সহকারে শ্রবণই শোনার দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক কাজ। কেননা ভাষা শিখনের প্রথম দক্ষতা শুনতে শুনতেই শিশুরা বলতে শুরু করে। শোনা, দেখা এবং পড়া আমাদের মস্তিষ্কে তথ্যের জোগান দেয়। অর্থাৎ মস্তিষ্ককে করে সমৃদ্ধ। ভাষার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান অনুষঙ্গ হচ্ছে শ্রবণদক্ষতা অর্জন। সাথে সাথে অন্যান্য দক্ষতাগুলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রবণদক্ষতাসহ সকল দক্ষতা চর্চা বা অনুশীলনের ব্যাপার। সঠিক জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত ক্রিয়ার মাধ্যমেই যোগাযোগ দক্ষতাকে শাণিত করে তোলা সম্ভব। Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. Listening is key to all effective communication. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. (http://abma.uk.com/listening-skills/)

শোনার দক্ষতার অনুশীলন করার উপায়

সার্থক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতার প্রতিটি উপাদানের সার্থক প্রয়োগ অপরিহার্য। প্রতিটি উপাদানই আবার জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোপরি যোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। শ্রবণ দক্ষতা অর্জন এমন একটি যোগ্যতা যা বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করতে হয়। শিক্ষক স্পষ্ট, শুদ্ধ উচ্চারণে, সহজ ভাষায় এবং অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে যা বলবেন শিক্ষার্থীরা সেগুলো মনোযোগ দিয়ে, শিক্ষকের চোখে চোখ রেখে অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন। সার্বিকভাবে যোগাযোগ দক্ষতার সফলতার ওপর শিখন-শেখানোর সার্থকতা নির্ভর করে। এ জন্যই বলা হয় Inspire creativity, critical thinking, collaboration and communication so that students are ready for tomorrow's world. (https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567059.pdf)। শ্রবণদক্ষতা মূলত ভাষা দক্ষতা, কথার স্পষ্টতা, মনোযোগ ও একাগ্রতা, শ্রবণ আগ্রহ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। শ্রবণদক্ষতা অনুশীলনের পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ-

Step 1: Face the speaker and maintain eye contact;
Step 2: Be attentive, but relaxed;
Step 3: Keep an open mind;
Step 4: Listen to the words and try to picture what the speaker is saying;
Step 5: Don't interrupt and don't impose your "solutions;"
Step 6: Wait for the speaker to pause to ask clarifying questions;

Step 7: Ask questions only to ensure understanding;
Step 8: Try to feel what the speaker is feeling;
Step 9: Give the speaker regular feedback;
(https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/womensmedia/2012/11/09/10-steps-to-effective-listening/&refURL=https://www.google.com/&referrer=https://www.google.com/)

শোনা বলা, পড়া, ও লেখার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি লেখচিত্র, সারণি, প্রতীক, নকশা, ছবি, ডায়াগ্রাম অংকন ইত্যাদির ম্যাধমে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের যোগাযোগ দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ, কথা বলা ও শোনার পারদর্শিতা অর্জন করে থাকে।

কণ্ঠস্বর, উচ্চ ও নিম্নস্বর, বিরতি ব্যবহার ও অনুশীলন

কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের জন্য শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন শ্রেণির আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, প্রয়োগমুখী, ও সহজবোধ্য করে তোলার জন্য শ্রেণিকক্ষের অনুকূল পরিবেশ অত্যাবশ্যক যা পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। শ্রেণিকক্ষের ভৌত উপাদানের পাশাপাশি মানবিক উপাদানগুলো কার্যকর শিখনের জন্য বেশি প্রয়োজন। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, উচ্চ ও নিম্নস্বর, বিরতি ব্যবহার শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে আনন্দদায়ক,স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। শ্রেণিকক্ষে কণ্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলনের জন্য সাধারণ নীতিমালা রয়েছে। যেমন-

- শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রেণি উপযোগী হতে হবে;
- সুস্পষ্ট উচ্চ স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতে হবে যাতে শ্রেণির সবাই শুনতে পায়;
- কণ্ঠস্বরের উঠানামা এমন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা যায়;
- স্বরহীন অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য অঙ্গভঙ্গি ও মুখভঙ্গি ব্যবহার করে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করতে উদ্যোগী হবেন;
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শব্দ উচ্চারণের গতি,নাটকীয়তা, পাঠের তাল, লয়, কণ্ঠস্বর উঁচু-নিচু করার কৌশল ব্যবহার করা আবশ্যক;
- পাঠদানকালে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর ও আকর্ষণীয় করা বাঞ্ছনীয়;
- পাঠ উপস্থাপনের সময় যথাযথ স্থানে বিরতি চিহ্নের ব্যবহার করতে হবে।

৪.২ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সর্ম্পকের ভূমিকা ও গুরুত্ব

শিক্ষার্থীই শিক্ষার প্রধান উপাদান। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্য এবং সামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্যই শিক্ষা। জীবমাত্রই শেখে। আবার জীবের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি শেখে। মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা সহজাত। এর ফলে শিক্ষার্থী পুরাতন আচরণ ত্যাগ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নূতন আচরণ আয়ত্ত করতে পারে। শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদান। শিক্ষার্থী তার জীবন পরিক্রমার প্রতি স্তরে নতুন চিন্তা, ধারণা, কর্মপদ্ধতি অর্জন করে এবং এগুলো তাকে আরও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষা প্রক্রিয়া সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক এবং এটি সবর্দাই আগ্রহের পরিতৃপ্তি ঘটায়।

শিক্ষা প্রক্রিয়ার আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু শেখা সম্ভব না। শিক্ষার্থী যে পরিবেশ হতে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষক সেই পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শিশুর এই সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য শিক্ষার উপাদান হিসেবে শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে। শিক্ষার্থী যে পরিবেশ হতে শিক্ষালাভ করে, শিক্ষার্থীর সেই পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষক নিবিড়ভাবে যুক্ত। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কেবল জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেন না, তিনি একাধারে শিক্ষার্থীর সহায়ক বন্ধু, পরামর্শদাতা, অভিভাবক, হিতৈষী ও পথপ্রদর্শক। শিক্ষার্থীর জীবনদর্শন গঠনে তিনিই হলেন প্রধান সহায়ক। শিক্ষকই শিক্ষার্থীর মনে পাঠ্য বিষয়ে অনুরাগ বা প্রেরণা জাগান। বিদ্যালয় সমাজের নেতা হয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালিত করেন। ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হতে পারে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষক হচ্ছেন একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বিদ্যালয়ে কেবল শিখন-শেখানো কার্যক্রমই পরিচালিত হয় না, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধনও হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, আবেগিক, সামাজিক ও মানবিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ স্থান।

সামাজিক বৃহত্তর পরিমণ্ডলে শিশুর প্রবেশের প্রথম দ্বার বিদ্যালয়। গৃহে অর্জিত গুণাবলি নিয়ে শিশু বিদ্যালয়ে আসে। এখানে তার মিথষ্ক্রিয়া ঘটে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থী তথা সহপাঠীদের সঙ্গে। সহপাঠীদের সহযোগিতামূলক, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন আচরণ শিশু অনুকরণের চেষ্টা করে। পিতা-মাতার পরই শিক্ষকের আচরণ শিশুকে প্রভাবিত করে। শিক্ষকের বিভিন্ন গুণাবলি, বিষয়বস্তুর জ্ঞান, উপস্থাপন দক্ষতা, শিক্ষকের ব্যবহার শিশুকে ভবিষ্যত জীবনের পথ প্রদর্শন করে। শিক্ষকের অতিরিক্ত শাসন, পক্ষপাতমূলক আচরণ শিক্ষার্থীকে আক্রমণাত্মক, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ, দুর্বিনীত করে তোলে। পক্ষান্তরে শিক্ষকের বন্ধুসুলভ আচরণ, গণতান্ত্রিক পরিচালনা, সহজ পরিবেশ শিশুকে স্বাধীন চিন্তায়, সহযোগিতামূলক আচরণে ও নানান সৎকর্মের উৎসাহ যোগায়।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার প্রধান চারটি উপাদান হল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষার পরিবেশ। এই চারটি উপাদানের মধ্যে শিক্ষার্থী বা শিশু এমন একটি উপাদান যাকে কেন্দ্র করে অন্য তিনটি উপাদান কাজ করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বা শিশুই শিক্ষার প্রধান বা মূল উপাদান। শিশু নিজে শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রধানতম উপকরণ হলেও প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্ধারণে সেই শিশুকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করে আসছে। শিশুর নিজস্ব প্রয়োজন, সামর্থ্য, আগ্রহ, পছন্দ-অপছন্দ, এসবকে উপেক্ষা করে সেগুলোর স্থানে বড় করা হয়েছে পিতামাতা, সমাজপতি, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির দাবিকে। শিশুর স্বাধীনতা ও নিজস্ব কর্মপ্রচেষ্টার কোনও স্থান ছিল না এই গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়। কেন শিশু শিখবে, কী শিখবে, কীভাবে শিখবে, কখন শিখবে এ সবেরই সর্বময় নিয়ন্ত্রক ছিলেন পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিগণ। শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা বলে কোন কিছুই ছিল না। সবই শিক্ষক পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে দিতেন এবং শিশুকে সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হত। এর ফলে এক দিকে যেমন শিশুর প্রাণশক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি খর্ব হত, তেমনি তার সৃজনমূলক কর্মদক্ষতা আত্মপ্রকাশের অভাবে নষ্ট হয়ে যেত।

কিন্তু ক্রমশ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর ভূমিকা বড় করে দেখার ইতিবাচক প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীনতা। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছামত চলাফেরা, পছন্দমত দলগঠন করা, পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ করা, নানাবিধ বস্তু তৈরি করা, স্কুলের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, ইত্যাদি বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজের মধ্য দিয়ে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় না দিয়ে সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। সহযোগিতার মনোভাব তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও দলবদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করে এবং সুষম ও স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তা গঠনে সাহায্য করে। তাই সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ পদ্ধতিই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি।

৪.৩ ফিডব্যাক গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি:জন হেরন ফিডব্যাক মডেল

সাধারণভাবে একটি কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদনের ফলাফল সম্পর্কে অন্যের মন্তব্য যা সম্পাদনকারীকে পরবর্তীতে কর্ম সম্পাদনের মান উন্নয়নে সহায়তা করে তাকে ফলাবর্তন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজের কাজের সবলতা-দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য পেশাগতভাবে অভিজ্ঞ অন্যকে পর্যবেক্ষণ করিয়ে সে অনুযায়ী পরবর্তীতে যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া তার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ফলাবর্তন বলা হয়। যে কোন পেশাগত উন্নয়নের একটি আধুনিক ও কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে ফলাবর্তন। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এর ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক পাঠদানকালে এবং পাঠদান শেষে শিক্ষার্থীদের এবং সতীর্থ শিক্ষকগণের নিকট থেকে মতামত, মূল্যায়ন, সমালোচনা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, নির্দেশনা ইত্যাদি আশা করেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পাঠদানের ওপর সতীর্থ শিক্ষকের, প্রশিক্ষকের কিংবা শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত মতামত, মূল্যায়ন, সমালোচনা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, নির্দেশনাকে ফলাবর্তন বলা হবে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যে কাজগুলো করেন তা তিনি পূর্ব পরিকল্পনা করে, অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু তার সেই কাজগুলো সত্যিই যথাযথভাবে সম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পাঠদানকারী শিক্ষক নিশ্চিত হতে পারেন না। কেননা তিনি নিজের সফলতা বা ব্যর্থতা চিহ্নিত করতে পারেন না। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এই পেশার অন্যজন যদি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে পরামর্শ দেন, ভুল থাকলে সংশোধন করে দেন, ভাল কাজগুলোর জন্য প্রশংসা করেন এবং উৎসাহ দেন তাহলে পাঠদানকারী শিক্ষক পরামর্শ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

ফিডব্যাক গ্রহণ ও প্রদান পদ্ধতি (Process of feedback)

Feedback is an essential part of education and training programmes. It helps learners to maximise their potential at different stages of training, raise their awareness of strengths and areas for improvement, and identify actions to be taken to improve performance.
(https://faculty.londondeanery.ac.uk/e-learning/feedback/what-is-feedback)। অর্থাৎ আধুনিক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ফলাবর্তন পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের একটি কার্যকর কৌশল বা প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে শিক্ষক নিজের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করতে পারেন। ভুল সংশোধন করতে পারেন। আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠতে পারেন। কার্যকর ফলাবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে-

- পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষিত শিক্ষক উভয়ই আলোচনা করে পাঠদানের পূর্বে শিখন-শেখানোর কিছু দক্ষতা ও কৌশলকে ফলাবর্তনের নির্ণায়ক হিসেবে চিহ্নিত করবেন;
- পর্যবেক্ষিত শিক্ষকের প্রত্যাশা অনুসারে চিহ্নিত দক্ষতা ও কৌশলগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকের সাথে আলোচনা করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন পর্যবেক্ষক কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন তা পূর্বে নির্ধারণ করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম রেকর্ড করতে চাইলে পূর্বেই পর্যবেক্ষিত শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে নিবেন;
- পর্যবেক্ষণ চলাকালীন সবল-দুর্বল দিকসমূহের নোট রাখবেন;
- পাঠদান চলাকালীন কোন কথা বা মন্তব্য করে পাঠের সাবলীলতা ও গতিশীলতা ব্যহত করা যুক্তিসঙ্গত হবে না;
- শিক্ষার্থীদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে পাঠদান কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষিত শিক্ষক একসাথে বসে পূর্বনির্ধারিত নির্ণায়ক অনুসারে গঠনমূলক ফলাবর্তন দিবেন এবং ফলাবর্তন গ্রহণ করবেন;
- সকল পর্যবেক্ষিত শিক্ষককে ভিন্নভাবে ফলাবর্তন দিতে হবে।

ফলাবর্তনের উপযোগিতা

Feedback is an essential part of effective learning. It helps students understand the subject being studied and gives them clear guidance on how to improve their learning.
(https://www.reading.ac.uk/internal/engageinfeedback/Whyisfeedbackimportant/)

- গুণগত পাঠদান ও কার্যকর শিখনের জন্য ফলাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ;
- মূল্যায়ন করার কৌশল রপ্ত হয়;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি হয়;
- সমালোচনা বা নেতিবাচক মন্তব্য গ্রহণ করা বা মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ হয়;
- অর্জিত শিখনফল জানা যায়;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যোগাযোগ বৃদ্ধি করে;
- প্রশিক্ষণার্থীর মনোভাব বোঝা যায়;
- প্রশিক্ষণার্থীর চাহিদা নিরূপণ করা যায়;
- প্রশিক্ষক সম্পর্কে জানা যায়।

ফলপ্রসূ ফলাবর্তন প্রদান কৌশল

ফলাবর্তন প্রশিক্ষণের একটি বিষয়। ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হয়। শিখন-শেখানোর গুনগত উন্নয়নে ফলাবর্তন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে তাই প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী ও কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটাতে হলে ফলাবর্তনের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ফলপ্রসূ ফলাবর্তন প্রদান করার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে।

- পাঠদানের ফলাবর্তন প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রথম থেকে ক্লাসে থাকতে হবে;
- কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করে ফলাবর্তন দেওয়া হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হবে;
- খণ্ডিতভাবে ফলাবর্তন প্রদান করা উচিত নয়;
- পূর্ব থেকেই ফলাবর্তনের নির্দিষ্ট নির্ণায়ক থাকা উচিত;
- ফলাবর্তন অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে;
- ফলাবর্তনে প্রথমে ইতিবাচক দিক এবং পরে নেতিবাচক দিক বলা উচিত;
- ফলাবর্তন শুধু বিদ্যমান গুণ বা দোষ প্রকাশ করেনা, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনাও থাকে।

জন হেরন এর ফিডব্যাক মডেল

জন হেরন একজন বিখ্যাত গবেষক ও শিক্ষাবিদ। তিনি যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের Human Potential Research Project এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। তিনি অংশগ্রহণমূলক গবেষণার প্রবক্তা হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। ফলাবর্তন পদ্ধতিটি পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমে খুবই কার্যকর। তাঁর ফলাবর্তন মডেলটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিখন-শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণের আত্মমূল্যায়ন এবং ঘনিষ্টভাবে পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং অনুশীলন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে জন হ্যারন ফলাবর্তন মডেলটি ব্যবহৃত হয়।

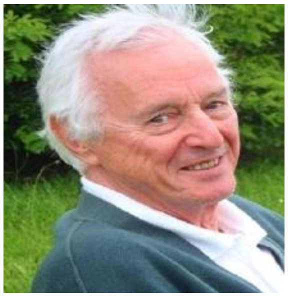

চিত্র ৩: জন হেরন

- এ মডেলে শিক্ষক প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, সতীর্থ সহকর্মী, বিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক বা সহযোগী শিক্ষক পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকবেন।
- এ মডেলের ৩টি স্তর একটি নির্দেশিত ক্রম অনুসরণ করে।

১. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে করণীয়

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক এবং পর্যবেক্ষক একত্রে বসে আলোচনা করে পূর্বেই শিক্ষণের কিছু দক্ষতা ফলাবর্তনের বা নির্ণায়ক নির্ধারণ করে নেবেন।
- নির্বাচিত নির্ণায়কগুলো সুনির্দিষ্ট পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নসংশ্লিষ্ট হতে হবে এবং পাঠদানের সময় পর্যবেক্ষণে মূল্যায়ন করা হবে।

২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকালীন করণীয়

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করার মধ্যে প্রশিক্ষক ও পর্যবেক্ষক তার পাঠের ভুলত্রুটিগুলো শনাক্ত করে নোট খাতায় লিখে রাখেন।
- এছাড়া পাঠের সবলদিক এবং বিষয়বস্তুর জ্ঞানের শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে মতামত লিখে রাখেন।

৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা শেষে করণীয়

- শিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, প্রশিক্ষক বা পর্যবেক্ষক আলোচনায় বসবেন;
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ও পর্যবেক্ষক পূর্বে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে তার গঠনমূলক ফলাবর্তন পেশ করেন এবং পাঠের ভুলত্রুটি তুলে ধরেন;
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্ণায়কের ভিত্তিতে তার শিক্ষণ সম্পর্কে অনুধাবন করবেন এবং শিক্ষণের সবল ও দুর্বল দিকগুলো ব্যক্ত করে উন্নয়নে আর কী করা যেতে পারে তা বলবেন;
- পর্যবেক্ষকগণ শিক্ষণ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক পরামর্শ দেবেন;
- পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর গঠনমূলক মন্তব্য এবং বর্ণনামূলক ফলাবর্তন দেবেন;
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পর্যবেক্ষকের মন্তব্যের আলোকে পরবর্তী শিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়নে সম্মত হবেন।

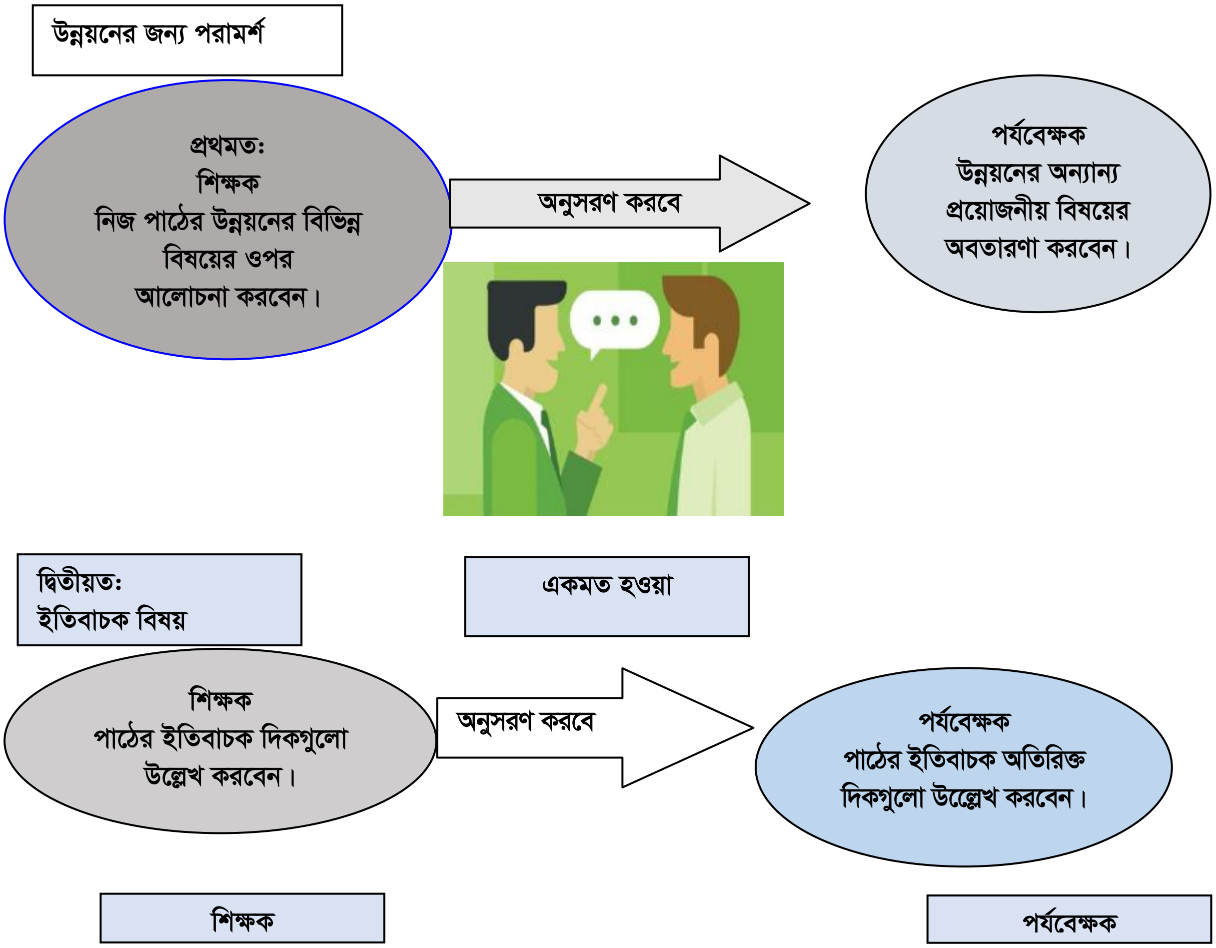

চিত্র ৪: জন হেরন এর ফলাবর্তন মডেল

ফলাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক পর্যবেক্ষকের ফলাবর্তনের সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তার বক্তব্য শুনবেন পরে তিনি‘ভালো’এবং‘কম প্রয়োজন’ এ সংক্রান্ত মন্তব্য করতে পারবেন;
- পর্যবেক্ষকও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ফলাবর্তনের সময় কোন বাধা না দিয়ে শুনবেন;
- ফলাবর্তনের জন্য প্রয়োজন দায়িত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক আচরণ। দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনার আগে সবল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন;
- সুনির্দিষ্ট দক্ষতার ওপর আলোচনা করা উচিত;
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক যে বিষয়গুলো আগে উল্লেখ করেছেন পর্যবেক্ষকের সে দিকগুলো পুনরায় আলোচনা না করা।
- ফলাবর্তন হওয়া উচিত পূর্বনির্ধারিত নির্ণায়ক বা শর্ত অনুসারে;
- ফলাবর্তন হবে গঠনমূলক এবং সহজ, সুনির্দিষ্ট ও বর্ণনামূলক;
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক অনুশীলন পাঠদান চলাকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষক, সতীর্থ প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে এ মডেলের ভিত্তিতে ফলাবর্তন পেতে পারেন যা তার শিক্ষণ দক্ষতার সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করবে।

৪.৪ ভূমিকাভিনয় কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানা

ছোট শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই তারা ভাই-বোন, খেলার সাথীরা একত্রে খেলার ছলে অভিনয় করে থাকে। তারা বাবা, মা, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করে, যা অনুকরণের মাধ্যমে শিখে থাকে। তারা স্বর্তঃস্ফূর্তভাবে এসব করে থাকে। তাদের এ আগ্রহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োগ করতে পারলে শিখন আরও ফলপ্রসূ হবে।

ভূমিকাভিনয় কৌশল

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ভূমিকাভিনয় কৌশল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সহজেই শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব। অভিনয়ের মাধ্যমে কোন পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনের প্রক্রিয়াই হল ভূমিকাভিনয় কৌশল। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়নের উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতির উদ্ভব।

এ পদ্ধতি ব্যবহারের সময় শিক্ষক নিজেও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন কিংবা তিনি নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনার অন্তরালে থাকতে পারেন। শিশুরা নাটক দেখতে পছন্দ করে। তারা অভিনয় করতেও পছন্দ করে। শিক্ষনীয় বিষয় নাটকে, রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিনয় করালে শিক্ষার্থীদের ঐ বিষয় সর্ম্পকে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। স্পষ্ট ধারণা ছাড়া কোন নির্দিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মে।

ভূমিকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য

- ভূমিকাভিনয়ের দৃশ্যপট হয় পাঠ্য বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- ভূমিকাভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে হয়;
- এ কৌশলে চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে একসঙ্গে দেখানো হয়;
- শিক্ষার্থীরা যেন বাস্তব অবস্থায় শিক্ষা লাভ করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়;
- এ কৌশলের মাধ্যমে সম্ভাষণ, শারীরিক ভাষা ও বাচনভঙ্গির উন্নতি ঘটে।

কার্যকর ভূমিকাভিনয়ে শিক্ষকের করণীয়

- বিষয়বস্তু নির্ধারণ;
- চরিত্র সুস্পষ্ট করতে দৃশ্যপট বা কাহিনী চিত্র প্রণয়ন;
- দলীয় আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা নির্বাচন;
- কথোপকথনের ভাষা, মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভাষার দিকগুলোর প্রতি নির্দেশনা প্রদান;
- অভিনয় পরিচালনা;
- ফিডব্যাক প্রদান (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে);
- মূল শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট থেকে আদায়।

শিক্ষার্থীর প্রকাশিত গুণাবলি

- শিক্ষণীয় বিষয় সুস্পষ্ট হয়;
- পাঠটি আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে;
- শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়;
- দলগত অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে;
- শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতার বিকাশ হয়;
- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন ঘটনাকে বাস্তবের মত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয়;
- আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সক্ষম হয়।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের প্রয়োগক্ষেত্র

বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম শিক্ষা প্রতিটি বিষয়ে এ কৌশল কার্যকর।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের সুবিধা

- গতানুগতিক পাঠদান অপেক্ষা এ কৌশল ভিন্নতর;
- একঘেয়ে ভাব দূর হয়;
- পাঠদান ও পাঠগ্রহণে বৈচিত্র্য আসে;
- শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

ভূমিকাভিনয় কৌশলের অসুবিধা

- ভূমিকাভিনয় সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া;
- সব শিক্ষার্থীর মনোযোগ একসঙ্গে ধরে রাখা কষ্টকর;
- সঠিক পরিচালনার জন্য যোগ্য পারদর্শী শিক্ষক প্রয়োজন।

ভূমিকাভিনয়ের কৌশলের ধরন

সম্ভাষণ কৌশল

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ। আর এই সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রধান কৌশল হলো শিক্ষকের সম্ভাষণ।

সাধারণভাবে সম্ভাষণ অর্থ বাক্যালাপ। কারও সাথে আলাপ করার পূর্বে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়; যেমন- আরে ভাই, ওহে, ওগো ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন প্রবেশ করেন তখন শিক্ষকের প্রথম সম্ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে শিক্ষকের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। সম্ভাষণ কৌশল হবে-

- সুন্দর ও আর্কষণীয় সম্ভাষণের মাধ্যমে কুশল বিনিময়;
- বিশেষ দিন হলে সেভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন যেমন- নববর্ষের, মাদারস ডে, নারী দিবসের শুভেচ্ছা ইত্যাদি;
- শিক্ষার্থীর সহযোগী হিসেবে কাজ করা;
- শিক্ষার্থীর নাম ধরে ডাকা;
- 'তুমি' সম্বোধন করা;
- শিক্ষককের হাসিখুশি থাকা, রুক্ষ না হওয়া;
- স্নেহপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় এমন ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করা।

সম্ভাষণের গুরুত্ব

- শিক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে;
- শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও মার্জিত আচরণ অর্জন করে;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল হয়;
- শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়;
- শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসী হয়;
- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা সমৃদ্ধ হয়।

মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক ভাষা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে মৌখিক অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভিব্যক্তিহীন বক্তৃতায় শিক্ষার্থী ক্লান্তিবোধ করে, তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। বক্তৃতার মাঝে মাঝে শিক্ষক অঙ্গভঙ্গি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করতে পারেন। ফলে তারা পাঠে আগ্রহী হয় এবং সহজে তথ্যের মূলভাব বুঝতে পারে।

শিক্ষকের অভিব্যক্তি ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার

- আকর্ষণীয় মার্জিত বাচনভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহার;
- পাঠ সূচনায় ভাষা ও অভিব্যক্তি হবে আর্কষণীয়;
- পাঠের বিষয়বস্তু চিত্তাকর্ষক গল্পের মত রসালো ভাষায় মার্জিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে;
- বিভিন্ন ধরনের ভাব প্রকাশে মুখমণ্ডলসহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গি করতে অভ্যস্থ হতে হবে। যেমন- কোন কাজ পাঁচবার করতে বললে পাঁচ আঙ্গুলে দেখিয়ে বলা;
- বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা এমনকি বিদেশী ভাষাও ব্যবহার করতে জানতে হবে;
- কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, মূকাভিনয়, ভূমিকাভিনয়ের সময় শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে;
- জ্ঞানের গভীরতা থাকতে হবে যেন প্রয়োজনে কোন দৃষ্টান্ত, গল্প, উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে পারেন;
- শিক্ষকের দৈহিকভাষা এমন হবে যেন শিক্ষার্থীরা তার দৈহিক ভাষা থেকেই বক্তব্য বুঝতে পারে;
- এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শিক্ষক কথা বলবেন না আবার বেশি হাটাহাটিও করবেন না;
- ভাল কাজের স্বীকৃতি যখন তিনি দিবেন তখন তার প্রকাশও ঐ শব্দ ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;
- পাঠদানকালে শিক্ষক হাসিখুশি ও নমনীয় থাকবেন;
- শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে একজন ভাল অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।

বলা বা পড়ার সঙ্গে শুধুমাত্র বাকপ্রত্যঙ্গ নয় দেহও কথা বলে। শিক্ষক যখন পড়েন তখন কণ্ঠ ধ্বনি তৈরি করে এবং সেই সঙ্গে হাত, চোখ, ও মুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

সম্ভাষণ কৌশল প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ দিক

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা অবশ্যই শালীন, সৌজন্যপূর্ণ প্রশংসাবাচক হবে। এক্ষেত্রে বিশেষণবাচক ও গুণবাচক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়। তবে কৃতজ্ঞতার নামে অহেতুক বিনয় ও শিষ্টতা শিক্ষকের ব্যক্তিসত্তাকে ক্ষুন্ন করে।

দুঃখ প্রকাশ : দুঃখ প্রকাশের ক্ষেত্রেও সংযম ও পরিমিতি প্রদর্শন করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় তা হল– আঃ খুবই দুঃখজনক, সব ঠিক হয়ে যাবে ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে উপযুক্ত স্বরভঙ্গি ও শারীরিক ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

অনুরোধজ্ঞাপন : অনুরোধের ভাষায় বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ পাবে। তবে মনে রাখতে হবে অনুরোধ করতে গিয়ে যেন হীনমন্যতা প্রকাশ না পায়। অন্যদিকে অনুরোধ যেন 'দাবি' না হয়ে যায় সেটিও দেখতে হবে। 'আমরা আশা করি, আপনি আমাদের কাজটি করে দেবেন' এ কথাটি যতটা গ্রহণযোগ্য; 'আপনাকে কাজটি করতেই হবে', ততটা গ্রহণযোগ্য নয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন : ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভাষায় বিনয় ও নম্রতা থাকবে। গুণবাচক বিশেষ্য, বিশেষণবাচক যেমন-ধন্যবাদ, চমৎকার, অপূর্ব, অদ্ভুত, ভালো, বেশ ভালো ইত্যাদি শব্দ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নির্দেশ ও আদেশ প্রদান : নির্দেশ ও আদেশ প্রদানের ভাষা হবে দৃঢ়তাব্যঞ্জক। এক্ষেত্রে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি সহজে বুঝে তদানুযায়ী কাজ করতে পারে এমন সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আদেশ ও নির্দেশ প্রদানের সময় শ্রোতার নিরবতা একান্ত কাম্য।

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন : অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের ভাষায় সুরুচি ও সৌজন্যবোধের প্রকাশ ঘটবে। এক্ষেত্রে বিনয় ও শিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-' আসুন, আসুন', 'এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম', 'গরিবের বাড়িতে ধুলো পড়ল'; ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আনন্দ প্রকাশ : আনন্দ প্রকাশের ভাষায় আবেগের স্পর্শ থাকবে। কণ্ঠস্বরের ওঠানামাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যেসব শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয় তা হল– অভিনন্দন, মোবারকবাদ, বেঁচে থাক, সুখী হও, ইত্যাদি ।

৪.৫ সাদা- কালো বোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন

সাদা-কালো বোর্ড একটি সুলভ, কার্যকর ও সর্বাধিক ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে সাদা-কালো বোর্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। মূল্য ও স্থায়িত্বের বিচারে এটি অতি প্রয়োজনীয়। যে কোন বিষয় শুধুমাত্র মৌখিক বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন না করে ছবি এঁকে, লিখে তা ব্যাখ্যা করলে শিক্ষার্থীদের নিকট তা সহজেই বোধগম্য হয়। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়েই বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিকক্ষে বোর্ডের ব্যবহার ছাড়া কখনও পাঠদান ফলপ্রসূতা লাভ করে না।

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোর্ডের গুরুত্ব

- বোর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য উপকরণ;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আর্কষণের জন্য এটি একটি অন্যতম শিক্ষা উপকরণ;
- এটি দীর্ঘস্থায়ী এবং স্বল্প খরচে পাওয়া যায়;
- বোর্ডে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাকে সক্রিয় ও আনন্দপূর্ণ করে তোলা যায়;
- বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের খাতায় লেখার অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন স্থায়ী হয়;
- অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে তথ্য উপস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বোর্ড;
- শিক্ষার্থীরা বোর্ডের মাধ্যমে শিখনের সঠিক নির্দেশনা পায়।

বোর্ডের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে এবং তার কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেগুলো হল-

- বোর্ডটি শ্রেণিকক্ষের এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যেন শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায় এবং তা থেকে আলোর প্রতিফলন না হয়;
- বোর্ডের কোন অংশে কী তথ্য লেখা হবে তা পরিকল্পনা করতে হবে;
- লেখা শুরুর আগে বোর্ডটি পরিষ্কার করে নিতে হবে;
- বোর্ডের একেবারে উপর থেকে লেখা শুরু করতে হবে;
- বোর্ডের বাম দিক থেকে লেখা শুরু করতে হবে;
- বোর্ডে লেখার সময় সরাসরি বোর্ডের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে লেখা যাবে না;
- লেখার সময় এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়;
- বোর্ডের লেখার লাইন সোজা হবে;
- লেখার গতি খুব দ্রুত হবে না;
- শিক্ষককে বোর্ডে লেখার সাথে সাথে মুখেও উচ্চারণ করতে হবে;
- লেখা তথ্যগুলো শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নিচ্ছে কিনা তা-ও দেখতে হবে;
- স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষের শেষ অবস্থান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আন্ডারলাইন করা বা আলাদা রং ব্যবহার করে লেখা যেতে পারে;
- পয়েন্ট উপস্থাপনে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে;
- প্রয়োজনীয় গ্রাফ, চিত্র অংকন সঠিকভাবে করতে হবে;
- বোর্ড মোছার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, সকল শিক্ষার্থী তথ্যগুলো সঠিকভাবে লিখতে পেরেছে;
- বোর্ডের লেখা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল হতে হবে;
- একটি ধারণার পর অন্য একটি ধারণা অবতারণা করার সময় পূর্বের লেখা মুছে দিতে হবে। নতুবা নতুন ধারণার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকৃষ্ট হবে না;
- বোর্ডের কাজ যদি দীর্ঘসময় ধরে করতে হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা দিতে হবে;
- বোর্ডের কাজ খুব বেশি সময় ধরে না করে প্রয়োজনীয় স্বল্পতম সময়ে শেষ করতে হবে;
- মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদেরও বোর্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন;
- বোর্ডে লেখার সময় যেন চক বা কলমের শব্দ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে;
- পাঠদান শেষে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে শিক্ষক নিজে বা শিক্ষার্থীর সহায়তায় বোর্ড মুছতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের সুন্দর হাতের লেখার অনুশীলন ও ভাষাশৈলীর জন্য লেখার দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন।

সাদা-কালো বোর্ডে হাতের লেখার দক্ষতা উন্নয়ন

- বোর্ডে প্রতিটি লাইনে ডাবল স্পেস ব্যবহার করতে হবে;
- মার্জিন রেখে লেখা শুরু করতে হবে;
- দুটি শব্দের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে;
- ইংরেজিতে বড় অক্ষর এবং ছোট অক্ষরের আকার সমান হবে।

বোর্ড ব্যবহারের সুবিধা

- স্বল্প ব্যয়ে দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য;
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা যায়;
- গণিতের ক্ষেত্রে বিমূর্ত বিষয়গুলো বুঝানোর জন্য বোর্ড অত্যাবশ্যক উপকরণ;
- দলীয় কাজ উপস্থাপনের সময় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট লিখে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আর্কষণ করা সম্ভব;
- বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিত্র, শব্দ, তথ্য সহজভাবে বোর্ডে উপস্থাপন করা যায়।

অসুবিধা

- চকের গুঁড়া শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের চোখের জন্য ক্ষতিকর;
- এছাড়া শিক্ষকের কাপড়-চোপড়, চুল, মুখমণ্ডলও ময়লা করে;
- প্রতি ক্লাসের পরে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করাও সমস্যা;
- অনেক সময় বোর্ডে লেখার জন্য সময় বেশি ব্যয় হয়।

বোর্ডের কাজে পরিচ্ছন্নতা

- বোর্ডে সমান্তরালভাবে শব্দ বা বাক্য লিখতে হবে;
- কোনভাবেই বোর্ড অপরিচ্ছন্ন করা যাবে না;
- প্রাসঙ্গিক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে হবে;
- ছবি, চিত্র স্পষ্টভাবে অংকন করতে হবে।

সাদা-কালো বোর্ড ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের জন্য মাইক্রোটিচিং-এর একটি অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণের বোর্ডের ব্যবহার অনুশীলন করানো যেতে পারে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আন্তঃব্যক্তিক ও যোগাযোগ দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
২. শারীরিক ভাষা বলতে কী বোঝায়?
৩. ফিডব্যাক কী ?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ক) যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
খ) শোনার দক্ষতার অনুশীলন করার উপায় চিহ্নিত করুন।
২. ক) শ্রেণিকক্ষে কন্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলনের সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ করুন।
খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ইতিবাচক সর্ম্পকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. ক) কার্যকর ফলাবর্তনের জন্য করণীয়গুলো ব্যাখ্যা করুন।
খ) জন হেরন ফিডব্যাক মডেলটিব্যাখ্যা করুন।
৪. ক) ভূমিকাভিনয় বলতে কী বোঝায়?
খ) ভূমিকাভিনয়ের কৌশল হিসেবে সম্ভাষণ কৌশলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৫. ক) শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
খ) বোর্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের কী কী নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন? উল্লেখ করুন।

ইউনিট ৫ : শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

শ্রেণি কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটে শ্রেণিকক্ষে। তাই শ্রেণিকক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ আবশ্যক। এই পরিবেশ তৈরির মূল দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমাজের। শ্রেণিকক্ষে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে পরিচালনায় করণীয়-বর্জনীয় দিক জানা আবশ্যক। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপে বিন্যাস করে উপস্থাপন করা হলো-

৫.১ আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা, কৌশল ও গুরুত্ব;
৫.২ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ: অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও সামাজিক দিক;
৫.৩ শিক্ষার্থীর আচরণ নীতিমালা নির্ধারণ;
৫.৪ প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা অনুশীলন;
৫.৫ অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কৌশল;
৫.৬ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ ও সমাধানের উপায় অনুসন্ধান।

৫.১ আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা, কৌশল ও গুরুত্ব

শিক্ষা ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য শিক্ষানীতি, সম্পদ, প্রশাসন এবং নেতৃত্ব, আইন এবং সামাজিক মূল্যবোধ, কর্মসূচি এবং পেশাগত উন্নয়ন, শিক্ষাক্রম এবং মূল্যায়ন ইত্যাদির সব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংগঠিত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাই শ্রেণিকক্ষ। যেখানে প্রায় সমবয়সী কিছু শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট সময়ে, একজন শিক্ষক একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন।

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র একক হল শ্রেণিকক্ষ। এটি প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের ভিতর হতে পারে আবার শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও হতে পারে। মূলত কোন প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান চর্চার স্থানই হল শ্রেণিকক্ষ। অর্থাৎ যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অবস্থান করে জ্ঞান চর্চা করা হয় তাকেই শ্রেণিকক্ষ বা Classroom বলে। যখন বলা হয় " বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র" তখন শ্রেণিকক্ষের চেতনার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হাসিল করার জন্য ভৌত এবং মানবীয় উপাদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা করে জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সামগ্রিক প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ আচরণের দ্বারা ভৌত ও মানবীয় উপাদানের সার্বিক ব্যবহার করে জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাকেই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বা Classroom Managrment বলে। একে আবার তাত্ত্বিক ও ব্যাপক অর্থে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা নামে অভিহিত করা হয়। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন শ্রেণি শিক্ষক।

আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা

শিক্ষক শিক্ষাক্রমের আলোকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়াকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন তাকেই শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বর্তমানে বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষারমান উন্নয়ন বিষয়ে পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। কারণ একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান সূচক হচ্ছে ঐ দেশের সকল নাগরিকের সুষম ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান। শিক্ষাবিদদের মতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কৌশল পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ সতীর্থ শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করার মাধ্যমে হতে পারে এবং তা শিক্ষার্থীর নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণের শ্রেণিকক্ষের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় শিখন সরাসরি শিক্ষক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাদের মতে, শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধান শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এ নবতর পদ্ধতিতে শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে উদারতার পরিচয় দিতে হয় এবং তারা নিজেরাও শিক্ষার্থীদের সাথে এপদ্ধতি সম্পর্কে আরও অভিজ্ঞতা লাভ করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। শিক্ষাবিজ্ঞানীদের মতে, একটি সফল শ্রেণিকক্ষ বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সে আলোকে শিক্ষাক্রম ও প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং শিক্ষকগণেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে শিক্ষক শিক্ষার্থী যুগ্মভাবে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে শিখনফল অর্জন করতে পারে।

শিক্ষা গবেষকগণের মতে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন হলে তা প্রতিফলনের একমাত্র স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। কারণ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির সূচনা ঘটছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সর্বক্ষেত্রে আজ শিক্ষার মান নিয়ে শংকিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংস্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শ্রেণিকক্ষে উন্নততর পাঠদান। আর এ সব কর্মকাণ্ডকে সার্থক করার ক্ষেত্রে যিনি চালকের আসনে বসে আছেন তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। কারণ সকল সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতিতে যত সংস্কারই করা হোক না কেন এর প্রতিফলন শ্রেণিকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত না হলে শিখনমাত্রায় এর কোন অবদান রাখবে না।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন-

১. ভৌত ব্যবস্থাপনা
২. মানবীয় ব্যবস্থাপনা

১. ভৌত ব্যবস্থাপনা

এ ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত ভৌত সুবিধাদি, যেমন

– শ্রেণিকক্ষ
– শিক্ষার্থী উপযোগী আসন সামগ্রী
– বোর্ড
– বোর্ডে লেখার সামগ্রী

২. মানবীয় ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থীর পাঠ ধারণ উপযোগী সুবিধাদি এ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। যেমন,

– শ্রেণিবিন্যাস
– পাঠ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি
– ফলপ্রসূ পাঠ উপস্থাপন
– শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি
– বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার
– পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ
– শ্রেণি পর্যবেক্ষণ
– প্রয়োজনে নিরাময়মূলক পাঠ উপস্থাপন।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের অন্যতম স্থান। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী একটি অন্যরকম আবহ সৃষ্টি করে। কারণ শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষের নায়ক, পরিচালক হলেন শিক্ষক। নিজের সব কিছুকে উজাড় করে দিয়ে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন শিক্ষক, উদ্দেশ্য একটিই শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষা অর্জন। তাই পরিপাটি সুসজ্জিত একটি শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে শিক্ষক কখনোই কার্পণ্য করেন না। প্রমিত উচ্চারণে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, শালীন ও রুচিশীল পোশাক এবং গ্রহণযোগ্য শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ব্যবস্থাপনা কৌশলের মধ্যেই পড়ে।

শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত কাজের প্রশংসা করা, শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান নজর রাখা পাঠদানের অন্যতম কৌশল। এতে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তবে শিক্ষার্থীদের নাম ধরে ডাকা শিক্ষকের একটি বিশেষ গুণ এবং পাঠ উপস্থাপন কৌশল। যারফলে শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাদের বয়স চাহিদা ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হয়। অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্যতম কৌশল। সকল ধরনের মেধার শিক্ষার্থীদের (উচ্চ মেধা, স্বল্প মেধা ও নিম্নমেধা বা পিছিয়ে পড়া) প্রয়োজনে বোর্ডেডেকে এনে কোন কিছু লিখতে দেওয়াও শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল। এতে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে। শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কৌশলগত দিকও রয়েছে।

এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করবেন। আবার তাদের কাঙ্ক্ষিত আচরণও নিশ্চিত করবেন। শ্রেণিকক্ষে কাঙ্ক্ষিত আচরণে উদ্যোগী হয়ে বৃহত্তর সমাজে যেন নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে সে দিকটিও শিক্ষক যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। শিক্ষার লক্ষ্যের বাস্তবরূপ দিতে শিক্ষক সচেষ্ট হবেন। সে উদ্দেশ্যে পাঠ আকর্ষণীয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও দীর্ঘস্থায়ী শিখন উপযোগী করে তুলতে শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও যথাযথ ব্যবহার করবেন।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

কার্যকর পাঠদান ও পাঠগ্রহণের জন্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীর আচরণিক, সামাজিক ও নির্দেশনামূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাই পাঠদানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রেণির কাজ শেষ করা, শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপরোক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অত্যধিক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠদান কার্যক্রম শেষ করে শিখনফল নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থী মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর শিখন পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ফলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে কার্যকরী ও আনন্দময় করার ক্ষেত্রে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য আনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরোক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে কার্যকর পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এ কথা সত্য, বিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চার স্তরভিত্তিক কেন্দ্রস্থল হলো শ্রেণিকক্ষ। যেখানে শিক্ষকের একনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করে থাকে। কাজেই বিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে যা হয়তো অন্য কোথাও পাওয়ার সুযোগ নাও হতে পারে। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হলো-

- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে অবারিত জ্ঞান চর্চার সুযোগ দেওয়া হয়;
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অবস্থানের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা হয়;
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের পরিসর বর্ধিত হয়;
- এর ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়;
- আদর্শ শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শ্রেণিতে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের দুষ্টুমি প্রবণতা কমে;
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথার্থ হলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ বৃদ্ধি পায়;
- আদর্শ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ফল পাঠকে সজীব করে প্রত্যেক শ্রেণিতে পদ্ধতিগতভাবে পাঠদান করা সম্ভব হয়ে থাকে;
- আদর্শ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যথেষ্ট বাড়ে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণগত অবস্থা রোধ করা সম্ভব হয়ে থাকে;
- এর ফলে শ্রেণিকক্ষকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায়;
- আদর্শ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ফলে আনন্দদায়ক এবং সাবলীল পাঠদান ব্যবস্থাকে শিক্ষকের প্রয়োজনমতো সম্পন্ন করা সম্ভব হয়;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আত্মিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়;
- বিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়;
- যথার্থ উপকরণের সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়;
- শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন যথার্থভাবে সম্পন্ন করা যায়;
- বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম ফলপ্রসূ করা যায়;
- ঝরে পড়া বা অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পায়;
- সার্বিক মূল্যায়নে বিদ্যালয়ের ফলাফল ভাল হয়;
- শিক্ষকের দায়িত্ব সচেতনতা এবং কর্ম তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়।

৫.২ শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ : অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক ও সামাজিক দিক

শ্রেণিকক্ষ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়ে আনন্দ সহকারে পাঠগ্রহণে আগ্রহী হবে না। অতএব শ্রেণিকক্ষের ভেতর-বাহির অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক ব্যবহার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সামাজিক পরিবেশের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। এ সকল দিক বিবেচনায় শ্রেণি কক্ষের পরিবেশের তিনটি দিক রয়েছে। ক) শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ খ) শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ গ) শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশ। নিম্নে এ গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো-

ক) শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ

শ্রেণিকক্ষের সুন্দর পরিচ্ছন্ন অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পাঠদান ও পাঠগ্রহণের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। শ্রেণি কার্যক্রমকে আনন্দদায়ক ও গ্রহণযোগ্য করতে সহায়তা করে। এর জন্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা উপকরণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে শ্রেণিকক্ষটি সাজিয়ে রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষের মেঝে, পাশের দেয়াল, উপরের ছাদ পরিষ্কার থাকা বাঞ্ছনীয়। আসন বিন্যাস সুসজ্জিত থাকা আবশ্যক। শ্রেণিতে দলীয় কাজ করার জন্য প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। মোট কথা শ্রেণিকক্ষটির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমন হবে যা দেখলে শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ অনুভব করে। যতটা সময় শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবে ততটা সময় যাতে প্রাণবন্ত থাকে। শ্রেণিকক্ষের নীতিমালা মানা, রুটিন অনুযায়ী শ্রেণিকার্যক্রম, পাঠদানের নির্দিষ্ট সময়কে যথাযথ ব্যবহার অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সুন্দর রাখে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন আকৃতিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। শ্রেণি কক্ষের অভ্যন্তরে অবশ্যই পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সেজন্য কক্ষের মাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দরজা জানালা রাখতে হবে। যাতে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাতাস খেলা করতে পারে। শ্রেণি অভ্যন্তরে লাইট যথাযথ জায়গায় লাগাতে হবে। যেন কক্ষের সকল স্থানে আলো পৌঁছে। আলোর বিপরীতে হোয়াইট বোর্ড বা ব্ল্যাক বোর্ড স্থাপন করতে হবে যেন পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বোর্ডের লেখা দেখতে অসুবিধা না হয়। দলীয় কাজসহ অন্যান্য পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য শ্রেণি অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে।

খ) শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ

শিক্ষার্থীরা যে কক্ষে শ্রেণি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকবে সে কক্ষের বাইরের পরিবেশকে শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ বোঝানো হয়েছে। যেমন :বারান্দা, সিঁড়ি, মাঠ, বিদ্যালয়ের প্রবেশপথ,পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। অবশ্যই শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে হবে। সেদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী,পরিচালনা পর্ষদ ও শিক্ষার্থীদের নজর দিতে হবে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বারান্দায় বালি, কাগজের টুকরো, চিপসের প্যাকেট, তেঁতুল বিচিসহ বিভিন্ন ময়লা আবর্জনায় ভরপুর থাকে। সিঁড়িগুলো, নালা নর্দমা অপরিষ্কার, দুর্গন্ধযুক্ত এ ধরনের পরিবেশ- অস্বাস্থ্যকর ও চলাচলের অনুপযোগী। এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠে মন বসানো কষ্টকর। তাই শ্রেণিকক্ষের বাহ্যিক পরিবেশ যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয় সেদিকে আন্তরিকভাবে নজর দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক পরিবেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠানের চারিদিকে বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চারা লাগাতে হবে। বিদ্যালয়ের সামনে মৌসুমী ফুলের চাষ করলে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে সারা বছর উজ্জ্বল থাকবে। কিছু কিছু ফুলগাছ আছে যেগুলোতে সাড়া বছর জুড়ে ফুল ফোটে যেমন- জবা, গোলাপ ইত্যাদি গাছের চারা লাগানো যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি ও বারান্ধায় নানান ফুলের বা পাতা বাহারের গাছ টবে সাজানো যেতে পারে। টবের গায়ে ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের প্রলেপ দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া যায়। পুরো প্রতিষ্ঠানে দৃশ্যমান স্থানে মনষীদের বাণী টাঙ্গানো যায়। এছাড়াও দেশের নানা স্থানের যেমনঃ সুন্দরবন, নীলগিরি, কক্সবাজার, পাহাড়পুর ইত্যাদি স্থানের ছবি স্থাপন করে বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। এ ছাড়াও বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি, ভাষা শহীদ , বীরশ্রেষ্ঠ, দেশের মানচিত্র সেঁটে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য যেমন বাড়বে তেমনি এছবি গুলো থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতেও পারবে।

গ) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের সামাজিক দিক

সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একে অপরের সম্পূরক এবং পরিপূরক। একটি ব্যতীত অন্যটির কথা ভাবাই যায় না। সমাজ নেইতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক অস্থিরতা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। তাই কোলাহল মুক্ত, নিবিড় পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যাতে কোন ধরনের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয় সমাজের প্রতিচ্ছবি এখানে সকল ধর্ম ও বর্ণের, শ্রেণি, পেশার মানুষের

সন্তানরা প্রকৃত মানুষ হওয়ার মন্ত্র নিবে। অতএব এ পরিবেশ সুন্দর রাখার, শান্ত রাখার দায়িত্ব সমাজের সকলেরই। তাই শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে নিরাপদ শিখন পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সমাজের সদস্যদের ডেকে বিদ্যালয় পরিচালনার পরামর্শ নিতে হবে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। মা সমাবেশ বা শিক্ষক অভিভাবক সমাবেশ করে সকলের করণীয় সম্পর্কে সচেতন করলে বিদ্যালয় তথা শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ উন্নয়নে সমাজের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
আমাদের মনে রাখতে হবে শ্রেণিকক্ষ থেকে তৈরি হবে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাই শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ নিরাপদ রাখার দায়িত্ব সমাজেরও রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ যদি নেতিবাচক হয় শিক্ষার্থীরা মন্দ আচরণ শেখে। অবশ্যই এর প্রভাব সমাজের ওপর পড়বে। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পেশা,ধর্ম,বর্ণ, ধনী,দরিদ্র প্রভৃতি মানুষের সন্তানরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করে। সকলের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের একটি বন্ধন সৃষ্টি হয় সেইদিকে অবশ্যই শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষক কখনও কোন প্রকার গোষ্ঠী স্বার্থে কথা বলবেন না। তবেই একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য শ্রেণি পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যা আলোকিত সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক।

বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিরাপত্তার জন্য কৌশল নির্ধারণ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু সম্পদ থাকে যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রথম থেকেই যদি সম্পদগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায় তা হলে প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়। কারণ সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে বৃহৎ কর্মের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং দিন দিন সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হয়। যদি বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহার যথাযথ না হয় এবং এগুলো নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায় তাহলে প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকা কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও গুণগত মান দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। নিচে সংক্ষিপ্ত পরিসরে করণীয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হল-

প্রথমত : প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : সম্পদের প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার উপযোগিতা বিবেচনায় একটি তালিকা তৈরি করতে হবে এবং যথাযথ স্থানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত : বিষয় অনুযায়ী আলাদা কক্ষ নির্দিষ্ট করে সম্পদ সংরক্ষণ করলে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা সহজ হয়।

চতুর্থত : সংরক্ষিত স্থানটি কতটা নিরাপদ, রোদে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে অথবা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে এমন স্থান নির্ধারণ না করা শ্রেয়। স্থানটি সম্পদ সংরক্ষণে উপযুক্ত হতে হবে।

পঞ্চমত : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সম্পদগুলো দেখার ও যত্ন নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে লিখিতভাবে দায়িত্ব দিতে হবে।

ষষ্ঠত : ব্যবহারের জন্য সম্পদগুলো কে, কখন নিয়েছে তা তারিখ উল্লেখপূর্বক রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ রাখা জরুরি। এতে সম্পদ হারানোর সম্ভবনা কমে যায়।

সবশেষে প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও যত্ন নেওয়ার মূল দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানের। তিনি মাঝে মাঝে সম্পদগুলোর স্থিতি এবং অবস্থা দেখার ব্যবস্থা রাখবেন।

৫.৩ শিক্ষার্থী আচরণ নীতিমালা নির্ধারণ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় না রাখলে শ্রেণি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষকগণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি সম্পন্ন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের কাম্য আচরণ নীতিমালা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

ক) নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া;

খ) ক্লাশের নিয়মকানুন মেনে চলা;

গ) নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরিধান করা;

ঘ) পড়া-লেখায় মনোযোগী হওয়া;

ঙ) স্কুল পালানো থেকে বিরত থাকা;

চ) শিক্ষকের প্রতিটি আদেশ নিষেধ মান্য করা;

ছ) বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিকক্ষে কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করা;

জ) বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর প্রতি (ছাত্র-ছাত্রী) সমান সম্মান, শ্রদ্ধা ও স্নেহের মনোভাব সৃষ্টি করা;

ঝ) শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, শ্রেণি অভীক্ষা, নির্ধারিত কাজ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকবৃন্দকে সহায়তাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। তাদের ছোট-খাটো ভুলত্রুটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংশোধন করে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কোন সমস্যা থাকলে তা একান্তে জেনে নিয়ে গঠনমূলক পরামর্শ দিবেন শিক্ষক। মা-বাবা, অভিভাবক, সমাজের সদস্যদেরও শিক্ষার্থীদের সৎ আচরণের জন্য পরামর্শ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের। তাদের আচরণে উগ্রতা থাকতেই পারে। শিক্ষার্থীদের সন্তানের মতো গণ্য করে তাদের সুপরামর্শ দিলে তারা নিশ্চয়ই ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করবে। শিক্ষার্থীরা সময়কে মূল্য দিবে। শ্রেণি কার্যক্রম শেষে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি বা বাসায় ফিরে যাবে। সন্ধ্যার পর প্রার্থনা শেষে পড়তে বসবে। টিভি, সিনেমা দেখে বা প্রযুক্তিনির্ভর ডিভাইস ব্যবহার করে সময় নষ্ট করবে না। উল্লেখিত আচরণিক নীতিমালা পালনের অনুশীলন বা চর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে শিক্ষার্থীদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে। শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের ফলে শিক্ষার্থীরা তাঁর সকল আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করবে। শ্রেণি শৃঙ্খলাও বজায় থাকবে।

পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান : ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য শাসন ও সোহাগ অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি দুটোই প্রয়োজন আছে। প্রবাদ আছে বাপে বানায় ভুত, শিক্ষক বানায় পুত। বাবার কাছে থাকলে যে সন্তান প্রকৃত অর্থে মানুষ হয় না তাকে শিক্ষক পুরস্কার ও প্রয়োজনে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ তৈরি করে। পুরস্কার হলো শিক্ষার্থীর সদাচরণের জন্য প্রাপ্ত প্রেষণা যা পরবর্তীতে শিক্ষা অর্জন ও সুশৃঙ্খলভাবে চলার জন্য আগ্রহী করে তোলে।
যেমন: তুমি চমৎকার উত্তর দিয়েছ। আমি এমনটিই ভাবছিলাম। অথবা সঠিক উত্তরের জন্য এই পেন্সিলটি তোমার। তবে মনে রাখতে হবে বস্তুগত পুরস্কারের চেয়ে মানসিক পুরস্কার অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী। বস্তুগত পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে লোভী করে তোলে। তাই বস্তুগত পুরস্কার পরিত্যাগ করা উচিত।

অন্যদিকে সাধারণ ভাষায় শাস্তি বলতে জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজের জন্য শারীরিক কিংবা মানসিক দণ্ডদানকেই বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে সরকার আইন করে শিক্ষার্থীদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রহিত করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১০ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ নীতিমালার আওতায় শারীরিক শাস্তি বলতে যে কোনো ধরনের দৈহিক আঘাত করাকে বুঝাবে। যেমন:
ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে হাত-পা বা কোন কিছু দিয়ে আঘাত করা/ বেত্রাঘাত করা;
খ) শিক্ষার্থীর দিকে চক/ ডাস্টার বা এ জাতীয় কোন বস্তু ছুঁড়ে মারা;
গ) আছাড় দেওয়া ও চিমটি কাটা;
ঘ) শরীরের কোন স্থানে কামড় দেওয়া ;
ঙ) চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেওয়া ;
চ) ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়া;
ছ) কান ধরে টানা বা উঠবস্ করানো;
জ) চেয়ার, টেবিল বা কোন কিছুর নিচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাঁটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা;
ঝ) রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করে রাখা;
ঞ) ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে এমন কোন কাজ করানো যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই নীতিমালার আওতায় মানসিক শাস্তি বলতে কোন শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে এমন মন্তব্য করা যেমন- মা-বাবা/ বংশ পরিচয়/গোত্র / বর্ণ/ ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা, অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা বা এমন কোন আচরণ করা যা শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতির যুগে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের অন্যায় আচরণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক শাসনের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে শাস্তি দিতে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পূর্বের গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের মতো নয়। এখন পৃথিবী অনেকটাই বদলে গেছে সকল কিছুতেই নতুনত্ব এসে ভীড় জমিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক শাস্তির পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হয়েছে স্নেহপূর্ণ সম্প্রীতিমূলক ও সহযোগিতামূলক। বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে নিম্নোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক শাস্তি প্রয়োগের ওপর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। যেমন : চক্ষু শাসন, কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তার শাসন, স্নেহ বা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করা, শিক্ষার্থীর কৃত কর্মের জন্য শিক্ষক একটু রাগ করা ইত্যাদি।
বিদ্যালয়ে শাস্তির বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন:
১. শাস্তি হবে পরিমিত;
২. শাস্তি হবে নমনীয়;

৩. শাস্তি হবে সংশোধনমূলক;
৪. মনস্তাত্ত্বিক ভাব ধারায় মন জয় করে সংশোধন হলে পুরস্কার প্রদান;
৫. শারীরিক শাস্তি কোনভাবেই প্রদান করা যাবে না।

শাস্তি প্রদানের নেতিবাচক দিক

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি বন্ধুত্বের। তিনি তার বিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষার্থীর মন বুঝে ইতিবাচক পরামর্শ দিবেন। কারণ তিনি শুধু শিক্ষক নন তিনি একজন মনোবিজ্ঞানীও । শাস্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য অনেক সময় ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এতে পরোক্ষভাবে নিষ্ঠুরতা থাকে। ফলে শিক্ষকের গুণাবলি বিঘ্নিত হয়।শিক্ষার্থী পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয় বিমুখ হয়। পাঠগ্রহণে পিছিয়ে পড়ে। ঝরে পড়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলে বেকারত্ব বাড়ে। মানবসম্পদ সমস্যায় পরিণত হয়। দেশের বোঝা বাড়ে।

পুরস্কার প্রদানের ইতিবাচক দিক

আনন্দের পুরস্কার কে না পছন্দ করে। ছোট শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত পুরস্কারের প্রতি সবার আকর্ষণ থাকে। পুরস্কার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করার মাধ্যমে শিখনে গতি আনে। নতুন নতুন শিখনের সাথে পরিচিত হতে শিক্ষার্থী আগ্রহী হয়ে উঠে। পুরস্কার দু'ধরনের আছে বস্তুগত পুরস্কার ও মানসিক পুরস্কার। বস্তুগত পুরস্কার হলো, বই, ক্রেস্ট, সনদ , টাকা, কলম, খেলনা, প্রাইজবন্ড, পদক ইত্যাদি। আর মানসিক পুরস্কার হলো মৌখিক প্রশংসা, অভিনন্দন, শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দিক নিয়ে অন্যের সামনে উপস্থাপন করা, শিক্ষার্থীর কাছে ভাল কিছু আশা করা ইত্যাদি।

মানসিক পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে, শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে। শিক্ষার্থী পাঠে মনোযোগী হয়। সব সময় শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে, ঝরে পড়ার হার কমে। ফলে শিক্ষার্থীরা ভাল ফল লাভ করে। অন্যদিকে এ পুরস্কারের প্রভাব হয় দীর্ঘস্থায়ী। প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক তথা দেশ ইতিবাচক ভাবনায় গড়ে ওঠে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সুফল বয়ে আনে। তাই সীমিতভাবে বস্তুগত পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। তবে অফুরন্তভাবে মানসিক পুরস্কার প্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সত্যিকার অর্থে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি না করে পুরস্কার প্রদানের মধ্যে চমৎকার বিদ্যালয় পরিবেশ তৈরি করা উত্তম। শিখন-শেখানো কার্যক্রম সার্থক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। কারণ আমাদের মনে রাখা দরকার শাস্তির মাধ্যমে কখনই কোন বিষয় পরিপূর্ণভাবে শেখানো যায় না যতটা আনন্দ বা পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে শেখানো যায়।

৫.৪ প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা অনুশীলন

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালের। এরা যে কোন সময় শ্রেণিকক্ষে অবাঞ্ছিত আচরণ করতে পারে। সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের। শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠদানের সময় কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। শিক্ষক কর্তৃক অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ মোকাবেলাকেই প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা দক্ষতা বলে। শিক্ষক অবশ্যই এহেন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। কারণ এক বা একাধিক শিক্ষার্থীর অসৌজন্যমূলক আচরণ পুরো শ্রেণি কার্যক্রমে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। আর শৃঙ্খলা শক্ত হাতে বজায় রাখতে হবে এ জন্য যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

শিক্ষার্থীদের এ ধরনের আচরণের জন্য শুধু শিক্ষকগণের অদক্ষতাকে দায়ী করলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাও অনেকাংশে দায়ী। শ্রেণিকক্ষের বাইরের শৃঙ্খলার জন্য সমাজের সহোযোগিতানেওয়া প্রয়োজন। তবে শ্রেণির অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষককেই বেশির ভাগ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের আচরণিক সমস্যার সমাধান প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কমিটির মাধ্যমে করার উদ্যোগ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।
নিম্নোক্তভাবে শিক্ষক প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন-

প্রথমত:শিক্ষককে অবশ্যই সংবেদনশীল মনোভাবাপন্ন হতে হবে। যেকোন ধরনের নেতিবাচক আচরণের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কে, কখন, কোন পরিস্থিতিতে কী বলেছে বা কী ঘটিয়েছে, কোন পরিস্থিতিতে ঘটিয়েছে তা শিক্ষকের বিবেচনায় আনতে হবে। ঘটনা সংশ্লিষ্ট সবার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারপর নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে ধরনের আচরণিক সম্পর্ক বজায় থাকার কথা তার অন্যথা হলেই শিক্ষক সত্যটি বা শুদ্ধটি শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিবেন। যাতে পুনরায় এধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ স্নেহের

পরশ যাতে অমলিন থাকে সে দিকে খেয়াল রাখা অতীব জরুরি। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও ভাষার অমার্জিত বর্হিপ্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য শিক্ষক নিজে সচেতন হবেন এবং শিক্ষার্থীকেও শেখাবেন।

তৃতীয়ত: এ বয়সের শিক্ষার্থীদের যে প্রবণতা একটু বেশি দেখা যায় তা হলো একজন কোন একটা দুষ্টুমি করছে দেখলে অন্যরা একই রকম দুষ্টুমি শুরু করে দেয়। যেমন: একজন হাতের আঙ্গুলের মটকা ভাঙ্গলে অন্যরাও শুরু করে। এতে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে শিক্ষককে পূর্বেই দক্ষতার ইতিবাচক পরিচয় উপস্থাপন করতে হবে এবং সমগ্র শ্রেণিতে সুনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থত : শিক্ষককে পাঠদানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ পাঠদানে যাতে ছন্দ পতন না ঘটে। শিক্ষার্থী শ্রেণিতে শৃঙ্খলা নষ্ট করার সুযোগ যাতে না পায় এবং কোন সমস্যা হলে তা যাতে তাৎক্ষণিক সমাধান করতে পারেন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে শিক্ষককে। মোট কথা শিক্ষক দক্ষতার সাথে সুনিপুণভাবে শ্রেণির কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এ ছাড়াও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় শ্রেণি কক্ষে ভিন্নরকম কোন ঘটনা ঘটলে তা মোকাবেলার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন- পঠন-পাঠন কাজ শুরু হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী শ্রেণিতে প্রবেশ করে আসন নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, এতে শ্রেণি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। শিক্ষক দক্ষতার সাথে এধরনের পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই শিক্ষার্থীর উচ্চতা, বয়স ও উচ্চ মেধা, স্বল্প মেধা, মধ্যম মেধা বিবেচনায় রেখে আসন বিন্যাস করে রাখবেন। শ্রেণিতে পাঠদান কাজ শুরুর আগে শিক্ষার্থীরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকতে পারে। তাই তাদের সাথে কুশল বিনিময় ও পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের মধ্যমে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। শিক্ষক সুনিপুণভাবে শ্রেণিতে পাঠের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন। টানা বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হতে পারে তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা, প্রাসঙ্গিক গল্প করা ও বিভিন্ন রকম কৌশল যেমন : একক কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি প্রয়োগ করলে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, কোন রূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না। পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার, দলীয়কাজ তদারকি, শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করা প্রয়োজনে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। যেমন: তোমাদের কাজ চমৎকার হচ্ছে বা বেশ ভাল করছো তোমরা ইত্যাদি মানসিক পুরস্কার শিক্ষার্থীদের কাজের গতিকে দ্রুততর করে। শ্রেণি শৃঙ্খলাও বজায় থাকে। আবার শ্রেণির সকল কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেও শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এছাড়া শিক্ষকের ফলপ্রসূ পাঠ উপস্থাপনও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ শিখন উপযোগী হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত।

সমস্যা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের সাথে ব্যবহার

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনগুলো শিক্ষার্থীদের অবহিত করা প্রয়োজন যেন নিয়মবহির্ভূত কাজ করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে তা স্পষ্ট থাকে। এ কথা সত্য কোন কোন বিদ্যালয়ে সমস্যা সৃষ্টিকারী এক বা একাধিক শিক্ষার্থী থাকতে পারে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শুধু শাসন বা শুধু আদর নয় তাদের সাথে অম্ল মধুর একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে সে বা তারা সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বিরত থাকে। সমস্যাসৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে কিছু দায়িত্ব দিতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন শেষে মানসিক পুরস্কার প্রদান করতে হবে। এতে দুষ্টুমির মাত্রা কমবে। মোট কথা শিক্ষককে শিক্ষার্থীর বন্ধু হতে হবে। তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে হবে। শিক্ষার্থীর ছোট খাটো কোন ভুলের জন্য তাকে ইতিবাচক পরামর্শ দিতে হবে যাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। একবার বা দু'বার সমস্যা সৃষ্টি করলে শিক্ষার্থীদের কিছু না বললে তারা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে এবং বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষককে সজাগ থেকে শিক্ষার্থীকে সুপরামর্শ প্রদান এবং পাঠে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশনা দিতে হবে। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থী খারাপ আচরণ করলে শিক্ষক খারাপ আচরণ করবেন না। কারণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বোধের জায়গাটা তৈরি হয়নি। তাই শিক্ষার্থীর সাথে ভাল ব্যবহার করে তার ব্যক্তিগত দোষত্রুটিগুলো একান্তে আলোচনা করে নিরাময়ের ব্যবস্থা করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। শিক্ষার্থী নানা কারণে শ্রেণিতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে থাকে। যেমন-

- পারিবারিক বিভিন্ন অশান্তি;
- মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া ও বিচ্ছেদ;
- সৎ মায়ের অত্যাচার;
- অর্থনৈতিক দৈন্যতা;
- অনাদর ও অবহেলা;
- নিরাপত্তাহীনতা;
- পারিবারিক শিক্ষার অভাব।

উল্লিখিত কারণে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের আবেগে জর্জরিত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কারণ তারা আবেগের কারণে আচ্ছাদিত থাকায় ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মানসিকতা বুঝে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর অসদাচরণের মাত্রা বুঝে তাকে প্রতিহত করার জন্য নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হবে। শ্রেণি শৃঙ্খলা টেকসই করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়-

- বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা কে ও কেন সৃষ্টি করেছে তা জানা;
- কাজটি করার কারণে ফলাফল কী হতে পারে তার কাছ থেকে মৌখিক বক্তব্য আদায় করা;
- এ ধরনের কাজ অন্য কেউ করলে সমস্যা সৃষ্টিকারী শিক্ষার্থীর ওপর তার কী প্রভাব পড়বে তা জানা;
- এ ধরনের কাজকর্মের জন্যে অতীতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, এমন ঘটনা বা গল্প তার সামনে উপস্থাপন করা;
- ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম সমস্যার সৃষ্টি না করে তার জন্য তাকে সচেতন করা;
- পুনরায় সমস্যার সৃষ্টি করলে তার জন্য কঠিন ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হবে বলে তাকে সাবধান করা;

মূলত শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখা শিক্ষকের দায়িত্ব হলেও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন রাখা বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের নিয়ম কানুনসম্বলিত পোস্টার প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান স্থানে প্রদর্শন করা উচিত যেন সকলে দেখতে ও পড়তে পারে। এছাড়া মাঝে মাঝে অভিভাবক মহলেও প্রচার করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মান বজায় রাখতে প্রশাসন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং বছরের প্রথম থেকে এবিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া শ্রেণিতে মাঝে মাঝে সকল শিক্ষক এ দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা সচেতন হতে সচেষ্ট হবে।

৫.৫ অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কৌশল

অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্য

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতিটি শ্রেণি কক্ষে নিয়মানুযায়ী ৪০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা। শ্রেণিতে শিক্ষক- শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৬০-এর বেশি হলে ধরে নিতে হবে শ্রেণিতে অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোন কোন স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিতে ১২০-১৫০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী থাকে। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিতে শিক্ষকের পক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয় না। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এ ধরনের শ্রেণিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ফলাবর্তন দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। আবার শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন সুচারুভাবে গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। শিক্ষকের কণ্ঠস্বর শ্রেণির শেষতম বেঞ্চের শিক্ষার্থী পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে পাঠদানের জন্য দলগত কাজ প্রদান বা সক্রিয়তাধর্মী অন্যান্য পাঠদান কৌশলগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির কারণে শ্রেণিকক্ষে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই ধরনের শ্রেণিকক্ষের পিছনে বসা শিক্ষার্থীরা চক বোর্ডের কাজ দেখতে পায় না। শিক্ষকের পক্ষে বাড়ির কাজ আদায় করা ও তা মূল্যায়ন করা সময়সাধ্য ও কষ্টকর হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য স্কুলের শ্রেণিসমূহ আয়তকার হওয়া আবশ্যক। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্কুলের প্রতি শ্রেণিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে আলোর বিপরীতে চক বোর্ড স্থাপন করা উচিত। বোর্ডে স্পষ্টভাবে বড় বড় করে লিখতে হবে। শিক্ষার্থীরা বোর্ডের কাজ লিখে নেওয়ার পর তা মুছে ফেলতে হবে। শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে প্রথম সারি থেকে শেষ সারিতে বসার বৃত্তাকার নিয়ম চালু করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ কৌশল

পাঠদান একটি মানসিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনায় শ্রেণির কার্যক্রমে মনোযোগী ও সক্রিয় রেখে শিখনকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষকের জন্য পাঠদানে একমুখিতা পরিহার করা আবশ্যক। আধুনিক পাঠদান কৌশলে তাই সক্রিয়তাধর্মী অংশগ্রহণমূলক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে যেসকল কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন তা হল-

১. পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুঁজে বের করা;

২. শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ;

৩. উত্তরদানের জন্য তাদের প্রশংসা করা;

৪. পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার জন্য সচেষ্ট থাকা;
৫. শিক্ষার্থীদের সব সময় এককভাবে শ্রেণির কাজ না দিয়ে জোড়ায় বা দলে কাজ দেওয়া ও উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা;
৬. চকবোর্ড ব্যবহার করা;
৭. প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের দিয়ে চকবোর্ডে বা হোয়াইট বোর্ডের লেখানো;
৮. শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলছে কিনা তা মৃদু পায়চারীর মাধ্যমে তদারক করা;
৯. শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে তাদের চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া। তারা কোন প্রশ্নের উত্তর না পারলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের বদ্ধ প্রশ্ন কম করে বেশি বেশি উন্মুক্ত প্রশ্ন করা উত্তম।
১০. শিক্ষক শ্রেণিতে এমন ভাবে দাঁড়াবেন বা পায়চারী করবেন যাতে পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাঁর দৃষ্টির নাগালে থাকে;
১১. মাইন্ড ম্যাপিং, ব্রেইন স্টর্মিং, পোস্টবক্স, এক্সপার্ট জিগস্ ইত্যাদি উৎসাহব্যঞ্জক কৌশলগুলো শ্রেণিতে ব্যবহার করা;
১২. শ্রেণির কাজ সংশোধনের জন্য শিক্ষকের চেয়ে সতীর্থদের দ্বারা করলে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে;
১৩. সমগ্র শ্রেণির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে ইংরেজি বর্ণমালা এক্স, ডব্লিউ, জেড ইত্যাদি ব্যবহার করে উত্তর নিলে পুরো শ্রেণি শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে মনোযোগী হবে;
১৪. দলীয় কাজের শেষে মৌখিক উপস্থাপনের সময় অপেক্ষাকৃত চুপচাপ শিক্ষার্থীদের দ্বারা দলীয় কাজ উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
১৫. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা। সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠ উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
১৬. দুর্বল শিক্ষার্থীদের বেশি করে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করলে তাদের শিখন সম্পূর্ণ হয়।

মনে রাখতে হবে সকল কাজের শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করতে হবে। তাহলে সকলেই কোন না কোনভাবে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হবে। এভাবেই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের কৌশল

জেন্ডার (Gender)শব্দটি বর্তমানে যথেষ্ট আলোচিত। পূর্বের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে এখন জেন্ডার শব্দটির অর্থের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালে। Ann Oakley প্রথমে জেন্ডার শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন যা বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পূর্বে জেন্ডার শব্দটি লিঙ্গ (Sex) অর্থে ব্যবহার করা হত। সেমতে, মানবকূলকে তিন ধরনের লিঙ্গে বিভক্ত করা হয়। যেমন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লিব লিঙ্গ। বর্তমানে লিঙ্গ বলতে বুঝায় নারী ও পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যসূচক ভিন্নতা। এটি মূলত জৈবিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ। আর এ ভিন্নতার সূত্রপাত হয় প্রাকৃতিকভাবে যা জন্মগত।
জেন্ডার শব্দটির উৎপত্তি হয় সামাজিকভাবে যা নারী পুরুষের সম্পর্ক, নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করে। আবার জেন্ডার নারীপুরুষের কর্মকাণ্ডও নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, জেন্ডার নির্ধারণ প্রাকৃতিক নয়, সমাজসৃষ্ট। যার মধ্যে নিহিত আছে দায়িত্ব ও প্রত্যাশিত আচরণ। তাই বর্তমানে সমাজ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য, আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আচরণ জেন্ডার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে।
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীর নির্দেশক, সহায়তাকারী, বন্ধু। শুধু সামনের বা পেছনের শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন, তা কিন্তু নয়। শ্রেণিকক্ষের ডানে, বামে, সামনে ও পেছনের শিক্ষার্থীর প্রতি সমানভাবে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেসব বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা বিদ্যমান সেখানে শ্রেণিতে শুধু ছেলে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে ব্যাপারে শিক্ষকের সর্তক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ কোনো শিক্ষার্থী বা দল যাতে ব্যক্তিগত বা দলীয় ক্ষমতা বা প্রভাব প্রদর্শন করতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। শ্রেণিতে মেয়েদের জন্য ছেলেদের মতো যথেষ্ট জায়গা বরাদ্দ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ছেলে-মেয়ে উভয়েই আপনার শিক্ষার্থী, তাই তাদের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু ছেলেরা নয় আবার শুধু মেয়েরাও নয়,ছেলে মেয়ে উভয়কে শ্রেণিকক্ষে আনুপাতিক হারে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। শ্রেণির কাজ পর্যবেক্ষণের সময় ছেলে মেয়ে উভয়ের কাজ সমভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শ্রেণিনেতা নির্বাচনের সময় ছেলে-মেয়ে উভয়কে সমানভাবে দলনেতার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। শ্রেণিতে দলগত কাজ করার সময় ছেলে-মেয়ের সমান সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা শিক্ষকের দায়িত্ব। শ্রেণিতে অবশ্যই জেন্ডার নিরপেক্ষ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার, নিরপেক্ষ শব্দ এবং জেন্ডার নিরপেক্ষ উদাহরণ উপস্থাপন করা উচিত। এতে শিক্ষক যেমন শ্রেণিকর্মে পারঙ্গমতার পরিচয় দেবেন তেমনি সম্মানিত বোধ করবেন। জেন্ডার নিরপেক্ষ শব্দ বা ভাষা বলতে বুঝানো হয়েছে শিক্ষার্থী, হেড টিচার, সভাপতি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ইত্যাদি।

দলগত কাজ প্রদান করে নির্দেশনা শেষে শিক্ষক নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অধিক অংশগ্রহণ ও কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করবেন। এতে বিষয়বস্তু বুঝতে ও বুঝাতে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ বোধ করবে। শ্রেণিতে প্রশ্ন করার সময় কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীকে ইঙ্গিত করে বা নাম ধরে ডেকে প্রশ্ন না করে সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে হবে। যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তাদের হাত উঠিয়ে শিক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে উৎসাহ দিতে হবে এবং ছেলে-মেয়ে উভয়ের থেকে সমান সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলতে হবে। চুপচাপ বসে থাকা শিক্ষার্থীদের সঠিক উত্তরের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। সঠিক উত্তরদাতাদের প্রশংসা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতেও শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত হয়।

শিক্ষকের ছেলে-মেয়ে উভয়ের মতামতকে সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। শিক্ষককে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় অথবা বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে ছেলে-মেয়ে উভয়ের নাম ধরে ডাকতে হবে। এতে তারা নিজেদের সম্মানিত বোধ করবে। তাছাড়া কোনো কাজে ফাঁকি দেওয়া বা অন্যায় কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। শিক্ষককে এটাও মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের মনের ভেতর আদর্শের ভিতটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন তখনই যখন বিষয়জ্ঞান তাঁর ভালো থাকবে এবং বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স এবং চাহিদাকে প্রাধান্য দিবেন। এর মাধ্যমে সব শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। একে অপরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ছেলে-মেয়ে উভয়ের মধ্যে যাতে দূরত্ব সৃষ্টি না হয়ে বন্ধুত্বের একটি সুন্দর বন্ধন সৃষ্টি হয় সেই লক্ষ্যে শিক্ষককে কাজ করতে হবে।

৫.৬ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ ও সমাধানের উপায় অনুসন্ধান

শ্রেণিকক্ষে উচ্চ মেধা, স্বল্প মেধা ও নিম্ন মেধা বা পিছিয়ে পড়া এ তিনধরনের শিক্ষার্থী থাকে। এরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে। কেউ ধনী কেউ আবার গরীব। তাদের বাসা বা বাড়ির পরিবেশও ভিন্ন। তাই এদের অনেকেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিখনে এগিয়ে আসতে পারে না। কারণ বাসায় বা বাড়িতে পড়ার পরিবেশ ইতিবাচক নয়। আবার কখনো কখনো দেখা যায় পরিবারের সদস্যদের অসচেতনতা, উদাসীনতার কারণে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ছে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সব শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না বলে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। কোনো কোনো শিক্ষার্থীর ফাঁকি দেওয়ার মনোবৃত্তি আছে বলে তারা সব সময় পেছনের বেঞ্চে বসে এবং এদের মধ্যে শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে। বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন যোগ্যতম শিক্ষকের অভাবও শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ। নিরক্ষর পরিবারে বেড়ে উঠা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উদাসীনতা তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম আরেকটি কারণ। শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকা। শ্রেণিকার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাঠের সাথে পরিচিত হতে পারে না। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত খোঁজ খবর না নেওয়ার কারণেও তারা স্কুল বিমুখ হয়। বর্তমানে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা ও নানারকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণেও শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। আবার দেখা যায় কোন পরিবার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। ফলে সেই পরিবারের সন্তানেরা সাধারণভাবেই শিক্ষা বিমুখ হয়ে পড়ে। দেখা যায় কোন কোন শিক্ষক শ্রেণিতে অমনোযোগী থাকেন। আবার সব শিক্ষক যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করেন না। তাই অনেক শিক্ষার্থী এ সুযোগের নেতিবাচক সদ্ব্যবহার করে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমেই শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া এবং অবস্থানের কোন কারণে শিক্ষার্থী মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যা তাকে বিদ্যালয় বিমুখ করে তোলে। এছাড়া শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ত্রুটি থাকলেও শিক্ষার্থী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে অনগ্রসর বা সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীতে পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের উপায়

পিছিয়ে পড়া সমস্যার সমাধান

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিরূপিত সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য শিক্ষক অভিভাবক উভয়কে সচেতন হতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুধরে বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে নিরাময়মূলক ক্লাশ নেওয়ার মাধ্যমে। যেমন- যে বিষয়গুলোতে দুর্বল সে বিষয়গুলো বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে এক থেকে দুই ঘন্টা অনুশীলন, ক্লাশ চলাকালীন অনুশীলন, ক্লাশ শেষে অনুশীলন.এবং একই বিষয়বস্তুর ওপর বাড়ির কাজ প্রদানের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী হওয়া সম্ভব। বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। পড়ার সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে সন্ধ্যা থেকে রাতে কয়টা পর্যন্ত কোন কোন বিষয় পড়বে। কোন বিষয় লিখবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে,সন্ধ্যা থেকে অন্তত রাত দশটা পর্যন্ত বাসায় যাতে টেলিভিশন না চলে। এতে একাগ্রচিত্তে শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে।

শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন রকমের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারলে সে নিজকে পড়া লেখায় আগ্রহী করবে এবং বিষয়বস্তুর দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সমস্যার কথা অভিভাবক ও শিক্ষককে আন্তরিকতার সাথে শুনতে হবে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হবে। অবশ্যই অভিভাবককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন না থাকলে শিক্ষার্থীর হাতে মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি না দিলে শিক্ষার্থীর সময় নষ্ট হবে না। লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

বিদ্যালয় প্রশাসন যদি যত্নবান থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার কারণ নির্ণয় করে সেভাবে তাকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীও অগ্রসর হতে পারে। সর্বোপরি শিক্ষাক্রম আধুনিক ও শিক্ষার্থীর চাহিদা মোতাবেক হলে পিছিয়ে পড়ার কোন সুযোগ থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

সময় ব্যবস্থাপনা

সময় হচ্ছে একটি অপর্যাপ্ত সম্পদ। শিক্ষকগণ অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য সময়ের পরিকল্পনা করবেন এবং তাদের জন্য বরাদ্ধকৃত সময়টুকু খরচ করবেন। শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয় এরূপ উপকরণের ওপর সময় নষ্ট করা হলে তারা বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত বিষয়বস্তু শেষ করতে পারবেন না।

শ্রেণিকক্ষে রুটিন অনুযায়ী শিক্ষককে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি পাঠ উপস্থাপন করতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা ৪০-৫০ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা মাফিক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বস্তু যাতে উপস্থাপন করা যায় সে জন্য প্রয়োজন সময় ব্যবস্থাপনার। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ব্যবস্থাপনায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিখনফল অর্জনের বিষয়টি বিভিন্ন চলকের ওপর নির্ভর করে। যেমনঃ পাঠের বিষয়বস্ত, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষোপকরণ, পাঠদানের সময়কাল, বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষকের পাঠদান কৌশল, আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি।

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে অবস্থানের নির্ধারিত সময় কম। কাজেই শিক্ষকগণের উচিত যথাযথভাবে এ সীমিত সময়কে উদ্ভাবনীমূলক কাজের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা। শিক্ষকগণের কাছ থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রয়েছে। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে কোন ধরনের বৈষম্যের (যেমনঃ ছেলে-মেয়ে) শিকার না হয়ে যাতে শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ সুফল পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের কর্তব্য।

সঠিক সময়ে নির্ধারিত পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কর্মসূচির যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময় ব্যবস্থাপনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে কর্মসূচিগুলো সম্পাদন করলে সফলতা আসে। কার্য সফলতার মৌলিক চেতনা হল সঠিক সময়ে সঠিক কার্য সম্পাদন। সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের কয়েকটি দিক নিচে উল্লেখ করা হল-

১. সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময়মতো কাজ করা যায়;
২. কর্মসূচির বাস্তবায়নে কার্য ধারাবাহিকতা বজায় থাকে;
৩. কর্ম সম্পাদনে গতিশীলতা আসে;
৪. সকলকে যথাসময়ে কার্য হাসিলের তাগিদ দেওয়া যায়;
৫. কর্ম সম্পাদনে ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগ তৈরি হয়;
৬. উর্ধ্বতন এবং অধস্তন ব্যক্তির কার্য সমন্বয় হয়;
৭. সময় এবং কর্মসূচির সমন্বয় রক্ষা করা যায়;
৮. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্য শৃঙ্খলা বজায় থাকে;
৯. এক কর্মসূচির শেষে অন্য কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়;
১০. প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সুনাম বর্ধিত হয়;
১১. কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সময় বরাদ্দ করা যায়;
১২. এর মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া যায়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বলতে কীবুঝায় ?

২. শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ কী ?

৩. পুরস্কার ও শাস্তি বলতে কী বুঝায় ?

৪. প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা কী ?

৫. জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ বলতে কী বুঝায় ?

৬. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী কারা ?

৭. বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার কৌশলগুলো লিখুন।

৮. শিক্ষার্থীর আচরণিক নীতিমালা কী কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আদর্শ শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায় ? শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো চিহ্নিতকরণপূর্বক এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বলতে কী বুঝায় ? শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন ? যুক্তি দিন।

৩. পুরস্কার ও শাস্তি বলতে কী বোঝেন ? পুরস্কার প্রদানের ইতিবাচক দিকগুলো এবং শাস্তি প্রদানের নেতিবাচক দিকগুলো লিখুন।

৪. অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ কৌশলগুলো লিখুন।

৫. সময় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় ? সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৬ : শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার দক্ষতা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও শিখনের বিষয়বস্তু। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ছিলেন এককভাবে সক্রিয়। শিক্ষকের পরেই ছিল বিষয়বস্তুর অবস্থান। শিক্ষার্থীরা ছিল গৌণ। শিক্ষক বা গুরু যা শেখাতেন, যেভাবে শেখাতেন তাই শিক্ষার্থীদের শিখতে হত অনেকটা বাধ্য হয়ে। কালের পরিক্রমায় এই তিনটি উপাদানের গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরাই কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান সময়ে শিক্ষা অর্জন করা শিক্ষার্থীর কাজ আর শিখনে সাহায্য করা হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বা শিশুর বয়স, অভিজ্ঞতা, রুচি, অনুরাগ এবং পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলগুলো প্রয়োগ করবেন। এ ইউনিটে শিখন-শেখানো পদ্ধতির ধারণা, প্রকারভেদ, শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য, শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব এবং শিখন-শেখানোরবিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে নিম্নরূপে বিন্যাস করে বর্ণনা করা হয়েছে-

৬.১ শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিখন সূত্রগুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে রূপান্তর;

৬.২ শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির পার্থক্য ও শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব;

৬.৩ মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং, দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প, সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয় কৌশল অনুশীলন;

৬.৪ একক কাজ, পোস্ট বক্স ,কার্যকর দল পুনর্বিন্যাস,সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার কৌশল অনুশীলন।

৬.১ শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিখন সূত্রগুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে রূপান্তর

শিখন-শেখানো পদ্ধতির ধারণা

পদ্ধতি শব্দটি ইংরেজি method এর বাংলা পরিভাষা। এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে To proceed according to the right way অর্থাৎ সঠিক পথ ধরে সামনে যাওয়াই হচ্ছে পদ্ধতি। সুতরাং বলা যায় কোন কাজ সম্পন্ন করতে আমরা যথাযথ যে উপায় অবলম্বন করি তাই হচ্ছে পদ্ধতি। সাধারণত method বলতে বোঝায় a particular way of doing something. অন্যদিকে শিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তা রক্ষা করার প্রক্রিয়া। শিক্ষক এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বা আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিশুর মন ও পাঠ্য বিষয়ের মাঝে যথার্থ সেতুবন্ধন রচনা করেন। আবার শিক্ষণ পদ্ধতি বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী বিভিন্ন কৌশলগুলোর সমন্বয়কে বুঝায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম বা পাঠদান সফল ও কার্যকর করার জন্য যে সকল পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করতে হয় সেগুলোকে শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ শিখনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অন্যকথায় শিখনফল লাভের জন্য যে সকল সুচিন্তিত উপায় বা কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এগুলোকেই শিখন-শেখানো পদ্ধতি বা শিক্ষাদান পদ্ধতি বলা যায়। A teaching method comprises the principles and methods used by teachers to enable student learning. These strategies are determined partly on subject matter to be taught and partly by the nature of the learner.(https://www.researchgate.net/post/The_different_teaching-learning_methods)। শিখন-শেখানো পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থী ও তার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বন্ধন তৈরির মাধ্যমে আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল অর্জনের চেষ্টা করা। Teaching-learning approaches are combined processes where an educator assesses learning needs, establishes specific learning objectives, develops teaching and learning strategies, implements plan of work and evaluates the outcomes of the instruction.
(www.igi-global.com/chapter/current-and-future)

শিখন-শেখানো পদ্ধতির ভিত্তি

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যত আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হোক না কেন শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে না পারলে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষা সার্থক ও কার্যকর হয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্যে সুসংহত ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহ। শিক্ষার্থী যত বেশি সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে পারবে, জ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা তত বেশি গভীর হবে। মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলোর উদ্ভব হয়েছে, যেখানে তিনটি বা চারটি ইন্দ্রিয় এক সাথে ব্যবহার করে পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। শিশু মন সব সময় সক্রিয় থাকে। শিশুরা সব সময় কিছু না কিছু করতে চায়। তাদের আগ্রহকে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী হলে অত্যন্ত কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিগুলো গড়ে উঠেছে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতির প্রকারভেদ

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিভিন্ন রকম শিক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। দিনে দিনে এ সকল পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন হচ্ছে। তবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার এ যুগে নব আবিস্কৃত পদ্ধতি ও কৌশলগুলো সম্পূর্ণভাবে শিশু বা শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে যে সকল পদ্ধতি চালু আছে সেগুলোকে গতানুগতিক ও আধুনিক বা শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এইভাবে ভাগ করা যায়।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি (Teachers Centred Method)

যে শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয় উপস্থাপনে শিক্ষকের কর্মতৎপরতা বা ভূমিকা বেশি অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষকই বেশি সক্রিয় থাকে তাকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বেশকিছু শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি চলে এসেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এদেরকে সনাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতি বলা চলে। যে পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা মুখ্য এবং শিক্ষার্থীদের ভূমিকা গৌণ সে পদ্ধতিগুলো শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি। যেমন বক্তৃতা ও প্রদর্শন। এ পদ্ধতিতে পঠিত বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে পাঠদান কৌশল শিক্ষক নিজেই নির্ধারণ করেন যাতে করে তিনি বিষয়বস্তু তার ধারণামতে সার্বিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেন। শিক্ষার্থী শিক্ষকের উপস্থাপিত ধারণামতে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে। উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু হয় ধর্ম শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই এ কাজে ব্যবহৃত হত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য অভিজাত শ্রেণির শুধুমাত্র ছেলেরা নিজ অঞ্চলে বা দূরবর্তী কোন অঞ্চলে গুরুর বাড়িতে যেত এবং গুরুগৃহে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অবস্থান করে গুরুর সকল প্রকার সেবা করে তার নির্দেশে জীবনভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করত। এটা ছিল শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির সূচনা।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (Learner Centred Participatory Method)

বর্তমানে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি সবকিছুই শিশু বা শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে প্রণীত। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সক্রিয়তা, কর্মকেন্দ্রিকতা, সামর্থ্য ও আগ্রহকে কাজে লাগানো। সুতরাং বলা যায় শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক সামর্থ্য, বুদ্ধি, আগ্রহ, মনোযোগ অবসাদ ইত্যাদি বিবেচনা করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের জন্য যে সকল পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয় সে সকল পদ্ধতিগুলোকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি বলে।Participatory Approach is a learner-centered approach in which learners can work freely in a democratic environment. (http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE1534.pdf)। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি একটি সফল শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণের ফলে প্রতিটিশিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান ও দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে। In a participatory teaching-learning situationteachers are expected to talk less than learners, creating learning-opportunities for them through active and self-involvement.

(https://www.thedailystar.net/news-detail-27720)। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই গভীর চিন্তা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ভেতরে গিয়ে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে। গঠনবাদ তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীরা নিজের পূর্বজ্ঞানের সাথে নতুন বিষয়বস্তু জ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে সক্রিয়ভাবে বস্তুনিষ্ঠ উত্তর প্রদানে তৎপর থাকে।

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি	**শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি**
• বক্তৃতা পদ্ধতি • প্রদর্শন পদ্ধতি • টিউটোরিয়াল পদ্ধতি • আবৃত্তি পদ্ধতি • সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা	• আলোচনা পদ্ধতি • প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি • আরোপিত কাজ পদ্ধতি • সেমিনার পদ্ধতি • বিতর্ক পদ্ধতি

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি

- **বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method)**

শিখন-শেখানো পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা পদ্ধতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বক্তৃতা পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার ক্ষেত্রে শিক্ষককে মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হয়। এখানে শিক্ষকের বক্তৃতাদানের পারদর্শিতা, বক্তৃতাদানের কলাকৌশল, বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তোলার ক্ষমতা, শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ, পারগতা, বোধগম্যতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের দক্ষতার ওপর শিক্ষাদানের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। বাচনিক তৎপরতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।বক্তৃতা পদ্ধতিতে শেখানো সবচেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ, কারণ শিক্ষকের মৌখিক বিবৃতিকে সম্বল করেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলে। তাছাড়া বক্তৃতা পদ্ধতিতে এক সাথে অনেক শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে বক্তৃতা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাব।

শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় বলে তারা অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ে।বক্তৃতা পদ্ধতি অনুসরণে উন্নত মেধা ও ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তারাই শ্রেণি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে বেশি উদ্যোগী হয়।

- **প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)**

শ্রেণি পাঠদানে কোন বাস্তব ঘটনা বা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে প্রদর্শন পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হল পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবভাবে দেখানো। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপোকরণের সাহায্যে এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যম বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট হন। প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকলেও শিক্ষকের সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি। তবে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে তাদের নিরব শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকা ছাড়া পাঠে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ কম। যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তবে শিক্ষাপোকরণের অপ্রতুলতাহেতু এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

- **টিউটরিয়াল পদ্ধতি (Tutorial Method)**

টিউটরিয়াল শিক্ষাদান পদ্ধতি বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে অত্যন্ত সীমিত এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ্যবিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকেন। টিউটরিয়াল একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি চালু করেন বলে একে সক্রেটিস পদ্ধতিও বলা হয়। শিক্ষার্থীদের শিখনের উন্নতি-অবনতি মূল্যায়ন করার জন্য এক ধরনের টিউটরিয়াল পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে টিউটরিয়াল ক্লাস নেওয়ার প্রথা বহুদিন থেকে আমাদের দেশেও প্রচলিত। সাধারণত শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি থাকলে তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন সাহায্য ও সহযোগিতা কিংবা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

- **আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method)**

আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি বলতে এমন একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার সহায়তায় শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তু সঠিক উচ্চারণ সহযোগে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সাধারণ অর্থ, ছন্দ, তাল, লয় ও যতি চিহ্নাদির প্রতি খেয়াল রেখে যথার্থ উচ্চারণ সহকারে বই দেখে বা বই ছাড়াই কোন কবিতা মনোরম ভঙ্গিতে পাঠ করা আবৃত্তি পদ্ধতির কাজ। ফলে কবিতার মূল বক্তব্য অতি সহজেই পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে তার অনুধাবনে সাহায্য করে। আবৃত্তিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

- **সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা (Monitorial System of Education)**

এক সময় ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অপ্রতুলতা হেতু উচ্চ শ্রেণির যোগ্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচের শ্রেণিতে শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনা করা হত। এই ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের দেশের গ্রামীণ মক্তবে এ ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতি এখনো চালু আছে। সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশসমূহেও আমাদের দেশের এই সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা নতুন করে প্রচলন করার তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সর্দার-পড়ো ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে Monitorial System of teaching।

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি

- **আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)**

যে পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য শিক্ষার্থীরা নিজেরা একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আয়ত্ত করতে পারে এবং তা আয়ত্ত করতে কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে বিষয় শিক্ষকের পরামর্শ ও তার সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সঠিক সমাধান খুঁজে পায়, তাকে আলোচনা পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। আলোচনা এক ধরনের দলগত পদ্ধতি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম অধিক কার্যকর হয়। সাধারণত নিষ্ক্রিয় ও অন্তর্মুখী শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবার সুযোগ পায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অভিমত গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বচেষ্টায় জ্ঞান অর্জনের ফলে লব্ধজ্ঞান অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। তবে এই পদ্ধতি উন্নত মেধার স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হলেও মাঝারি ও নিম্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। আলোচনা পদ্ধতি সফল করার জন্য পূর্বেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সে অনুসারে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সময় নির্ধারণ করে আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ফলপ্রসূতা লাভ করা যায়।

- **প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method)**

ছোট ছোট প্রশ্ন করে এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন কোন বিষয় শিক্ষার্থীরা জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করে সে পদ্ধতিকে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ পদ্ধতিতে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে কতগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের সাহায্যে পাঠের মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিখনফল বা আচরণিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করা হয়। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একই প্রশ্ন বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের করা হয়। কোন প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর জানা না থাকলে শিক্ষক নিজে সে প্রশ্নের উত্তর দেন, পরে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তরের পুনরাবৃত্তি করে নেন। এ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি হওয়ার সুযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই কম থাকে। তবে এ পদ্ধতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের ওপর। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি পরিচালিত হলে শিখন-শেখানোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকের শিক্ষাগত ও প্রশিক্ষণগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। উৎকৃষ্টমানের প্রশ্ন তৈরি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে কোন ধরনের প্রশ্নের মোকাবেলা করার সামর্থ্য সব শিক্ষকের থাকে না। সর্বোপরি শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি যথার্থ না হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন সম্ভবপর নয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ দিলে শিক্ষার্থী চিন্তাশীল ও সক্রিয় থাকে। শ্রেণি নিয়ন্ত্রণে এ পদ্ধতির প্রয়োগ কার্যকরী ফল লাভ ঘটে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

- **আরোপিত কাজ পদ্ধতি (Assignment Method)**

আরোপিত কাজ এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি, যাতে শিক্ষক নিজে পাঠ্যবিষয় আলোচনা করার পূর্বেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই পাঠ্যবিষয়টি অনুধাবন করার নির্দেশ দান করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। শিক্ষকের নির্দেশ মতো শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়টি পড়ে ও বুঝে নিজেরাও তার মর্ম গ্রহণে তৎপর হলে তাদের কল্পনা শক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মতামত গঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা, মতামত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দিলে শিক্ষক আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করতে পারেন।

- **সেমিনার পদ্ধতি (Seminar Method)**

ইংরেজি ‘Seminar’ শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছোট ক্লাস। সেমিনারে প্রবন্ধ লেখা ও তা উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। সেমিনারে প্রধানত সমস্যামূলক এবং ইস্যুভিত্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং সেমিনার আলোচনা পদ্ধতি সাধারণত বয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের জন্যই অধিকতর উপযোগী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীরাই প্রধানত সেমিনার জাতীয় আলোচনা করে থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণিতেও সেমিনার আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু থেকে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীরা আলোচনা করলে এ পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ সার্থক হয়। সেমিনার আলোচনা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়ায় এবং স্বয়ংশিক্ষা অর্জন করার অনুপ্রেরণা যোগায়।

- **বিতর্ক পদ্ধতি (Debate Method)**

বিতর্ক মূলত একটি আলোচনা। কোন বিষয় যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রতিপক্ষের উপস্থিতিতে যুক্তি প্রমাণসহ বক্তৃতা করা হচ্ছে বিতর্ক। এই আলোচনায় নির্ধারিত কোন বিষয় বা ইস্যুতে দু'দল শিক্ষার্থী পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন ও যুক্তিখণ্ডনের মাধ্যমে আলোচনায় সক্রিয় হয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা এ আলোচনা শুনে। শিক্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিতর্ক মূল্যায়নের জন্য দুই বা ততোধিক বিচারক থাকেন। শিক্ষকগণ বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু ও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক চিন্তা করে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। আবার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশে বিতর্ক একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। তবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে বিতর্ক বহুল ব্যবহৃত হলেও শ্রেণি শিক্ষণে এ পদ্ধতি তেমন প্রচলিত নয়।

শিখন সূত্রগুলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলে রূপান্তর

সাধারণত শিখন বলতে অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে বোঝায়। শিখনের মাধ্যমেই প্রাণি তার আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায়। মানব শিশুর জীবনে শিখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন কিছু আয়ত্ত করাই হচ্ছে শিখন। সেটা হতে পারে কতগুলো ধারণা, তত্ত্ব ও তথ্য, কোন বিশ্বাস, কোন দৃষ্টিভঙ্গি, আবার কতকগুলো কাজের দক্ষতাও হতে পারে। কিন্তু নতুন যা আয়ত্ত করা হচ্ছে তার মূলে রয়েছে পুরানো অভিজ্ঞতা। সেই পুরানো অভিজ্ঞতা আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে নতুন অভিজ্ঞতার দিকে। নতুন ও পুরানোর মধ্যে বোঝাপড়া করেই হয় শেখা। "অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোই হচ্ছে শিখন"। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের ব্যবহারে যে পরিবর্তনের ছাপ লাগে, তাই হল শিখন। সাধারণভাবে শিখন বলতে বুঝায়- নতুন কোন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অর্জন, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রাণীকে অভিযোজিত হতে সাহায্য করে। অর্থাৎ নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য প্রাণির আচরণের মধ্যে যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায় তাকে শিখন বলা হয়। অন্যদিকে বলা যেতে পারে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাণির নতুন বিষয় আয়ত্ত করার নামই হলো শিখন। সুতরাং অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার মাধ্যমে প্রাণির আচরণের যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, তাকেই বলা হয় শিখন। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে আচরণের যে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে শিখন বলে।

কার্যকর শিখনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে শিখনের অনুকূল পরিবেশ। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় এবং শিক্ষার্থীর পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতা যদি সমস্যা সমাধানের উপযোগী না হয় তাহলে কার্যকর শিখন আশা করা যায় না। অন্যদিকে শিক্ষার্থী যদি তার নিজের প্রচেষ্টা ও শিখনের ফলাফল দেখতে পায় এবং তার অর্জিত ফল যদি তার মনে অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে তাহলে শিখন সার্থক হবে। আবার শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকলেও শিখন সার্থক হবার সম্ভাবনা থাকে। পূর্বে যে শিখন শিক্ষার্থী অর্জন করেছে তা যদি সে সঞ্চালন, সম্প্রসারণ ও প্রয়োগ করতে পারে তাহলে শিখন কার্যকর হয়। শিখনের বেশ কিছু সূত্র রয়েছে। এর মধ্যে ই.এল. থর্নডাইক এর সংযোজনবাদবা প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ, আইভান প্যাভলভের চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ মতবাদ ওবি.এফ. স্কিনার-এর করণ শিখন মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

১. থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন শিখন মতবাদ

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লি থর্নডাইকের মতে,'উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হল শিখন'। আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বার বার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে শুধরে ফেলে এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। তখনই বলা হয় যে শিখন সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি এই শিখন তত্ত্বের নাম দিয়েছেন প্রচেষ্টা ও ভুল মতবাদ (Trial and Error Method) । থর্নডাইক শিখনের ওপর অনেক সূত্র উদ্ভাবন করেন। তবে শিখনের জন্য তিনটি সূত্রকে প্রধান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেমন-ক. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness); খ. ফললাভের সূত্র (Law of effect);গ. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)।

ক. প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness):সব প্রাণীর মধ্যে শিখনের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি থাকে। তিনি বিড়াল নিয়ে একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন। বিড়ালটি ছিল ক্ষুধার্ত। তাকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। বাইরে ঝুলানো ছিল মাছের টুকরা যা বিড়ালটি খাঁচার ভিতর থেকে দেখতে পেত। খাঁচাটির ব্যবস্থা এমন যে বিশেষ একটি চাবিতে চাপ দিলেই খাঁচার দরজা খুলে যাবে এবং বিড়ালটি বের হয়ে আসতে পারবে। বিড়ালটি মাছটি পাবার জন্য খাঁচার ভিতর এলোমেলোভাবে চেষ্টা করে। এক সময় যথাস্থানে থাবার চাপটি পড়ায় দরজা খুলে যায় এবং বিড়ালটি বাইরে এসে মাছটি পেয়ে যায়। প্রথমবার বের হয়ে আসতে বিড়ালের সময় লেগেছিল ১৬০ সেকেন্ড। এরপর একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিড়ালকে বার বার ঐ খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। দেখা যায় পরবর্তী প্রতিটি প্রচেষ্টায় তার সময় কম লাগছে। ২৪তম প্রচেষ্টায় খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে তার সময় লেগেছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড। এ থেকে বোঝা যায় প্রাণি প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুল শুধরে শিখে।

খ. ফললাভের সূত্র (Law of effect): শিখন তখনই সংঘটিত হয় যখন প্রাণী উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাঝে সঠিক সংযোগ সাধন করতে পারে। এ শিখন স্থায়ী হয়। তবে শিখন স্থায়ী না হলে শিখনে অতৃপ্তি ছিল। থর্নডাইকের মতে শুধু ইতর প্রাণীই নয় মানুষও এই পদ্ধতিতে শিখে থাকে।

গ. অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise): থর্নডাইক মনে করেন বার বার অনুশীলনের ফলে চেষ্টা ফলপ্রসূতা লাভ করে। উল্লেখ্য বার বার চেষ্টার ফলে উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ় হয়। একেই তিনি অনুশীলন বলেছেন। সুতরাং অনুশীলনের মাধ্যমেই শিখন সার্থকরূপ লাভ করে। ভাষা, অংক, নামতা, ব্যাকরণ, ইত্যাদি শিখতে মানুষ প্রথমে ভুল করে তারপর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে ভুলগুলো শুধরে সঠিক প্রতিক্রিয়া করতে পারে। সাধারণ প্রাণীর মত শিশুর জন্যও পদ্ধতিটি প্রযোজ্য। এটি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। অনুশীলন ছাড়া শিখন সম্ভব নয় সাথে প্রয়োজন প্রেষণা, আগ্রহ। অনুশীলন ছাড়া কেউ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। শিখনের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতিও অতি আবশ্যক।

২. প্যাভলভের চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ শিখন মতবাদ

রাশিয়ার শরীরতত্ত্ববিদ আইভান প্যাভলভ-এর মতে প্রকৃত উদ্দীপকের সাথে একটি কৃত্রিম উদ্দীপক বার বার উপস্থাপিত হলে যে প্রতিক্রিয়া হয়, পরবর্তীতে শুধু কৃত্রিম উদ্দীপকের উপস্থিতিতেই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াকে সাপেক্ষীকরণ বলে। এ ব্যাপারে প্যাভলভ একটি কুকুরকে নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি প্রথমে কুকুরের সামনে এক টুকরা মাংস রাখলেন, দেখলেন যে তাতে কুকুরের মুখ থেকে লালা নির্গত হচ্ছে। এরপর শুধু ঘণ্টা ধ্বনি করলেন তাতে লালা নির্গত হল না। তারপর তিনি ঘণ্টা ধ্বনি দেয়ার পরপরই মাংস খণ্ড কুকুরের সামনে উপস্থাপন করলেন। দেখলেন যে এবারে লালা নির্গত হচ্ছে। এ ব্যাপারটি তিনি বার কয়েক করলেন। তারপর শুধু ঘণ্টা ধ্বনি করলেন। দেখলেন তাতেও লালা নির্গত হচ্ছে। শুধু ঘণ্টা ধ্বনিতে আগে লালা আসেনি। কিন্তু মাংস পিণ্ডের সংগে একে জুড়ে দেওয়ার ফলে পরবর্তীতে শুধু ঘণ্টা ধ্বনিতে লালা নির্গত হচ্ছে। ঘণ্টা ধ্বনির প্রতি লালা নিঃসরণকে প্যাভলভ নাম দিলেন সাপেক্ষ প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এখানে মাংসপিণ্ড হচ্ছে স্বাভাবিক উদ্দীপক আর ঘণ্টা ধ্বনি হচ্ছে নিরপেক্ষ উদ্দীপক। এভাবে নিরপেক্ষ উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকই সাপেক্ষ উদ্দীপকে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সাপেক্ষ উদ্দীপক দিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। এই জাতীয় শিখনকে প্রতিবর্তক্রিয়া বলা হয়। প্যাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনুসরণ করে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শব্দ, ভাষা ইত্যাদি শিখানো যায়।

৩. বি.এফ. স্কিনার এর করণ শিখন মতবাদ

মনোবিজ্ঞানী বি.এফ. স্কিনার এর মতে, 'যে সব আচরণ বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির বা প্রাণীর জীবনে কোন প্রয়োজন সাধন করে বা কোন প্রেষণা নিবৃত্তি করতে সাহায্য করে সে আচরণ শিখনকে করণ শিখন বলে।' করণ শিখনের মূল কথাই হচ্ছে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ। কোন আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি পুরস্কৃত হয় বা তৃপ্তি লাভ করে। শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে পুরস্কার বা Reinforcement হিসেবে প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

একুশ শতকের শিখন দক্ষতা

'একুশ শতকের দক্ষতা' বলতে বুঝানো হচ্ছে বিস্তৃত জ্ঞান ও দক্ষতা, কর্ম, অভ্যাস এবং চারিত্রিক গুণাবলি যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি, সমসাময়িক ক্যারিয়ার গঠনে এবং কর্মক্ষেত্রে সফলতার সাথে একজন মানিয়ে চলতে পারে। এই টার্মটি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণভাবে বলা যায় একুশ শতকের দক্ষতা সকল একাডেমিক বিষয়ে এবং একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের সকল শিক্ষা কার্যক্রম, ক্যারিয়ার গঠন ও সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

গবেষণার ফলাফলে একুশ শতকের দক্ষতার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ১৬টি দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ১৬টি দক্ষতাকে ৩টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ মৌলিক সাক্ষরতা, যোগ্যতা এবং চারিত্রিক গুণাবলি। মৌলিক সাক্ষরতা না থাকলে আমরা একজনকে নিরক্ষর বলে থাকি। ১৬টি দক্ষতার মধ্যে ৬টি হলো মৌলিক সাক্ষরতা, যথাঃ অক্ষর সাক্ষরতা, গাণিতিক সাক্ষরতা, বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা, আইসিটি সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সাক্ষরতা। এ মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই শিক্ষাক্রমে এবং পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত সচেতনভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মৌলিক সাক্ষরতার মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৪টি দক্ষতা নিয়ে একুশ শতকের উপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এ যোগ্যতাটুকু অর্জনের জন্য যে দক্ষতাগুলো চর্চা করতে হবে সেগুলো হলো: সমালোচনামূলক চিন্তা/সমস্যা সমাধান দক্ষতা, সৃজনশীল দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সহযোগিতালমূক দক্ষতা। শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তকে এ দক্ষতাগুলো প্রদান করা হলেই শিক্ষার্থীরা এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে বিষয়টি তা নয় বরং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মধ্যে প্রত্যেকটি দক্ষতার জন্য প্রক্রিয়াগুলো সন্নিবেশিত করতে হবে।

একুশ শতকের যোগ্য শিক্ষার্থী তৈরির জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কৌশলসমূহ-

সমালোচনামূলক চিন্তা/সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Critical thinking/Problem solving skill)

সমালোচনামূলক চিন্তা বা সমস্যা সমাধান দক্ষতা হলো কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কী করা যায় বা কী করা উচিত সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ও যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা। অন্যভাবে বলা যায়, এটি হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে আত্মস্থ করে, প্রয়োগ করে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে এবং মূল্যায়ন করে সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য এ প্রক্রিয়ায় সবাইকে হতে হবে যুক্তিবাদী, বিশ্লেষক ও মূল্যায়নকারী। সমালোচনামূলক চিন্তন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য যে কাজগুলো উন্নত বিশ্বে করানো হয়, সেগুলো হলো শনাক্ত করা বা চেনা, পার্থক্য করা, বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করা, আনুক্রমিক বা ক্রমানুযায়ী করে সাজানো, ভবিষ্যৎবাণী করা, অনুমান করা, মূল্যায়ন করা, বিশ্লেষণ করা, সংশ্লেষণ করা, উপসংহার টানা, শ্রেণিবদ্ধ করা ইত্যাদি। বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থেকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যে কৌশল ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যায় সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন-উত্তর কৌশল: শ্রেণিতে যে বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে সেটি সম্পর্কে কমপক্ষে ১০ মিনিট সময় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। প্রশ্ন করার কৌশলগুলো প্রথমেই শিখিয়ে দিতে হবে। যেমন: ৬টি শ্বাশত প্রশ্ন: কে (মুখ্য চরিত্র বা প্রতিনিধিত্বশীল বস্তু), কী (কার্যাবলি), কখন (সময়), কোথায় (দৃশ্যকল্প বা উৎসসমূহ), কেন (উদ্দেশ্য) এবং কীভাবে (পদ্ধতিসমূহ)। প্রথম দিকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা যেকোনো ২/৩টি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার কৌশলটি শিখিয়ে দিতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার কৌশলগুলো শিখে নেবে এবং আনন্দের সাথে সময়টি উপভোগ করবে।

সমস্যা সমাধান কৌশল: এ কৌশলটি প্রয়োগের জন্য ১০/১৫ মিনিট সময় নেওয়া যায়।শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়বস্তু থেকে একটি সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। এ কৌশলটি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমাধানের প্রচেষ্টা নিতে হবে। প্রথমত, সমস্যাটি শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ সমস্যাটি সমাধানের জন্য সম্ভাব্য পছন্দগুলো শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করবে। তৃতীয়ত, চিহ্নিত সকল পছন্দগুলোর প্রত্যেকটির পরিণতি বের করতে হবে। চতুর্থত, পরিণতির ভিত্তিতে সেরা সমাধানটি চিহ্নিত করতে হবে।

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা: শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে ৫/১০ জন শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলতে হবে। শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করার সময় বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা করে এর ভালো-মন্দ, কার্যকর-অকার্যকর দিক, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি তুলে ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করবে। এ কৌশলটি প্রতিনিয়ত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায়।

চার কোণা বিতর্ক: অন্যান্য বিতর্কের মত একটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এ বিতর্কের মূল বিষয় হলো শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ আছে। বিতর্কের বিষয়ের ওপর ৪টি দল, যথা:- জোরালোভাবে পক্ষে, পক্ষে, জোরালোভাবে বিপক্ষে এবং বিপক্ষে সকল শিক্ষার্থীদের ভাগ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের চার কোণায় ৪টি দলে ভাগ করে প্রথমে আলোচনার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রত্যেক দল থেকে ২/৩ জনকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ৪ দলের বক্তব্য শোনার পর কেউ দল পরিবর্তন করতে চায় কিনা আহ্বান করতে হবে। কেউ তা চাইলে কী কারণে পরিবর্তন করতে চায় তা শুনতে হবে। এভাবে বিতর্ককে প্রাণবন্ত করে শেষ করা যায়। এ ধরনের বিতর্ক সপ্তাহে বা পাক্ষিকভাবে আয়োজন করা হলে শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বুদ্ধির খেলা: শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধির খেলা ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলো নিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি উপযোগী করে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়াও বাজারে বুদ্ধির খেলা বিষয়ক বই পাওয়া যায়। এটুআই-এর উদ্যোগ কিশোর বাতায়নে বুদ্ধির খেলা নামে একটি বাটন আছে সেখান থেকেও বিভিন্ন খেলা সংগ্রহ করা যাবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা একঘেয়েমি অনুভব করলে সকল শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে এ খেলার ব্যবহার করা যায়। যেমন: একটি ঝুড়িতে ৬টি ডিম আছে, ৬জন একটি করে ৬টি ডিম নিলে কী করে ১টি ডিম ঝুড়িতে থাকবে?

উপস্থিত বক্তৃতা:এ কৌশলটি প্রয়োগের জন্য ১০ মিনিট সময় নেওয়া যায়। শ্রেণিকক্ষে কোন বিষয় উপস্থাপনার শেষের ১০ মিনিট উপস্থিত বক্তৃতার জন্য রাখা যায়। শিক্ষক পূর্ব থেকেই বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ১০/১৫টি প্রশ্ন ঠিক করে ছোট কাগজের টুকরায় লিখে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের সামনে ডেকে একটি কাগজের টুকরা টেনে এর ওপর ২ মিনিট বক্তৃতা দিতে উৎসাহিত করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এ কৌশলগুলো সকল বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন কোন বিষয়ের জন্য কোনটি ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য যে, এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কৌশল রয়েছে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায় এবং সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। তবে এগুলো নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখবে ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking skill)

এটি হলো নতুন কিছু চিন্তা করা বা কোন একটা বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচলিত চিন্তার বাইরে নতুনভাবে চিন্তা করা। সৃজনশীল দক্ষতার জন্য সবসময় বাক্সের বাইরে থেকে চিন্তা করতে হবে। এই দৃষ্টিকোন থেকে সৃজনশীল দক্ষতা হলো কোন একটি বিষয়বস্তুর পারিপার্শ্বিক চিন্তা অথবা যা স্পষ্ট নয় সেটির একটি কাঠামো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সামর্থ্য অর্জন করা। সৃজনশীল দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে যে সকল কাজকরা যায় এবার তা বর্ণনা করা হলো। শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী কার্যক্রমের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী ধারণা স্পষ্ট হওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাক্রমের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে যে সকল কাজ করা যায় সেগুলো হলো:

- **সচেতনতা:** যেকোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার জন্য প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা করতে হবে। একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী ধারণার ভিত্তিতেই সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। কোন অবস্থায় একটি বিষয়বস্তু শিক্ষকগণ ব্যাখ্যা করবেন না। যেমন: চারপাশ অর্থাৎ ডানে-বামে, সামনে-পিছনে বা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা 'তোমার হাতে পেন্সিল বা কলমের কয়টি দিক আছে?' পরিবেশের উপাদান সংক্রান্ত আলোচনার শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা 'তোমার জানা পরিবেশের মধ্যে নরম বস্তুর একটি তালিকা তৈরি কর।'
- **অনুসন্ধিৎস্যু:** শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তুর গভীরে ঢোকার জন্য ঔৎসুক করে তুলতে হবে। তা করার জন্য নতুন নতুন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় দিতে হবে। যেমন: আকাশের রং নীল কেন? একজন নভোচারী হতে তোমার কী কী পছন্দ করা উচিত?
- **অনুমান করা:** শিক্ষার্থীদের অনুমান করতে শেখাতে হবে। অনুমান করার পিছনে যৌক্তিকতা থাকতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের এককভাবে কাজ দিতে হবে। যেমন: এখানে বাজ পড়লে কী হবে? আগামী ১০ বছর পর তোমার স্কুলটি কেমন দেখতে চাও? আগামী ১০ বছর পর তোমার দেশটি কেমন দেখতে চাও?
- **সাবলীলতা:** শিক্ষার্থীদের সাবলীল করে তুলতে হবে। তাদের কথাবার্তায় ও চিন্তাভাবনায় কোন জড়তা রাখা চলবে না। সাবলীল করার জন্য শিক্ষার্থীদের লম্বা তালিকা তৈরির কাজ দিতে হবে। যেমন: বাজারে তোমার দেখা লাল রংয়ের জিনিসপত্রের একটি তালিকা তৈরি কর। তোমার জানা ঠান্ডা বা গরম বস্তুর তালিকা তৈরি কর। বারবার লম্বা তালিকা তৈরি করলে শিক্ষার্থীদের সাবলীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- **নমনীয়তা:** শিক্ষার্থীদের নমনীয় হওয়ার কৌশল শেখাতে হবে। নমনীয়তা শেখানোর কৌশল হলো 'বৃক্ষের মত তোমার পেন্সিল খাড়া কেন?' 'ক্ষুদ্র, বিরাট, আলো শব্দগুলোর সাদৃশ্য বিভিন্ন বস্তু লিপিবদ্ধ কর' কাজগুলো দেওয়া যায়।
- **স্বকীয়তা:** প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেওয়া যায়। যেমন:'তোমার ভাললাগার বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ কর।' 'একটি নতুন ধরনের খাবার বা আইসক্রীম তৈরির প্রণালী লিখ এবং এর নাম দাও।'
- **বিশদ বর্ণনা করা:** শিক্ষার্থীদের যেকোন বিষয় বিশদ বর্ণনা করার কাজ দিতে হবে। যেমন: 'তোমার জীবনের গল্প বল।' 'তোমার জীবনের একটি বিশেষ দিনের গল্প বল।' আমি ট্রেনে যাচ্ছি... আমি বাজারে গেলাম...।' এ ধরনের একটি লাইনের সূত্রপাত করে দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের তা বিশদ বর্ণনা লিখতে দিতে হবে।
- **অধ্যবসায়ী হওয়া:** শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ী হওয়ার চর্চা করাতে হবে। এজন্য বুদ্ধির খেলা দিতে হবে। বাজারে বুদ্ধির খেলার বই পাওয়া যায়। ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া 'কিশোর বাতায়ন' থেকে বুদ্ধির খেলা নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। কোন অবস্থায় বুদ্ধির খেলার উত্তরগুলো বলে দেওয়া যাবে না।

এ ধরনের কাজগুলো শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে এবং বাড়ির কাজ হিসেবে প্রতিনিয়ত করাতে হবে। এ কাজগুলো করানো হলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এখন শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করা যায় তা বর্ণনা করা হল:

গল্প বা পত্র লেখা: বাংলা বিষয়ে কোন গল্প পড়ানোর পর এ গল্পটি বিকল্প কীভাবে হতে পারত তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে লিখতে দিতে হবে। তাছাড়াও রোজনামচা লিখতে দেওয়া, বন্ধুর নিকট পত্র লেখা ইত্যাদি নিয়মিত করালে এ দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণিকক্ষে দেয়াল পত্রিকার ব্যবস্থা করা যায়। প্রতি সপ্তাহে বা পাক্ষিক তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আঁকতে দেওয়া: প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের কোন না কোন বিষয়ে আঁকতে দেওয়া উচিত। তা পরিকল্পিতভাবে হতে হবে। যেকোন বিষয়ে একটি দৃশ্যকল্প তৈরি করে তা আঁকতে বলতে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সৃজনশীল দক্ষতা বাড়বে।

গল্প বলা:শিক্ষার্থীদের দিয়ে ধারাবাহিক গল্প বলার অভ্যাস করাতে হবে। তাছাড়াও বাংলা বা সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে উৎসাহিত করতে হবে। গল্প বলার ক্ষেত্রে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করার জন্য বলতে হবে। উদ্ভট বা আজগুবি চরিত্র হলেও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। নিয়মিত গল্প বলার অভ্যাস করা হলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

স্বপ্ন দেখা: শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখাতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বপ্ন দেখাতে হবে। যেমন: হিমালয়ের চূড়ায় উঠা, নভোচারী হওয়া, মঙ্গল গ্রহকে বাসের উপযোগী করা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের স্বপ্নগুলো শ্রেণিকক্ষে বলা এবং লেখার অনুশীলন করাতে হবে।

ভূমিকাভিনয়: বাংলা, ইংরেজি, সামাজিক বিজ্ঞান, ক্যারিয়ার শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কোন বিষয়বস্তু আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে সে বিষয়বস্তুর ওপর ভূমিকাভিনয়ের আয়োজন করা যায়। তা করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের প্লট তৈরির জন্য সময় দিতে হবে। প্লট তৈরির ক্ষেত্রে একটা সূচনা, ক্লাইমেক্স, এন্টি-ক্লাইমেক্স এবং পরিসমাপ্তির প্রয়োজন হয়, সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এক-দুই বার দেখিয়ে দিলেই শিক্ষার্থীরা ভূমিকাভিনয়ের প্লট তৈরি করে এ দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

বুদ্ধির খেলা: পূর্বের বর্ণনা মোতাবেক শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির খেলা দেওয়া হলে তাদের একাধারে সৃজনশীল দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

মিথস্ক্রিয়া: এ কৌশলটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি পাবেই। এটি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করার জন্য ১০/১৫ মিনিট সময় নিতে হবে। একটি বিষয়বস্তু আলোচনা করার পর বোর্ডে একটি সমস্যা বা একটি বিবরণ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট থাকতে বলতে হবে। সমস্যা বা বিবরণটি প্রয়োজনে আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নতুন নতুন ধারণা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। প্রত্যেকটি ধারণা শিক্ষার্থীদের বলতে দিতে হবে, পুনরাবৃত্তি হলেও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। নতুন ধারণা বোর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সবগুলো থেকে সর্বোত্তম ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

এ কৌশলগুলো সকল বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। শিক্ষকগণ নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন কোন বিষয়ের জন্য কোন কৌশলটি ব্যবহার করা যায়। উল্লেখ্য যে, এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কৌশল রয়েছে যেগুলো শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যায় এবং সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এগুলো ব্যবহার করতে হবে। তবে এগুলো নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখে সৃজনশীল দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skill)

যোগাযোগ দক্ষতা হলো কোন একটি বিষয়বস্তুর মৌখিক বা লিখিত বর্ণনা। আন্তঃযোগাযোগ ও ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা। পিটার. আর. গারবের (২০০৮) গবেষণায় দেখা যায়, আমরা মোট সময়ের ৭০% সময় অন্যান্যের সাথে যোগাযোগে ব্যয় করে থাকি। তাই এ দক্ষতা অর্জনের জন্য পড়া, শোনা, বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ১৬% সময় পড়া, ৯% সময় লেখা, ৪৫% সময় শোনা এবং ৩০% সময় বলাতে ব্যয় করা যায়। শিক্ষার্থীদের মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে কাজগুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, সেগুলো হলো- ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি, শব্দের সুন্দর উচ্চারণ, বলার সময় উচ্চারণের তারতম্য করা, শারীরিক ভাষা সংযত রাখা, বেশি পড়া, বেশি শোনা, জ্ঞানীদের সাথে কথা বলা, ভাল চিন্তার অভ্যাস করা, দ্রুত কথা না বলা, সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা, একজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য না বলা, আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা, ইতিবাচক মন্তব্য তুলে ধরা, শ্রোতার সাথে যথাযথ চক্ষু যোগাযোগ স্থাপন করা, সঠিক সময়ে হাসার চেষ্টা করা। শিক্ষার্থীদের মৌখিক যোগাযোগ চর্চার সময় উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে হবে। উল্লেখ্য, এখন যোগাযোগ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যা শুধুমাত্র পরিবার বা বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের অভ্যন্তরে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকল উন্নয়ন এবং গ্লোবালাইজেশনের মূলে রয়েছে যোগাযোগ। তাই শ্রেণিকক্ষে এ দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য যে কৌশলগুলো ব্যবহার করা যায় তা হলো:

শোনার দক্ষতা: শিক্ষার্থীদের এ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর একটি অংশ পড়ে শোনাবে, সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা কী বুঝল তা বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যখন কিছু বলবে তখন খেয়াল রাখতে হবে যা বলবে তা যেন সবাই শুনতে পায় এবং উপরে বর্ণিত কাজগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়।

মৌখিক উপস্থাপনা: যেকোন বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের তা মৌখিকভাবে বলার ব্যবস্থা করা যা বর্তমানে শ্রেণি কার্যক্রমে মূল্যায়নের একটি অংশ হিসেবে ভাবা হয়। মৌখিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, এ জন্য শিক্ষকগণ সজাগ থাকবেন যেন সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

কথোপকথন এবং আলোচনা: একটি পাঠ উপস্থাপনের পর ঐ বিষয়বস্তুর ওপর শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিষয় নিয়ে জোড়ায় কথোপকথন করা যায়। আবার দলীয়ভাবে আলোচনা করানো যায়। বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা উচিত যেন সেটি কোন প্রশ্ন আকারে না হয়। বরং তা হতে হবে শিরোনাম আকারে, উপশিরোনাম আকারে বা বিবরণ বা সমস্যা আকারে। যেমন, 'ঈদে ব্যাপকভাবে সড়ক দুর্ঘটনা হচ্ছে এর প্রতিকার কীভাবে হতে পারে?' 'পলিথিন একটি প্রয়োজনীয় বস্তু, তাই বলে কি এর ব্যবহার এতটা সহজলভ্য হওয়া উচিত?' 'ঢাকা শহরের ব্যাপক যানজটে কোন কাজটি জরুরি? 'ব্যাপক শস্য ও ফলমূল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার আমাদের কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে?' ইত্যাদি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা: বর্তমান বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী একটি সোসাল নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারে। নিজেদের মধ্যে একটি লার্নিং গ্রুপ তৈরি করে স্ব-শিখনের ব্যবস্থা নিতে পারে। এটুআই-এর কিশোর বাতায়ন শিক্ষার্থীদের মাঝে সামাজিক যোগাযোগ সৃষ্টি করার জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফরম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

স্বল্পকালীন বক্তৃতা: যেকোন বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের পর শিক্ষার্থীদের দিয়ে ১/২ মিনিটের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায়। বক্তৃতা দেওয়ার সময় শুরুতে যথাযথ এড্রেস করা, পরে বক্তৃতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা, যুক্তি তুলে ধরা, যুক্তির স্বপক্ষে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করা, একটি উপসংহার টানা ইত্যাদি কৌশল শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দিতে হবে।

সহযোগিতামূলক দক্ষতা

বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন দলের ধারণার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে কোন কাজকে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতাই হলো সহযোগিতামূলক দক্ষতা। শিক্ষার্থীদের এ দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণির বাইরে নিয়মিত দলগত কাজ দিতে হবে। তাছাড়াও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে হবে- জোড়ায় কোন বিষয়বস্তু নিয়ে কথোপকথন, কথোপকথনের একটি উপসংহার টানা, অন্যের সাহায্য নেওয়ার মানসিকতা তৈরি, অন্যকে প্রশংসা করা, নিজ সম্পর্কে অন্যের প্রশংসা শোনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগ দেওয়া, অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করা, নির্দেশনা মানা, সহপাঠিদের প্রশ্ন করা, অন্যকে ধন্যবাদ দেওয়া, 'না' বলতে পারা, না-কে গ্রহণ করা, অন্যকে উৎসাহ দেওয়া, ব্যক্তিকে নয় বরং তার ধারণার সমালোচনা করা, সংক্ষিপ্তকরণ, স্পষ্টীকরণ, নিজের অনুভূতি সম্পর্কে জানা ও বর্ণনা করা, অন্যের অনুভূতিগুলো জানা, সহানুভূতিশীল হয়ে কথা বলা, পারস্পরিক আলোচনা করা, অন্যের সম্পর্কে নিজের সংশ্লিষ্টতা বাড়ানো, শোনা, উত্তেজিত না হওয়া, বিরক্তি প্রকাশ না করা, দায়িত্ব নেওয়া, ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়া, অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করা, টাস্ক শেষ করা ইত্যাদি।. শিক্ষার্থীদের এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে নিম্নরূপ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা যায়:

জোড়ায় বা দলগত কাজ: বর্তমানে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জোড়ায় এবং দলগত কাজ প্রতিনিয়ত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সচেতনভাবে এ দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। যেমন দলগত কাজে কোন একটি প্রশ্ন নিয়ে কাজ করতে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থী এ প্রশ্নটির উত্তর লিখতে বা বলতে সক্ষম সে শিক্ষার্থীই মুখ্য ভূমিকা রাখে এবং অন্য সবাই নিষ্ক্রিয় থাকে। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সহযোগিতামূলক দক্ষতা বাড়ার সুযোগ কম থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে এ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে কোন বিষয়বস্তু শিক্ষক নিজে ব্যাখ্যা না করে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনাপূর্বক জোড়ায় বা দলগত কাজ দিতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, দলগত কাজটি যেন কোন প্রশ্ন আকারে না হয় বরং পাঠ সংশ্লিষ্ট সমস্যা, শিক্ষার্থীদের মতামত দেওয়ার জন্য একটি বিবরণ বা শিরোনাম বা উপ শিরোনাম ইত্যাদি রূপে দেওয়া হয়।

দলীয় বিতর্কের ব্যবস্থা করা: শিক্ষার্থীদের মাঝে সহযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত শ্রেণিওয়ারী বিতর্কের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যায়। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য 'চার কোণা বিতর্ক' ব্যবস্থা করা যায় যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত বিতর্কের ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার্থীদের মাঝে সমস্যা সমাধান দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা এবং সহযোগিতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ভূমিকাভিনয়: শ্রেণিতে একটি বিষয়বস্তু আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয়বস্তুতে আরো গভীরে প্রবেশ করানোর জন্য বিভিন্ন দলে ভাগ করে ভূমিকাভিনয়ের ব্যবস্থা করা যায়। আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়ে দলগতভাবে চরিত্র সৃষ্টি, ডায়লগ নিয়ে আলোচনার জন্য একটা নির্ধারিত সময় বরাদ্দ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রত্যেক দলকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থাপনার সুযোগ করে দিতে হবে। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত একটি জুরি বোর্ডের মাধ্যমে দলীয় উপস্থাপনার মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেয়ালিকা বা অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশ করা: বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটিকে সম্প্রসারিত করে প্রতি পাক্ষিক শ্রেণিওয়ারী দেয়ালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে যা শ্রেণিকক্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তা প্রকাশের ব্যবস্থা নেওয়া যায়, শিক্ষার্থীদের নিয়েই একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করতে হবে। দেয়ালিকা প্রকাশের সাথে সাথে তা মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণির প্রকাশিত দেয়ালিকা থেকে লেখা নিয়ে বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে একটি অনলাইন ম্যাগাজিন প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণির একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা যায়। কোন শিক্ষার্থী একবারের বেশি সম্পাদনা পরিষদের সদস্য হিসেবে থাকতে পারবে না। প্রথম দিকে দেয়ালিকা/ম্যাগাজিনের মানের বিষয় গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক সচেতনভাবে শিক্ষার্থীদের ৪টি দক্ষতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রমে বর্ণিত কৌশলগুলো প্রয়োগ করলে ২১ শতকের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের যেমনি মেধা ও মননশীলতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়াও পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফলে আরো উন্নতি পরিলক্ষিত হবে। (সূত্র:আহমেদ,ফারুক, একুশ শতকের শিখন দক্ষতা, ঢাকা: এটুআই-২০১৭)

৬.২ শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির পার্থক্য ও শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল অনেক ধরনের। এর কয়েকটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কয়েকটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষালাভে সহায়ক। সব পদ্ধতিরই কমবেশি সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এমন কোন পদ্ধতি বা কৌশল নেই যেটি সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমভাবে উপযোগী বা সব ধরনের বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী। শিক্ষকের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর দক্ষতা এবং শ্রেণি ও পাঠ উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্য। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে একটি পাঠ পরিচালনায় শিক্ষককে একটি পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে। পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষক পরিস্থিতি অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশলের সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের বিচক্ষণতা এবং বিষয়জ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের ওপর। এজন্য বলা হয় শিক্ষকই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তবে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির দুর্বলতা হল এতে শিক্ষক পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন, শিক্ষার্থী শুধু শ্রোতা হয়ে শোনে। কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে শিক্ষক আলোকপাত করেন, মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন, শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে শুনছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখেন, বাড়ির কাজ প্রদান করে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করছেন ভেবে সন্তুষ্টি লাভ করেন। অপরপক্ষে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি সচল থাকে, প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু সে সঙ্গে সঙ্গে আত্মীকরণের চেষ্টা করে, নিজের পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে দিনের পাঠ্যবিষয়বস্তুর জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করে, জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে শিক্ষকের নিকট খোলামেলা প্রশ্ন করে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সাথে তার্কিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মেধাবী ও চিন্তাশীল শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রবেশ করে নিজের উন্নত চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি বহুবিধ। তবে শিক্ষকের অধিক সংখ্যক পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তিনি যে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি উপযোগী তা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে নিজের মতো করে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষক যদি বুঝতে পারেন যে প্রয়োগকৃত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিখনে ফলপ্রসূ হচ্ছে না তখন তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন।

শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যগলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হলো-

শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি
• শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের বক্তৃতা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের নোট গ্রহণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।	• শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কীভাবে শিখছে, কী পরিবেশে শিখছে সে বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়।
• শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য যতটা কার্যকর, কম মেধাবীদের জন্য ততটা নয়।	• শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করে।
• শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।	• এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে।

• শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে শিখনের ওপর নিজস্ব মতামত দেওয়ার সুযোগ খুব সীমিত। • শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষকের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হয়। • এই পদ্ধতিতে শিক্ষক পঠিত বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে পাঠদান কৌশল নিজেই নির্ধারণ করেন যাতে করে তিনি বিষয়বস্তু সার্থকভাবে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। • এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞানের সঞ্চালন করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি সনাতন শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহারে স্বাচছন্দ্যবোধ করেন। • উল্লেখযোগ্য শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, আবৃত্তি পদ্ধতি, টিউটোরিয়াল পদ্ধতি ও সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা।	• শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরশিখনের ওপর নিজস্ব মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে। • শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও দলীয় কাজের মাধ্যমে কাজ করার এবং প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ থাকে। • এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষকের সহায়তায় নিজেরাই গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পঠিত বিষয়বস্তুর প্রকৃত ধারণা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে। • এই পদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়ন করা। সুতরাং শিক্ষক নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল উন্নয়নে সদা তৎপর থাকেন। • উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি হলো আলোচনা পদ্ধতি, প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, আরোপিত কাজ পদ্ধতি, সেমিনার পদ্ধতি, বিতর্ক , ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, দলীয় কাজ।

শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা বেশি বিবেচনার দাবি রাখে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের মতো করে নিজ গতিতে শেখে। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর উপযোগী উপায়ে সহযোগিতা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর শিখন সহজ হয়। শিক্ষার্থীদের কাজ করতে দিলে, আইডিয়া শেয়ার করতে দিলে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ে। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতি এবং কৌশলগুলো গতানুগতিক এবং আধুনিক এ দু’ধরনের হতে পারে। আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলো শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং মিথস্ক্রিয়ামূলক। শিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক কলা-কৌশল বলতে বোঝায় শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীর সংক্রিয় অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্তকরণ। এগুলোর ব্যবহার শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের নিশ্চয়তা দেয়। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গতানুগতিক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অন্যতম পেশাগত দায়িত্ব হল, অংশগ্রহণমূলক আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষণ পরিচালনা করা। এতে মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখবে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা অনেকটা সাহায্যকারীর মত হলেও কোন অংশেই গৌণ নয়। শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে তাই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হয়। অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কলা-কৌশল বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষককেন্দ্রিক একঘেয়ে আনন্দহীন পদ্ধতি ও কৌশলের বিপরীতে একটি আধুনিক সক্রিয়তাভিত্তিক গতিশীল পদ্ধতি। শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে উপলব্ধি করা যায়-

- শিক্ষার্থীদের স্বক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে;
- জড়তা বিমোচন হয়;
- শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর যোগসূত্র সহজতর হয়;
- শিক্ষার্থীদের মেধা, সামর্থ্য, সবলতা, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের সুযোগ ঘটে;
- নিস্ক্রিয় শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যায়;
- আনন্দময় শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয়;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদানে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা হয়;
- শিখন কার্যকর হয়;
- শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই করা সহজ হয়;
- উপস্থাপন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রাচীনকালে গুরু ও শিষ্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিষ্য গুরুর গৃহে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করত। গুরু তার শিষ্যের সকল ধরনের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। মনে করা হত শিক্ষকরাই সব জানে, অপরদিকে শিক্ষার্থীরা কিছুই জানে না। তাদের কাজ হলো শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনা এবং মুখস্থ করা। এ জাতীয় ব্যবস্থাকে বলা হত ‘‘জগ-মগ তত্ত্ব।

ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। শিক্ষকের একক ভূমিকা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দলগত, একক সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। ফলে শিখন- শেখানো পদ্ধতিতে শিক্ষককেন্দ্রিকতা হতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সক্রিয় থাকবে, নিজের আগ্রহে শিখবে, নিজের প্রচেষ্টায় শিখবে এবং নিজের অভিজ্ঞতা নিজে প্রয়োগ করে তৃপ্তি লাভ করবে। তাছাড়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা রক্ষা ও বিকাশের জন্য শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মনোবিজ্ঞানীদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা যায়, A student-centered classroom æis an environment where previously reluctant learners transition into engaged learners, taking on the role of helping shape their own curriculum” (Henriksen, 2010, p. 46).

৬.৩ মাথা খাটানো, মাইন্ড ম্যাপিং,দলীয় আলোচনা, দলীয় প্রকল্প, সতীর্থ শিক্ষণ, ভূমিকাভিনয় কৌশল অনুশীলন

শিখন-শেখানো কার্যক্রমের তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই ছিলেন এককভাবে সক্রিয়। শিক্ষকের পরেই ছিল বিষয়বস্তুর অবস্থান। শিক্ষার্থীরা ছিল গৌণ। শিক্ষক বা গুরুগণ যা শেখাতেন, যেভাবে শেখাতেন তাই শিক্ষার্থীদের শিখতে হত অনেকটা বাধ্য হয়ে। কালের পরিক্রমায় এই তিনটি উপাদানের গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরাই কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমান সময়ে শিক্ষা অর্জন করা শিক্ষার্থীর কাজ আর শিখনে সাহায্য করা হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর বা শিশুর বয়স, অভিজ্ঞতা, রুচি, অনুরাগ এবং পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলগুলো প্রয়োগ করবেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলোকে অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভ করছে। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষর্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষক এখানে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান ও দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার, শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে। নিম্নে কিছু শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হলো যেগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক।

- **মাথা খাটানো(Brain storming)**

সাধারণভাবে ব্রেইন স্টর্মিং বলতে মাথা খাটানো, চিন্তার ঝড় বা আলোড়ন বুঝায়। তবে সাধারণত কোন গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে শিক্ষার্থীদের কিছু সময় সাধারণত (১-২ মিনিট) চিন্তা করতে বলা হয়। পরে তাদের চিন্তার ফল বলে বা লিখে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীকে একক বা দলীয়ভাবে কাজ করে,চিন্তা করে সমাধানের পথ খুঁজতে হয়। সমাধান সঠিক বা ভুল হোক, সম্পূর্ণ বা আংশিক যাই হোক তা নিয়ে সমাধানেরপথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষার্থীর চিন্তা করার এই প্রক্রিয়াকে মাথা খাটানো বলে।

এ কৌশল পরিচালনার সময় প্রশিক্ষক বা শিক্ষককে দু’টো গুরুত্বপূর্ণ নীতি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। নীতি দু’টোর একটি হচ্ছে, প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থী সকলের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত শিক্ষক/প্রশিক্ষক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অন্যটি হচ্ছে,দল থেকে যত বেশি ধারণা বের করে আনা যাবে তত বেশি সঠিক এবং পূর্ণ কার্যক্রমের তালিকা ও ধারণা চিহ্নিত করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ধারণাসমূহের তালিকা পরিশোধন প্রক্রিয়ায় পরিমার্জন করা যায়। শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কাজে ব্রেইন স্টর্মিং বা চিন্তার আলোড়ন নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **মাইন্ড ম্যাপিং(Mind Mapping)**

কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তন প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া, চিন্তা সংরক্ষণ করা এবং সর্বোপরি তা দর্শনযোগ্যভাবে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াকে মাইন্ড ম্যাপিং বলে। অর্থাৎ কোন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থী যখন চিন্তা করে তখন সে সম্পর্কে তার বিচিত্র ধারণা বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এক একটি ধারণার সাথে সম্পর্কিত অন্য বহু ধারণা একে একে মনে আসতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থী এভাবে ভাবতে ভাবতে মূল বিষয় ছাড়িয়ে বহু দূর চলে যেতে পারে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। শিক্ষক এ ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করবেন। বিষয় নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে চিন্তাপ্রসূত ধারণাগুলোকে পরস্পর যুক্ত করলে একটি মানচিত্রের উদ্ভব হয়। এই প্রক্রিয়াকে মাইন্ড ম্যাপিং বা মনচিত্র বলা হয়। মনচিত্র চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার একটি সংগঠিত উপায়। সাধারণত মনচিত্রের মাধ্যমে চিন্তাকৃত ধারণা ও এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয় যা বোধগম্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। A mind map is a graphical way to represent ideas and concepts. It is a visual thinking tool that helps structuring information, helping you to better analyze, comprehend, synthesize, recall and generate new ideas. Just as in every great idea, its power lies in its simplicity.(https://litemind.com/what-is-mind-mapping/)। মনচিত্র তৈরির দক্ষতা সহজে আয়ত্ত করা যায়। মনচিত্র দুই রকমের হতে পারে। মাকড়সা মনচিত্র ও শিকল মনচিত্র। এই মাকড়সা মনচিত্র চিত্রে মূল বিষয়টিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ-এর চারপাশে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে শিকল মনচিত্রে একটি কেন্দ্রিয় ধারণাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে প্রসারিত করতে হয়।

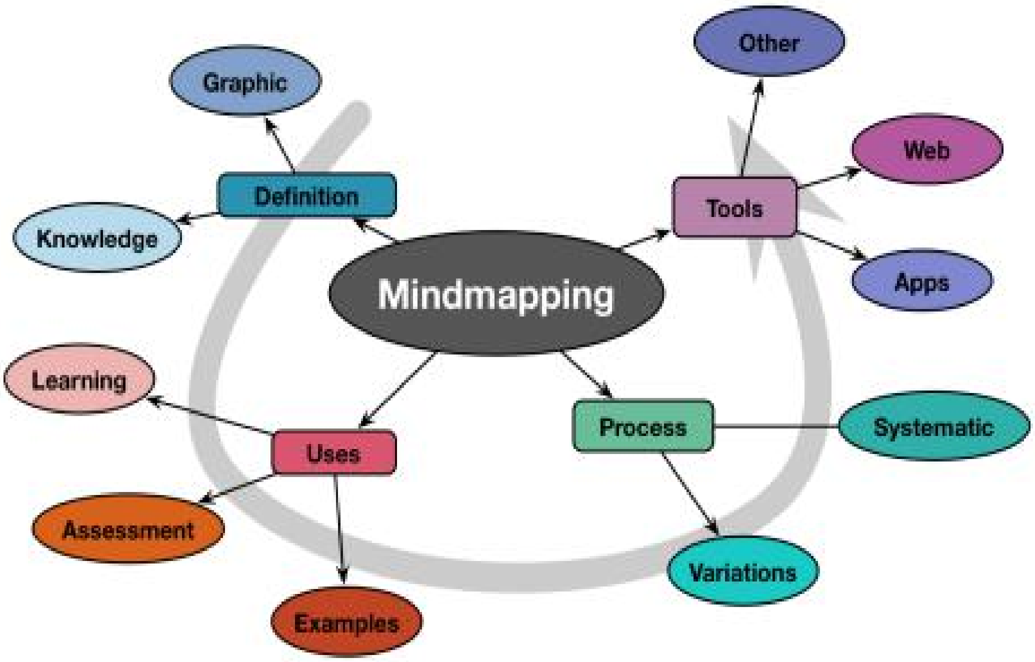

চিত্র ৫ : মাকড়সা মনচিত্র

- **দলীয় আলোচনা(Group discussion)**

বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন কাজ বা সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীরা দলগত অংশগ্রহণ করতে পারে। সমগ্র কাজটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে কাজের বন্টন করা যায়। আবার একই বিষয়ে সকলের নিজস্ব ধারণা সমন্বিত করে ফলাফল নির্ণয় করা যায়। দুটিই দলগত কাজ। লক্ষনীয় যে, উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই নিজে চিন্তা করতে হবে, বিচিত্র ধারণার প্রকাশ করতে হবে এবং একটি সিদ্ধান্তে স্থির হতে হবে। এভাবে দলীয় কাজের ফলাফলে বহুজনের স্বকীয়তার মিশ্রণে নতুন এবং কার্যকর পন্থার উদ্ভাবন ঘটে। Group discussion is a group activity carried by 8 to 10 members group for 15-20 minutes. GD is designed to exchange the thoughts and ideas among the members of the group on a particular subject. It is the best tool to select the prospective candidates in a comparative perspective. It is a useful tool to screen the candidates' potential as well as their skills. (https://blog.wisdomjobs.com/what-is-group-discussion-tips-for-an-effective-group-discussion/)। বিভিন্নভাবে দল গঠন করা যায়। সম-সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, মিশ্র সামর্থ্যের শিক্ষার্থীদের দল, বিষয়ভিত্তিক দল, অঞ্চলভিত্তিক দল ইত্যাদি।

- **দলীয় প্রকল্প/অনুসন্ধান (Group project)**

প্রজেক্ট পদ্ধতি আরেকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করে। জন ডিউই প্রবর্তিত সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় তাঁর শিষ্য উইলিয়াম হেড কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। স্বাভাবিক পরিবেশে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করা হচ্ছে এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। প্রজেক্ট পদ্ধতিকে স্টিভেনস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন অর্থাৎ "প্রকল্প হলো একটি সমস্যামূলক কর্ম, যা এর প্রাকৃতিক বিন্যাস বা স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়। Project method is one of the modern method of teaching in which, the students point of view is given importance in designing the curricula and content of studies. This method is based on the philosophy of Pragmatism and the principle of 'Learning by doing'. It demands work from the pupils.
(https://www.slideshare.net/MandeepGill1/project-method-of-teaching).
এখানে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও আগ্রহের ওপর নির্ভর করে কাজ বন্টন করা হয়। শিক্ষার্থী তার স্বকীয় প্রেরণায় কাজ করে, প্রয়োজনে শিক্ষকের নির্দেশনা নেয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকলের কাজ শেষ হলে দলনেতা বা শিক্ষকের দায়িত্বে একটি সমন্বিত রূপ দাঁড় করানো হয় যা থেকে সমস্যার সমাধান নির্ণয় করা হয়। তবে, সমাধান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীরা নিজেরা স্থির করে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত হয়ে কর্মের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা লাভ করে। এতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ও কর্মকৌশল বিকশিত হয়। তাদের সৃজনশীল ক্ষমতাও বাড়ে। এ পদ্ধতিতে অর্জিত শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনেও কাজে লাগে। এ দিক থেকে শিক্ষা হয়ে উঠে জীবনমুখী। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অন্যের বিশেষত শিক্ষকের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে নিজস্ব ধারায় শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হয়।

- **সতীর্থ শিখন(Peer learning)**

আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সতীর্থ শিখন বা জুটিতে শিখন বা Peer Learning একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর শিখন কৌশল। এর শাব্দিক অর্থ জোড়ায় জোড়ায় শেখা। যখন স্বগোত্রীয় বা সমমনা শিক্ষার্থীদের একজন অন্যজনের জুটিবদ্ধ হয়ে শিখনে পরস্পরকে সাহায্য করে তাকে জুটিতে শিখন বলে। আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। জুটিতে শিখন সে ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ও সফল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে জুটি তৈরির সময় যদি পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সাথে অগ্রগামী শিক্ষার্থীকে মিলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটি আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এ কৌশল প্রয়োগের ফলে শ্রেণিতে পারদর্শী শিক্ষার্থী তার শিখন অবস্থা যাচাই করতে পারে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়। শ্রেণির অন্যান্য শিক্ষার্থীরা সহপাঠীর শিখনের সাথে নিজের অবস্থা তুলনা করতে পারে এবং সমদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। Peer learning essentially refers to students learning with and from each other as fellow learners without any implied authority to any individual, based on the tenet that students learn a great deal by explaining their ideas to others and by participating in activities in which they can learn from their peers.(http://www.cdtl.nus.edu.sg/success/sl13.htm)

- **ভূমিকাভিনয় (Role Play)**

প্রাচীনকাল থেকেই পাঠ্যবিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা চলে এসেছে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যেই এ পদ্ধতির উদ্ভব। অনুকরণপ্রিয় শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে থেকেই মা-বাবা, ভাই-বোন, প্রভৃতি আপনজনের কাজের অনুকরণ করে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত

আগ্রহকে শিখন শেখানোর কাজে প্রয়োগ করতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। শিশুরা স্বভাবতই নাটক শুনতে ও দেখতে ভালবাসে, নাটক করতে আরো বেশি ভালবাসে। সুতরাং শিক্ষণীয় বিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিনয় করালে তাতে আশাপ্রদ সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কল্পিত বিষয় এবং অতীত ঘটনাকে বাস্তবের মতো দৃশ্যমান করে তোলা যায় অভিনয়ের মাধ্যমে। ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির আর একটি সুবিধা হলো নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল রকম জ্ঞান হলেই অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্র রূপ বা হাবভাব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং শিক্ষার্থীরা যখন কোন বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে ও অভিনয় করে অথবা ঐ বিষয়ের ওপর রচিত নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে তখন সেই বিষয়বস্তুর ওপর তাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায়। সাহিত্য, ইতিহাসের বিষয়বস্তু অভিনয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত সার্থকভাবে শেখানো যায়। তবে ভূমিকাভিনয়ের জন্য যোগ্য পারদর্শী শিক্ষক প্রয়োজন। কারণ সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে শিখনের উদ্দেশ্য ব্যাহত এমনকি ব্যর্থ হতে পারে।

৬.৪ একক কাজ, পোস্ট বক্স ,কার্যকর দল পুনর্বিন্যাস,সমস্যা সমাধান ও সাক্ষাৎকার কৌশল অনুশীলন

- **একক কাজ(Individual work)**

কোন কাজ যখন শিক্ষার্থী একাই সম্পন্ন করে এবং কাজটির ফলাফলে তার একক মতামত প্রতিফলিত হয় তখন সেই কাজকে একক কাজ বলে। শিক্ষার্থী যখন কোন কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে কোন কাজ সম্পন্ন করে তখন সে কাজটির প্রতিটি পদক্ষেপে নিজস্ব প্রতিভা ও সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োগ ঘটায়। সে অর্থে একক কাজও এক ধরনের সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কাজ। এ ধরনের কাজে শিক্ষার্থী নিজেই সব করে, ফলে কাজের সব অংশে তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটার সুযোগ থাকে।

- **পোস্ট বক্স এক্টিভিটি (Post box activities)**

ডাক প্রেরণের মত এটি শিখনের একটি জনপ্রিয় প্রক্রিয়া। এ কৌশলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয় থাকে, পাঠদান বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় হয় এবং আনন্দঘন পরিবেশে নিজেদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে শেখার কাজটি সম্পাদন করতে পারে। এ কৌশলটি প্রয়োগের জন্য পূর্বেই নম্বর দেওয়া ৫/৬ টি বাক্স সংগ্রহ করে রাখতে হয় (যেমন-টিস্যু বক্স, ঔষধের বাক্স বা মোটা কাগজের দ্বারা তৈরি বাক্স)। শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ৫/৬ টি প্রশ্ন টুকরো কাগজে লিখে রাখবেন। কাজ শুরুর আগে দল গঠন করে নিবেন। ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখিত কাগজটি ১ নম্বর বাক্সে ফেলতে হবে। এভাবে নম্বর অনুসারে উত্তরের কাগজগুলো সব বাক্সে ফেলতে হবে। শিক্ষক ডিজিটাল ছবি ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পোস্ট বক্স দেখাবেন। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করবেন। শিক্ষক ৫/৬ টি দল গঠন করে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে পোস্ট বক্স কৌশল প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিবেন।

- **কার্যকর দল পুনর্বিন্যাস (Expert Jigsaw)**

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন বা সমস্যা সরবরাহ কর হয়। সমস্যাগুলো হবে ঐ দিনের পাঠ সংশ্লিষ্ট। একই দলের প্রশিক্ষণার্থীরা সমস্যা বা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবে ও সারাংশ তৈরি করবে। এরপর নতুন দল গঠন করা হবে, যেখানে মূল দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। নতুন দলের অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের মধ্যে পূর্বের আলোচিত বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করবে বা তথ্য প্রদান করবে। তারপর মূল দলে ফিরে যাবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করবে।

- **সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি (Problem-solving Method)**

যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সমস্যা বা অসুবিধা দূর করে তাকেই সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি বলা হয়। শিক্ষণে এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির মতই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা-সমাধান পদ্ধতিতে কোন সমস্যা বা বিষয়ের সমাধান বা অনুশীলন শিক্ষার্থীদের দিয়েই করা হয়। বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাদার্শনিক জন ডিউই প্রয়োগবাদী দর্শনের ভিত্তিতে এ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তোলা। এ ক্ষেত্রে সমস্যা-সমাধান পদ্ধতি খুবই কার্যকর হতে পারে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায়। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। যে পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যার সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করেন সেটাই সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। আর শ্রেণিকক্ষে

শিক্ষার্থীরা শিক্ষক কর্তৃক উত্থাপিত সমস্যার বাস্তবভিত্তিক সমাধান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রম কার্যকর করার জন্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করতে হয়। শিক্ষার্থীরা এ সমস্যাটির যুক্তিগ্রাহ্য সঠিক ও উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তন ও উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতার কার্যকরী বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী। এই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং জ্ঞানমূলক দক্ষতার বিকাশ সাধন হয়।

সমস্যা-সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

১. এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায়;
২. শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ায়;
৩. শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়;
৪. দলগত কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়;
৫. নিজে কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়;
৬. শিক্ষার্থীদেরকে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করে।

সমস্যা-সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা

১. আমাদের পাঠ্যসূচি বহুলাংশে তত্ত্বনির্ভর। ফলে পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়বস্তুর অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না;
২. এ পদ্ধতি বেশ সময়সাপেক্ষ। ফলে বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন অংশের পেছনেই সময় চলে যায়। সমগ্র পাঠ্যসূচি শেষ করা যায় না;
৩. বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় রাখা যায় না;
৪. যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থী ব্যর্থ হলে শিখনের প্রতি তার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

- **সাক্ষাৎকার (Interview Method)**

কোন সমস্যা সম্পর্কে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা কিংবা সরকারি, বেসরকারি তথ্য বিবরণী আশাপ্রদ সমাধানে পৌঁছাতে যথোপযুক্ত বা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত না হলে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিত্বের মতামত গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয় তাকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বলা হয়। কোন মৌলিক বিষয়ের ওপর বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য গবেষণা করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বই-পুস্তক, সরকারি, বেসরকারি তথ্য বিবরণীতে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষাস্তরে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বহুদিন ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক উচ্চস্তরে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি চালু থাকলেও মাধ্যমিক স্তরে এ পদ্ধতি তেমন প্রচলিত নয়। তবে এই পদ্ধতিটি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার গ্রহণের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারবে।

- **অণুশিক্ষণ (Micro-teaching)**

শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এটি একটি কার্যকরী কৌশল। শিক্ষক একই সাথে বহু দক্ষতা উন্নয়ন করতে সমর্থ না হলে এ প্রক্রিয়ায় একটি বা দুটি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। এ জন্য যে কোন একটি দক্ষতা নির্বাচন করে সীমিত সময়ে কৃত্রিম শ্রেণিশিক্ষণে তার অনুশীলন করবেন এবং ধীরে ধীরে তার উন্নয়ন ঘটাবেন। Micro-teaching is a teacher training and faculty development technique whereby the teacher reviews a recording of a teaching session, in order to get constructive feedback from peers and/or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching technique.(https://www.quora.com/What-is-the-importance-of-micro-teaching)

অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ

১. পাঠ প্রস্তুতি;

২. উদ্দীপনার তারতম্য;

৩. উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন;

৪. উচ্চমানের প্রশ্ন;

৫. বিভিন্নমুখী প্রশ্ন

৬. প্রশ্নকরণে স্বাচ্ছন্দময়তা;

৭. বলবৃদ্ধিকরণ;

৮. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত;

৯. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি;

১০. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি;

১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার;

১২. পরিকল্পিত পুনরুক্তি;

১৩. সংযোগের সম্পূর্ণতা সাধন;

১৪. সমাপ্তিকরণ

পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আরও ৪টি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করে। সেগুলো হলো -

১৫. শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার

১৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা

১৭. দলগত আলোচনায় উৎসাহ প্রদান

১৮. শিক্ষকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা

- **সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ(Simulation)**

বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ধারণা প্রদানের চেষ্টা করাকে ছদ্মশিক্ষণ বা সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বলে। অন্যভাবে বলা যায় সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবর্তিত এক ধরনের কার্যকরী কৌশল যার মাধ্যমে শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের আচরণিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ঘটে। সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণে শিক্ষকগণের মধ্য থেকে একজন শিক্ষকরূপে এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ শিক্ষার্থী হিসেবে অভিনয় করে থাকে। অণুশিক্ষণের সাথে এ ক্ষেত্রে যে অমিলটি পরিলক্ষিত হয় তা হলো ছদ্ম শিক্ষণে একটি ক্লাসের সম্পূর্ণটাই পরিচালনা করতে হয়, অন্যদিকে অণুশিক্ষণে শুধু একটি বা দুটি দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছদ্মশিক্ষণ কৌশলটি একটি গ্রুপে সম্পন্ন হয়। ছদ্মশিক্ষণের সমগ্র কার্যক্রমটি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণের ভূমিকা প্রত্যক্ষণ ও ভূমিকাভিনয়ের একটি প্রশিক্ষণ হিসেবে পরিগণিত হয়। পর্যবেক্ষক দল প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের সবল ও দুর্বল দিক রেকর্ড করেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কাছে তা বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্ত করেন যাতে তাঁর কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ফলাবর্তন লাভ করা যায়। ছদ্ম শিক্ষণ-এর সুবিধা ও অসুবিধা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ-এর সুবিধা

- বাস্তব অবস্থা সম্ভব না হলেও বিপরীতে কৃত্রিম পরিবেশে পাঠদান করা সম্ভব হয়।
- প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন করে।
- সরাসরি পর্যালোচনায় সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত হয়।
- জড়তা দূর হয়।

- সতীর্থ শিক্ষকগণের সরাসরি মতামত জানা যায়।
- সরাসরি মতামত জানা বলে দুর্বলতাগুলো তাৎক্ষণিক দূর করার উদ্যোগ নেওয়া যায়।
- ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় হওয়াতে প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষণ দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন বা উন্নয়ন ঘটানো যায়।
- ছদ্মশিক্ষণের অনুশীলন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

সাদৃশ্যমূলক শিক্ষণ বা ছদ্ম শিক্ষণ-এর অসুবিধা

- ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত শ্রেণির পরিবেশ সৃষ্টি হয়না।
- অনেক সময় এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল হয়না।
- সতীর্থ শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ অনেক সময় শুধু দোষ ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। ফলে অনেকেই এতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।
- অন্যদিকে সতীর্থ শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ অনেক সময় দোষ ও দুর্বলতা না বলে শুধু ভাল দিকগুলো তুলে ধরেন/ চিহ্নিত করেন। ফলে অনেকেই এতে অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. শিখন-শেখানো পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

খ. শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি কী?

গ. শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি কী?

ঘ. থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন শিখন মতবাদ কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ক.শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

খ. শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

২. ক.শ্রেণিকক্ষে কণ্ঠস্বর ব্যবহার ও অনুশীলনের সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ করুন।

খ. শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলো বর্ণনা করুন। শ্রেণিতে এ পদ্ধতিগুলো কীভাবে প্রয়োগ করা যায়?

ইউনিট ৭ : পাঠ পরিকল্পনা

পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পরিকল্পনাবিহীনভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের শিখন দুর্বল ও কার্যক্রমটি অকার্যকর হতে পারে। এই শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হচ্ছে পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা, বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশল, শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল, শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণ, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য অগ্রগামী সংগঠকের ব্যবহার। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে এই ইউনিটকে নিম্নোক্ত সাব ইউনিটে সাজানো হলো:

৭.১ উত্তম ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো শনাক্তকরণ ও অনুশীলন;
৭.২ প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী ও পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৭.৩ অণুশিক্ষণ ও ছদ্ম শিক্ষণের মাধ্যমে একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ, অভিনয়, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন;
৭.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অনুসন্ধান এবং শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশল অনুশীলন: সুস্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা, লিখিত ও মৌখিক;
৭.৫ শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ: ধারণা ও অনুশীলন এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল;
৭.৬ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন: উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন;
৭.৭ বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাস;
৭.৮ ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন বিবেচনা;
৭.৯শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণের উপায় এবং মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল;
৭.১০অসবেল-এর অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায়।

৭.১ উত্তম ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো শনাক্তকরণ ও অনুশীলন

আমরা যে কোন কাজ শুরু করার আগেই চিন্তা করি কাজটা কীভাবে বা কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করব। কাজটা কেন করব, কী কী উপকরণ দরকার হবে, কীভাবে কাজটিকে ভাগ করব, এর সমাপ্তিই বা কীভাবে করব তা নিয়ে ভাবতে থাকি। এই চিন্তা-ভাবনাই হচ্ছে কাজ সম্পাদনের মানসিক পরিকল্পনা। শিখন-শেখানো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজ। শিখন-শেখানো কাজের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে ফলপ্রসূভাবে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করার মধ্যেই শিক্ষকের সার্থকতা। একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কী শেখা প্রয়োজন এবং কীভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কার্যকরভাবে শেখানো যাবে তার রোড ম্যাপই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা। অর্থাৎ যথাযথভাবে একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারা শিক্ষকের একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা এবং এটি একটি শিক্ষক যোগ্যতা।

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা

শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি পাঠে কী শেখাবেন, কত সময়ের মধ্যে শেখাবেন, কতটুকু শেখাবেন, কেন বা কী উদ্দেশ্যে শেখাবেন, কিসের সাহায্যে শেখাবেন,কী কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন, শ্রেণিতে তাঁর করণীয় কাজ কী কী হবে,শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠে অংশগ্রহণ করবে বা সাড়া প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় পূর্বে ঠিক করে নেওয়াকে পাঠ পরিকল্পনা বলে ।

অন্য কথায়, সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কোন পাঠের বিষয়বস্তু অর্জন করানোর জন্য শিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রণীত কার্যকর পরিকল্পনাই হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা।

সহজ কথায় বলা যায় দৈনন্দিন কোন পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে পূর্ব প্রস্তুতি বা চিন্তা তার লিখিত রূপকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা। কেউ কেউ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত বিস্তারিত লিখিত রূপকে পাঠটিকা বলে থাকেন। পাঠটিকা শব্দটি সীমিত অর্থ প্রকাশ করে তাই পাঠটিকা না বলে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত পাঠ পরিকল্পনা শব্দটিই আমরা ব্যবহার করব।

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা

কোন স্থাপনা তৈরির জন্য প্রকৌশলীর যেমন লিখিত নকসা থাকে, শিক্ষকের হাতে তেমন লিখিত পাঠ পরিকল্পনা কার্যকরভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার চাবিস্বরূপ। শিখনকে উদ্দেশ্যমুখী করার জন্য পাঠ পরিকল্পনার উপযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হয়;
- পাঠের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়;
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট থাকা যায়;
- উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা নির্বাচন করা যায়;
- উপযুক্ত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা যায়;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণে সচেতন হওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করানো সম্ভব হয়;
- সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে সহায়ক হয়;
- শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতি লাভ হয়;
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ,মনোযোগ ও প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষক সচেতন হয়;
- পরবর্তী পাঠের কার্যকর শিক্ষণে সহায়ক হয়;
- নতুন শিক্ষক সঠিক দিক নির্দেশনা পায়;
- শিক্ষাক্রমকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়;
- নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি

একজন শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজে কীভাবে অগ্রসর হবেন , কীভাবে পাঠের ধারাবাহিতকা বজায় রাখবেন পাঠ পরিকল্পনা সেই নির্দেশনা প্রদান করে। কোন কোন শিক্ষক আছেন , যাঁরা গতানুগতিকভাবে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করেন। তাঁরা পাঠ সম্পর্কে কোন পূর্ব চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এ সম্পর্কে পূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও ছিল না। পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ যোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (Johann Friedrich Herbart) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হার্বাটের মতে, আজকের শিক্ষার্থী এক সময়ের শিশু। জন্মের সময় শিশুর মন থাকে শূন্য, একেবারে মোছা স্লেটের মত। প্রকৃতি ও সমাজের সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তার মানসিক বিকাশ ঘটে। তাঁর মতে, শিশুর এই অভিজ্ঞতাকে অর্জনে সহায়তা করে দুই ধরনের প্রক্রিয়া।

চিত্র ৬: যোহান ফ্রেডরিক হার্বার্ট (Johann Friedrich Herbart)
জন্ম তারিখ ও স্থান: ৪ মে ১৯৭৬, ওল্ডেনবার্গ, জার্মানি
মৃত্যুর তারিখ ও স্থান: ১৪ আগস্ট ১৮৪১, গোটিগেন, জার্মানি

ক. প্রত্যক্ষণ: পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা
খ. আত্মীকরণ: উপলব্ধিকে আয়ত্ত করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করার ক্ষমতা।

তিনি বলেছেন, শিশু সব সময় তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। তার মতে, শিক্ষার্থীকে তার পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় করাতে হবে। জানা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করে নতুন বিষয়ের অবতারণা করলে পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তাই নতুন পাঠ শুরুর আগে শিক্ষককে কৌশলে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে নতুন জ্ঞানের সূচনা করতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করা সহজ হবে। এজন্য শিক্ষার্থীকে নতুন কিছু শেখানোর আগে শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা জেনে নেওয়া।

পাঠ পরিকল্পনায় হার্বাটের চার সোপান

হার্বাটের মতে, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে চারটি স্তর বা সোপান প্রয়োজন। এগুলো হল:

প্রথম স্তর:পূর্বজ্ঞানের সুস্পষ্টতা
এখানে সুস্পষ্টতা বলতে তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ শ্রেণিতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর চারপাশের নানা বিষয়ের মধ্যে যা সম্পর্কে তার পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে, সে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে তাকে নতুন জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর এই জ্ঞানের স্তর সম্পর্কে জানতে হবে। এটাই পূর্বজ্ঞানের সুস্পষ্টতা।

দ্বিতীয় স্তর:নতুন তথ্যের সংযোজন
শিক্ষার্থীকে শিক্ষক যে নতুন জ্ঞান বা তথ্য বা অভিজ্ঞতা জানাতে চান তা জানাতে হলে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে শিখন অভিজ্ঞতার সংযোগ সাধন করতে হবে।

তৃতীয় স্তর:শ্রেণিকরণ/ সামান্যীকরণ
শিক্ষক দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান, তথ্য ও অভিজ্ঞতাগুলো সংহত, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থী দ্বিতীয় স্তরে লব্ধ জ্ঞান ও তথ্যগুলো পূর্বজ্ঞানের তথ্য ও অভিজ্ঞতার সাথে শ্রেণিকরণ করে সামান্যীকরণে পৌঁছাবে।

চতুর্থ স্তর:প্রয়োগ
এই স্তরে শিক্ষার্থী নব লব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে। এভাবেই শিখন কার্যকর হবে।

হার্বাটের পঞ্চ সোপান

হার্বাটের চারটি সোপান অনুসরণ করতে গিয়ে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় তাঁর অনুগামী জিলার, রেন প্রমুখ শিক্ষাবিদ হার্বাটের এই চারটি স্তরের কিছু পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর শিখনের পাঁচটি সোপানের প্রস্তাব করেন। তা হল-

১. আয়োজন বা প্রস্তুতি
২. উপস্থাপন
৩. তুলনা বা বিমূর্তকরণ
৪. সামান্যীকরণ
৫. অভিযোজন বা প্রয়োগ

হার্বাটের ত্রি সোপান

পরবর্তীকালে হার্বাটের অনুগামী রেন ও জিলার এই পঞ্চ সোপান নীতির আরও একবার সংস্কার করেন। এই নতুন সংস্করণে তিনটি সোপান রাখা হয়। তা হল-

১. আয়োজন বা প্রস্তুতি
২. উপস্থাপন
৩. প্রয়োগ

এখানে পঞ্চ সোপানের উপস্থাপন সোপানের সাথে তুলনা বা বিমূর্তকরণ এবং সামান্যীকরণকে একীভূত করা হয়েছে।

গ্লাভার পরিকল্পনা

বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠের ধরন অনুযায়ী হার্বার্টের পঞ্চ সোপান বা ত্রি-সোপানের চেয়ে অধিকতর উপযোগী পরিকল্পনা হচ্ছে গ্লাভার পরিকল্পনা। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষণে যখন পরীক্ষাগার পদ্ধতি, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রকল্প পদ্ধতি, অনুসন্ধানমূলক কাজ প্রয়োগ করা হয়, তখন গ্লাভার পরিকল্পনা ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এই পরিকল্পনায় চারটি স্তর থাকে।

১. **প্রশ্নকরণ:** পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহ ধারাবাহিকভাবে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহী করে পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচয় ঘটাতে হয়। শুরুতে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের মাধ্যমে শুরু করে পাঠের বিষয়বস্তু এগিয়ে নিতে হবে। আবার কোন চিত্র, ছবি, ভিডিও , চার্ট, মডেল ইত্যাদি উপকরণ দিয়েও পাঠ শুরু করা যেতে পারে। কোন গল্প বা কেইস এর বিবরণ দিয়েও পাঠ শুরু হতে পারে। তবে সূচনা হবে সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দীপনামূলক।

২. **আলোচনা:** শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণা, জ্ঞান ও মতামতকে স্বাধীনভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অসুবিধাসমূহ দূরীভূত হবে।

৩. **অনুসন্ধান:**এই স্তরে পাঠের বিষয়বস্তুর ওপর একক বা জোড়ায় বা দলগতভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করে বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরীতে কাজ করে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রকল্প সম্পন্ন করতে হবে।

৪. **প্রকাশ বা বর্ণনা:** শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কীভাবে নিজেদের মধ্যে তথ্য বা ধারণা বা ভাব বিনিময় করবে তার সাথে প্রকাশ বা বর্ণনা সম্পর্কিত। প্রকাশ বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। যেমন- পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণ (নিষ্ক্রিয় ধরনের প্রকাশ), হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে প্রকাশ (সক্রিয়ভাবে প্রকাশ), শিখন পরিবেশের বিন্যাস (সাংগঠনিক প্রকাশ), শৈল্পিক প্রকাশ ইত্যাদি।

উত্তম পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

- পাঠ পরিকল্পনা লিখিত আকারে হওয়া উচিত;
- শিক্ষকের নিকট শিখন উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হতে হবে;
- ভাষা সহজ এবং বোধগম্য হবে;
- বিষয়বস্তুর পদ্ধতি মাফিক উপস্থাপনা থাকতে হবে;
- ধারাবাহিক এবং যথাযথ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে। যাতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারে;
- এটি শিক্ষককে অনুপ্রেরণামূলক কৌশল ও শিক্ষণ উপকরণ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে;
- এটি বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কার্যক্রম এবং শিক্ষণ উপকরণের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করবে;
- পাঠের বিষয়বস্তু একটি যৌক্তিক অনুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুযায়ী হতে হবে;
- পাঠ পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপে শিক্ষার্থীদের অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- মূল্যায়নের কার্যকর এবং বাস্তবিক কৌশল ব্যবহার করা হয়;
- সহজলভ্য এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণ উপকরণ নির্বাচন করা হয়;
- শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষকের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়ার সুযোগ না পায় পাঠ পরিকল্পনায় এমন ব্যবস্থা রাখা হয়;
- পাঠ পরিকল্পনা পিরিয়ডের নির্ধারিত সময়ের সাথে সংগতি রেখে প্রণীত হবে;
- পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান আহরণের পরিবেশ তৈরির সুযোগ থাকতে হবে;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ বর্ধনের পাশাপাশি পশ্চাৎপদ শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নেওয়ার উপযোগী কাজ ও সুচিন্তিত ব্যবস্থা থাকতে হবে;
- পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত

- শিক্ষাক্রম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে;
- শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে;
- বিষয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা থাকতে হবে;
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও এগুলোর প্রয়োগ জানতে হবে;
- শিক্ষা উপকরণের উৎস ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে;
- মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে;
- সময় বরাদ্দকরণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

উত্তম ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ

পরিচিতি : এখানে দুই ধরনের পরিচিতি থাকে । একটি হচ্ছে সাধারণ পরিচিতি ও অন্যটি পাঠ সংক্রান্ত পরিচিতি। সাধারণ পরিচিতি অংশে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি থাকে। পাঠ পরিচিতিতে বিষয়ের নাম, পাঠের শিরোনাম, পিরিয়ড, পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ইত্যাদি থাকে। পরিচিতি পর্ব থেকে পটভূমি জানা যায়। পরিচিতি অংশ থেকে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স, শিখন চাহিদা,পাঠের জন্য বরাদ্দকৃত সময়, শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষার্থীদের জেন্ডারগত অবস্থা ও পাঠের শিরোনাম জানা যায়। ফলে শিখনের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা করা সহজ হয়।

শিখনফল : আজকের পাঠের বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান অর্জন করবে বা কী দক্ষতা অর্জন করবে বা দৃষ্টিভঙ্গির কী ধরনের পরিবর্তন ঘটবে তা এখানে উল্লেখ থাকে। শিখনফলই হচ্ছে শিখন প্রক্রিয়ার মূলভিত্তি। যদি শিখনফল জানা না থাকে তাহলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী ও আন্তরিক রাখতে ব্যর্থ হবেন। শিখন-শিখানো কার্যক্রম, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই ইত্যাদি শিখনফলের ওপর নির্ভর করে করা হয়।

প্রস্তুতি : মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পূর্বে শিক্ষক পাঠদানের পরিবেশ তৈরির জন্য কিছু কাজ করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বেই শিক্ষক সংশ্লিষ্ট পুস্তকাদি পড়বেন, শিখন-শেখানো সামগ্রী সংগ্রহ করবেন ও পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পাঠের বিষয়বস্তু এই তিনটির সংযোগ সাধনের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কী কাজ করবেন তা এখানে উল্লেখ করবেন। এই পর্বে শিক্ষক বাড়ির কাজও আদায় করবেন (যদি দেওয়া থাকে)।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি : এটিই পাঠ পরিকল্পনা প্রধান অংশ। এখানেই পাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রক্রিয়া এখানে লেখা থাকবে। যে সকল কার্যক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থী করবেন তারই লিখিত রূপ এটা। এ পর্বে সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, বিশেষ উদাহরণ থেকে সাধারণ উদাহরণ-এ ধারা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিখনফলের চাহিদা মোতাবেক বিষয়বস্তুকে খন্ডাংশে বিভক্ত করে ভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী : শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জনের উদ্দেশ্যে যে কাজগুলো করবে তার জন্য কোন উপকরণ বা কোন সামগ্রী প্রয়োজন হলে সে সবের তালিকা তৈরি করতে হবে। উপকরণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য দরকার। এর সাহায্যে শিক্ষণ ও শিখন উভয়টি ফলপ্রসূ করা যায়। পাঠকে প্রাণবন্ত ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তাদের কাজে নিয়োজিত রাখার জন্য সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন-শেখানো সামগ্রী শিক্ষককে বাছাই ও সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে উপকরণ নির্বাচন করা অতীব জরুরি।

প্রয়োগ বা মূল্যায়ন : পাঠের কার্যকারিতা এ পর্বের সফলতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। এতে শিখনফল অর্জনের মাত্রা নিরূপণের ব্যবস্থা থাকে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থী আসলে কী শিখেছে, শিক্ষার্থীদের শিখনের জটিলতা বা সমস্যা কী তা নিরূপণ এবং শিখন সম্পর্কিত ফলাবর্ত সংগ্রহ করা । মূল্যায়নের ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তী পাঠ পরিকল্পনার জন্য তথ্য পাওয়া যায়।

আবার পাঠ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী প্রয়োগ করতে পারবে কিনা তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক বাড়ির কাজ দেন। এখানে তিনি কী কাজ দেবেন শুধু সেটি লিখতে হবে।

উপরের বিষয়বস্তু থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করে শিক্ষক কর্তৃক সরবরাহকৃত শিখন সামগ্রী হিসেবে একটি পাঠ পরিকল্পনা ও নিচে দেওয়া ছক অনুসরণ করে প্রশিক্ষণার্থীরা/পাঠে অংশগ্রহণকারীরা পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ শনাক্ত করবেন এবং তা অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

একটি পাঠ পরিকল্পনা ছক

<table>
<tr><td rowspan="1">পরিচিতি</td><td colspan="2">বিদ্যালয়ের নাম :
প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম:
রোল নম্বর-
জেন্ডার:
শ্রেণি : নবম
উপস্থিত শিক্ষার্থী : মোট - জন।
বালক- জন, বালিকা - জন
শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:</td><td colspan="2">বিষয় :
সাধারণ পাঠ :
আজকের পাঠ :
সময় :
পিরিয়ড :
তারিখ :</td></tr>
<tr><td>শিখন ফল</td><td colspan="4">এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা -
•
•</td></tr>
<tr><td>সোপান</td><td>কাজ ও সময়</td><td>শিক্ষকের কাজ</td><td>শিক্ষার্থীর কাজ</td><td>শিক্ষা উপকরণ</td></tr>
<tr><td>প্রস্তুতি</td><td>শুভেচ্ছা বিনিময় ও বাড়ির কাজ আদায়

মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>শিখন-শেখানো কার্যাবলি/ উপস্থাপন</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>মূল্যায়ন</td><td>শিখন যাচাইমূলক প্রশ্ন

বাড়ির কাজ প্রদান</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

বাংলা বিষয়ের একটি পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম : প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম: রোল নম্বর- জেন্ডার: শ্রেণি :ষষ্ঠ মোট শিক্ষার্থী: ৬০ উপস্থিত শিক্ষার্থী : মোট - ৫০ জন। বালক- ৩০ জন, বালিকা - ২০ জন শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:	বিষয় : বাংলা সাধারণ পাঠ : বাংলা কবিতা আজকের পাঠ : জন্মভূমি সময় : ৫০ মিনিট পিরিয়ড : ২য় তারিখ : ------
শিখন ফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা - ● কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে। ● 'জন্মভূমি' কবিতাটি শুদ্ধভাবে আবৃত্তি করতে পারবে। ● সার্থক, জনম, মুদব, ধনরতন প্রভৃতি শব্দের অর্থ বলতে পারবে ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাতে পারবে। ● কবির শেষ ইচ্ছা কী তা বর্ণনা করতে পারবে। ● কবিতায় জন্মভূমিকে রানি সম্বোধন করার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	

সোপান	কাজ ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
প্রস্তুতি	মনোযোগ আকর্ষণ ও পাঠ ঘোষণা ৪ মি.	● কুশল বিনিময় ও বাড়ির কাজ আদায় ● প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে এমন একটি পোস্টার বা হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণার মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবো এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম লিখব- **জন্মভূমি** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শিক্ষার্থীরা দেখবে, শুনবে ও সম্ভাব্য উত্তর প্রদান করবে নিজ নিজ খাতায় পাঠ শিরোনাম লিখে নিবে	প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে এমন একটি পোস্টার বা হাতে আঁকা ছবি/ চিত্র
শিখন-শেখানো কার্যাবলি/ উপস্থাপন	কবি পরিচিতি (মাইন্ডম্যাপিং) ৪ মি.	কবির ছবি প্রদর্শন করব। শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ সহকারে বই থেকে কবি পরিচিতি পড়ে একটি করে তথ্য উল্লেখ করতে বলব (দ্বিরুক্তি না করে)। তাদের উল্লিখিত তথ্য আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় রেখে মাইন্ডম্যাপ আকারে সাথে সাথে বোর্ডে লিখব ও শিক্ষার্থীদেরকে খাতায় লিখে নিতে বলব। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুল্লিখিত থাকলে তা উল্লেখ করে বোর্ডে লিখে দিব।	মনোযোগ সহকারে বই পড়বে ও যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে একটি তথ্য বলবে । শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে বোর্ডে লিখিত তথ্য খাতায় লিখে নিবে।	কবির ছবি চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড/ পোস্টার পেপার
	আদর্শ পাঠ (আবৃত্তি) ৪ মি.	এক স্থানে দাঁড়িয়ে কবিতার নির্বাচিত অংশ সুন্দর করে (গতিভঙ্গি, উচ্চারণ, তাল,লয় ঠিক রেখে) আবৃত্তি করব।	পাঠ্যবই অনুসরণ করে আবৃত্তি শুনবে	অডিও, ভিডিও
	সরব পাঠ ও উচ্চারণ সংশোধন (আবৃত্তি)	নির্বাচিত ৩/৪ জন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে (পাঠের একেকটি অংশ একেক জন শিক্ষার্থী) পুরো পাঠ একবার সরবে পড়তে বলব। ওয়ার্ড কার্ড দেখিয়ে বা মৌখিকভাবে ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের	নির্বাচিত ৩/৪ জন শিক্ষার্থী সরব পাঠ করবে। সকল শিক্ষার্থী পাঠক শিক্ষার্থীকে অনুসরণ করবে। ত্রুটিযুক্ত উচ্চারণ নোট করবে ও	ওয়ার্ড কার্ড ও চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড

সোপান	কাজ ও সময়	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ	উপকরণ
	৫ মি.	পাঠের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দিব। সম্ভাব্য শব্দ: আলো, গগন, জন্মভূমি, মুদব ইত্যাদি।	উল্লেখ করবে। সংশোধিত উচ্চারণ মনযোগ সহকারে শুনবে, মিলিয়ে নিবে ও নিজে সংশোধিত হবে।	
শিখন-শেখানো কার্যাবলি/ উপস্থাপন	শব্দার্থ ও বাক্যগঠন (চকবোর্ড সারসংক্ষপ ও জোড়ায় কাজ) ৪ মি.	কে, কোন শব্দের অর্থ জানে না-তা শিক্ষার্থীদেরকে উল্লেখ করতে বলব এবং বোর্ডের বাম পাশে নিচে নিচে লিখব। জোড়ায় চিন্তা করে অর্থ লিখতে ও বাক্য তৈরি করতে বলব। সম্ভাব্য শব্দসমূহ- নয়ন, গগন, মুদব, ধনরতন ইত্যাদি। জোড়ায় কাজের উত্তর শুনব এবং তাদের উত্তর সংশ্লিষ্ট শব্দের পাশে লিখব এবং ভুল উত্তর সংশোধন করে দিব।	এককভাবে উত্তর দিবে। জোড়ায় চিন্তা বিনিময়ের মাধ্যমে শব্দের অর্থ লিখবে ও বাক্যে প্রয়োগ করবে। জোড়ার একজন উত্তর প্রদান করবে ও শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে সকলে তা সংশোধন করে লিখে নিবে।	
	পাঠ বিশ্লেষণ ২০ মি.	১.সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় পাঠ বিশ্লেষণ করে দিব। ২.দলীয় কাজ: (ক) প্রতি ৫/৬ জন করে দল গঠন করে দলের নাম, দলনেতা,লেখক, উপস্থাপক, পর্যবেক্ষক নির্বাচন করে একীভূত শিখন নিশ্চিত করে নিচের উদ্দীপকের আলোকে দলীয় কাজ লিখতে দিব- 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা; তাহার মাঝে আছে দেশ এক-সকল দেশের সেরা; ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা; এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে- আমার জন্মভূমি।' * উল্লিখিত চরণগুলো তে 'জন্মভূমি' কবিতার কোন দিকটির মিল লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর। (খ) শ্রেণির কাজ পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করব। (গ) দলের পক্ষে ১ জনকে উপস্থাপন করতে বলব, পাশাপাশি পোস্টারে/ মৌখিকভাবে ফলাবর্তন প্রদান করব।	বক্তৃতা শুনবে ও প্রয়োজনে প্রশ্ন করবে। দল গঠনে সহায়তা করবে। দলের জন্য নির্দেশিত সমস্যাটি মাথা খাটিয়ে সম্ভাব্য সমাধান খাতায়/ পোস্টারে লিখবে। দলের পক্ষে একজন উপস্থাপন করবে ও শিক্ষকের ফলাবর্তনের সাথে মিলিয়ে নিবে ও সংশোধন করবে।	পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র
মূল্যায়ন	শিখন যাচাইমূলক প্রশ্ন (লিখিত/ মৌখিক) ৫মি.	আজকের পাঠের শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করব- ● কবির অঙ্গ জুড়ায় কিসে? ● কবির শেষ ইচ্ছা কী? ● কবির মন আকুল হয় কিসে? ● 'মুদব নয়ন শেষে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?	প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে।	মূল্যায়নপত্র
	বাড়ির কাজ প্রদান ৩ মি.	বাড়ির কাজ বোর্ডে/ চার্টে লিখে দিব। কাজ: 'জন্মভূমি' কবিতায় জন্মভূমিকে রানি সম্বোধন করার যৌক্তিক কারণ খাতায় লিখে আনবে।	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় বাড়ির কাজ লিখে নিবে।	চার্ট/ চকবোর্ড/ পোস্টার পেপার
	পাঠ সমাপ্তি	উপকরণ গুছিয়ে বোর্ড মুছে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ঘণ্টা বাজার পর শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।	শিক্ষার্থীরা সম্মান জানাবে।	

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের একটি পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

পাঠ নং -----

বিদ্যালয়ের নাম: **শিক্ষকের নাম:** **রোল নম্বর- :** **শিক্ষাবর্ষ- :** **উপস্থিত শিক্ষার্থী ------- অনুপস্থিত শিক্ষার্থী---------**	**শ্রেণি: নবম** **বিষয়: ব্যবসায় উদ্যোগ** **অধ্যায় ১: ব্যবসায় পরিচিতি** **আজকের পাঠ: ব্যবসায় পরিবেশ,** **সময়: ৫০ মি.তারিখ:**

শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

১. ব্যবসায় পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. ব্যবসায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর নাম বলতে পারবে।
৩. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ধাপ	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীদের কাজ	পদ্ধতি ও কৌশল	শিক্ষাউপকরণ	সময় বন্টন
প্রস্তুতি	প্রথমেই শুভেচ্ছা বিনিময় করব। মনোযোগ যাচাই এবং আজকের পাঠের প্রতি আকর্ষণের জন্য সকলের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করব- ● পরিবেশ বলতে তোমরা কী বুঝ? ● পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী? প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিব।**"ব্যবসায় পরিবেশ"**	শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছার জবাব দেবে এবং প্রশ্নগুলোর নিম্নোক্ত সম্ভাব্য উত্তর দিবে- ● আমাদের চারিপাশে যা কিছু আছে তাই পরিবেশ। ● পরিবেশের উপাদানগুলো হল মানুষ,গাছ-পালা, নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ● শিক্ষার্থীরা খাতায় বা নোটবুকে শিরোনাম তুলে নিবে।	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর		০৭ মিনিট
উপস্থাপন	● ব্যবসায় পরিবেশ সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদের কোন ধারণা আছে কি না জিজ্ঞাসা করব। ● শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করব। ● নিজের তৈরি পরিবেশের উপাদানের একটি চার্ট প্রদর্শন করব এবং শিক্ষার্থীদের মতামতের সাথে মিলিয়ে নিব।	● শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নাম বলবে এবং তাদের একজন এসে বোর্ডে সেগুলো লিখবে। ● শিক্ষার্থীরা তাদের প্রদত্ত মতামতের সাথে চার্টের উপাদানগুলো মিলিয়ে নিবে।	আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর প্রদর্শন	উপাদানের চার্ট	১০ মিনিট
	● প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও মতামত জানতে চাইব এবং	● শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা ও মতামত দিবে	আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর		১০ মিনিট

	ধারণা স্পষ্ট করব	এবং শিক্ষক প্রদত্ত ধারণা খাতায় তুলে নিবে।			
	• শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৮ জন করে এক একটি দল গঠন করব। • প্রদত্ত দলগুলোকে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তাদের নিজেদের এলাকায় বিরাজমান ব্যবসায় সহায়ক প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো লিখতে বলব। • শিক্ষার্থীদেরকে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে আহবান করব। • শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত মতামত মূল্যায়ন করে ফিডব্যাক প্রদান করব।	• শিক্ষার্থীরা দলীয়ভিত্তিতে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম লিখবে। • প্রতিদল থেকে একজন এসে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।	দলীয় কাজ ও উপস্থাপন	পোস্টার পেপার প্রদর্শন	১২ মিনিট
মূ ল্যা য় ন	• সমগ্র পাঠের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করব ➢ ব্যবসায় পরিবেশের উপাদান কয়টি ও কী কী? ➢ নদী ক্োন ধরনের পরিবেশের উপাদান? ➢ ব্যাকিং প্রতিষ্ঠান ক্োন ধরনের পরিবেশের উপাদান? ➢ জনসংখ্যা কোন্ ধরনের পরিবেবেশের উপাদান? ➢ আবহাওয়া কোন্ ধরনের পরিবেবেশের উপাদান?	• শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিতরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।	প্রশ্ন-উত্তর		০৮ মিনিট
	বাড়ির কাজ প্রদান: • আগামী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নিম্নোক্ত বাড়ির কাজ দিব **তুমি যে এলাকায় বসবাস করো সে এলাকার অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যবসায়ের জন্য কতটা অনুকূল বা প্রতিকূল চিহ্নিত করা।**	• শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ খাতায় তুলে নিবে			৩ মিনিট
পাঠ সমাপ্তি	• সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী ক্লাসে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার আহবান জানিয়ে বিদায় নিব।	• শিক্ষার্থীরা দাড়িয়ে বিদায় সম্মান জানাবে			

এনসিটিবি ও সেসিপ কর্তৃক প্রণীত ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি পাঠ পরিকল্পনার নমুনা
দ্বিতীয় অধ্যায় : মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

পাঠ: বার্ষিক গতি ও বার্ষিক গতির ফল **সময় : ৫০ মিনিট**

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ● **বিভাজিত শিখন ফল:** ১। বার্ষিক গতির ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।	**পাঠ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন: ১২ মিনিট** ক) কত দিনে বছর হয়? খ) কিসের ভিত্তিতে বছর গণনা করা হয়? উত্তরের সূত্র ধরে তার দিয়ে কক্ষপথ ও বল দ্বারা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের মডেল কয়েক জন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ব্যবহার করে বার্ষিক গতির ধারণা প্রদান **জোড়ায় কাজ:** প্রত্যেক জোড়া বার্ষিক গতির ধারণা খাতায় লিখবে।	সঠিক উত্তর লিখিত পোস্টার প্রদর্শন করে সামনে-পিছনের জোড়ার মধ্যে কাজ বিনিময়রে মাধ্যমে বার্ষিক গতির ধারণার সঠিকতা যাচাই ও সংশোধন	● তার ও বল দ্বারা তৈরি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের মডেল ● চকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ড ● দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র সম্বলিত কর্মপত্র, পোস্টার পেপার/ খাতা ও মার্কার বা কলম
২। অধিবর্ষ বিশ্লেষণ করতে পারবে।	**প্রশ্নোত্তর: ০৮ মিনিট** ক) ফেব্রুয়ারি মাস কত দিনে হয়? খ) ফেব্রুয়ারি মাসের দিনে সংখ্যা বাড়া বা কমার কারণ কী? উত্তরের সূত্র ধরে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিবর্ষ ব্যাখ্যা করা।	চিন্তামূলক কাজ/প্রশ্ন: ১৫০০ সাল কি অধিবর্ষ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।	
৩। বার্ষিক গতির ফলাফল উল্লেখ করতে পারবে।	**প্রশ্নোত্তর: ১০ মিনিট** ক) সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ বৃত্তাকার না উপবৃত্তাকার? খ) উপবৃত্তাকার কক্ষপথ থাকার ফলে কী কী ঘটে? উত্তর আদায়ের পর শিক্ষার্থীগণ মডেল থেকে বার্ষিক গতির দুইটি ফলাফল উল্লেখ করবে। সঠিক উত্তর প্রদানে সহায়তা করা।		
৪। দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।	**প্রদর্শন ও দলগত কাজ: ২০ মিনিট** পৃথিবীর পরিক্রমণ পথের বিশেষ চারটি অবস্থানের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে শিক্ষার্থীদের দেখানো। **জোড়ায় কাজ:** প্রত্যেক দল দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে তা মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। **দলগত কাজ:** প্রত্যেক দলকে একটি করে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র সম্বলিত কর্মপত্র প্রদান। চিত্র অনুযায়ী কর্মপত্রে প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে উপস্থাপন । 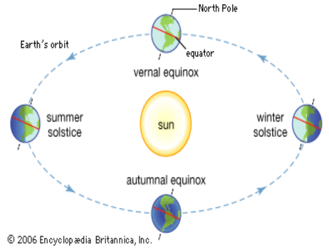 পৃথিবীর প্রত্যেকটি অবস্থানের জন্য: ১. পৃথিবীর এরূপ অবস্থানের তারিখ কত? ২. দিন-রাতের তারতম্যের ধরন কেমন? ৩. দুই মেরুর পারস্পরিক অবস্থান কীরূপ? ৪. দিন-রাতের দৈর্ঘ্য কত ঘণ্টা? ৫. প্রতিটি তারিখকে কী নামে অভিহিত করা হয় এবং কেন?	দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রতিটি কারণের সঠিকতা যাচাই ও সংশোধন ● দলীয় কাজের উপস্থাপন পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা সংযুক্ত করে সংশোধন।	
পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:	শিক্ষকের আত্ম প্রতিফলন: তারিখ:		

৭.২ প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী ও পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিক্ষার্থীর শিখনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য যে সকল উপাদান কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিখন-শেখানো কাজের ধারাবাহিকতা ও ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস। শিখন-শেখানো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে স্বাভাবিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া বজায় রেখে পাঠে অগ্রসর হওয়া এবং শিক্ষার্থীর শিখন উপযোগী পরিবেশ বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়। শিক্ষণ এবং শিখন এই উভয় কাজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষককে প্রতিটি কাজের পরিসর ও সীমা নির্ধারণ করতে হয়। এছাড়া প্রতিটি কাজের জন্য সময় নির্ধারণ,কাজসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কাজের ক্রম তালিকা প্রণয়ন,সমগ্র কাজটিকে ছোট ছোট পর্বে বিভক্তকরণ এবং প্রতিটি কাজের বিন্যাস করতে হয়।

পাঠ পরিকল্পনার পর্ব ও পর্বভিত্তিক বিভিন্ন কার্যাবলি

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণিকক্ষের প্রতিদিনের কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠে জাতির ভবিষ্যৎ। শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রমই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠদানের ওপর শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষের একটি পাঠকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কেননা, একটি বিষয়ের ও একটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম সারাদেশে একই সাথে চলে। একটি পাঠ তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী পাঠের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে, একইভাবে একটি শ্রেণির সাথে অন্য শ্রেণির একই বিষয়ের বা ভিন্ন বিষয়ের মধ্যেও যোগসূত্র থাকে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর চিন্তন, অনুভূতি বা দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। কাজেই একটি পাঠের শিখনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিখন ভাবলে ভুল হবে। এর সাথে অন্য পাঠ, অন্য বিষয় ও অন্য শ্রেণির যোগসূত্র আছে। শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে এসকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হয়। শিখন উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ছোট ছোট পর্বে ভাগ করে প্রতিটি পর্বের কাজ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হয়। শিখন উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষককে নানাবিধ কাজ করতে হয়। এসকল কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই, নতুন পাঠের প্রতি মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি, নতুন তথ্যের সাথে পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় , শেখানোর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ , প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী বা উপকরণ ব্যবহার , মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি , শিখন অগ্রগতি যাচাই, প্রতিবন্ধকতা দূর, নতুন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ পরিস্থিতি সৃষ্টি, প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই , নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল কাজের প্রতিটিই শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয়। এ কাজগুলোর ধারাবাহিক ও যৌক্তিক বিন্যাসের ওপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থীরদের কার্যকর শিখন। প্রতিটি কাজকে ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পর্বভূক্ত করা জরুরি। প্রত্যেক পর্বই শিখন উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হবে। পরিকল্পনাবিহীন ও এলোমেলো শিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্য অর্জনে মোটেও সহায়ক নয়। এজন্যই প্রতিটি পর্ব ধারবাহিকভাবে ও সুনির্দিষ্ট সীমা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালনা করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি কাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য প্রকৃতি ও শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজগুলো পর্বভূক্ত করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ

একটি পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে অনেক ধরনের তথ্য সংযুক্ত করতে হয়। যেমন-

- পরিচিতি
- শিরোনাম: পাঠের বিষয়বস্তুর নাম।
- শ্রেণি: যে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- সময় : সমগ্র শিখন-শেখানে কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বমোট সময় এবং প্রতিটি পর্বের জন্য বরাদ্দকৃত সময়।
- রূপরেখা: বিষয়বস্তু ও বিষয়বস্তু শিখনে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা এবং পরবর্তী অর্জন।
- শিখন উদ্দেশ্য: বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
- উপকরণ : শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে কার্যকর করার জন্য বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের উপাদান।
- বিভিন্ন পর্ব ও পর্বভূক্ত কার্যাবলি : পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই, বিষয়বস্তু উপস্থাপন, মূল্যায়ন, প্রয়োগ ইত্যাদি শিখন শেখানো সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ।
- সূত্র : বিষয়বস্তু, ধারণা, কোন পদ্ধতি, উপকরণ সম্পর্কে যদি কোন তথ্য শিক্ষার্থীকে সরবরাহ করতে হয় বা নিজের জন্য সংগ্রহ করতে হয় বা শিক্ষার্থীকে কোন নির্দেশনা দিতে হয়।

প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও একক কাজ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি: নবম-দশম উপস্থিত শিক্ষার্থী : মোট - জন বালক- জন, বালিকা - জন শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:		বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান সাধারণ পাঠ : বল পাঠ শিরোনাম: গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব সময় : ৫০ মিনিট পিরিয়ড : তারিখ :
রূপরেখা	ক. পূর্বজ্ঞান যাচাই ০৬ মিনিট খ. ১. বিষয়বস্তু শিখন : প্রদর্শন ও একক কাজ ০৮ মিনিট ২.বিষয়বস্তু শিখন : প্রদর্শন ও দলীয় কাজ ০৯ মিনিট ৩. বিষয়বস্তু শিখন: জোড়ায় কাজ ০৮ মিনিট ৪. বিষয়বস্তু শিখন: প্রশ্ন-উত্তর ০৭ মিনিট গ. সামগ্রিক শিখন অগ্রগতি যাচাই ০৮ মিনিট ঘ. প্রয়োগ ০৪ মিনিট		
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা - ● ঘর্ষণ বলের মান যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে ● টায়ারের পৃষ্ঠ, রাস্তার মসৃণতা ও গতি নিয়ন্ত্রণে ঘর্ষণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।		
উপকরণ	মার্বেল, সূঁতা, খসখসে তল, ছোট ইটের টুকরা, মসৃণ তল, খেলনা কার, মসৃণ দিয়াশলাই বক্স ও আটা দিয়ে বালু লাগিয়ে অমসৃণ করা (খাঁজকাটা) দিয়াশলাই বক্স,		

সোপান	পর্ব	কাজ	পদ্ধতি/ কৌশল	সময়
প্রস্তুতি	পর্ব-ক: পূর্বজ্ঞান যাচাই	**কাজ ১:** একটি মার্বেল মেঝেতে গড়িয়ে দিয়ে,সূঁতার এক প্রান্তে একটি ছোট ইটের টুকরো বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতে রেখে দুলিয়ে এবং খসখসে তলে কোন কিছু গড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করব: কিসে কিসে গতি বাধাগ্রস্ত হয়? নিচের লিংকে ক্লিক করে ভিডিওটি প্রদর্শন করব:https://www.youtube.com/watch?v=DULw4dFpcDw(অথবা এই লিংক থেকে পূর্বে নামিয়ে রাখা ভিডিও ক্লিক করে প্রদর্শন করব) **কাজ ২:** নিচের প্রশ্নগুলো করব- ১. হাতের তালু ঘষলে কী হয়? ২. গাড়ীর ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘর্ষণ ঘটলে কী হয়? ৩. ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মবিল তেল ব্যবহার করা হয় কেন? ৪. ঘর্ষণ কী? ঘর্ষণ বল গতির কোন দিকে ক্রিয়া করে? ৫. গতিকে বাধাগ্রস্ত করে কোন বল। শিক্ষার্থীরা প্রদর্শিত দৃশ্য ও ভিডিও দেখবে ও চিন্তা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।	প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর	০৬মি.

সোপান	পর্ব	কাজ	পদ্ধতি/ কৌশল	সময়
শিখন-শেখানো কার্যাবলি	পর্ব-খ: বিষয়বস্তু শিখন	কাজ ১: একটি মার্বেল মেঝেতে গড়িয়ে দিয়ে,সূঁতার এক প্রান্তে একটি ছোট ইটের টুকরো বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতে রেখে দুলিয়ে এবং খসখসে তলে কোন কিছু গড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করব: কিসে কিসে গতি বাধাগ্রস্ত হয়? ঘর্ষণ বলের মান যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেগুলো আলোচনা করব মসৃণ সমতল ও খসখসে তলে খেলনা কারের গতি তুলনা করতে একটি চিত্র বোর্ডে অংকন করে ব্যাখ্যা করব। আলোচনার পর নিচের কাজ এককভাবে করতে দিব। কাজ: ক. মসৃণ সমতলে অথবা খসখসে তলের কোনটিতে খেলনা কার বেশি গতি পাবে? কেন? - খাতায় লিখবে। এবার একটু হেলিয়ে মসৃন সমতলে খেলনা কারটি ছেড়ে দিব। অতঃপর একটু হেলিয়ে খসখসে তলে খেলনা কারটি ছেড়ে দিব। শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষন করবে ও এককভাবে নিচের প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখবে। প্রশ্ন- মসৃণ সমতলে ও খসখসে তলে খেলনা কারের গতির তুলনা কর। কোনটির ঘর্ষণ বেশি ? কেন? ব্যাখ্যা কর।	প্রদর্শন ও একক কাজ প্রদর্শন ও দলীয় কাজ জোড়ায় কাজ	০৮ মি. ০৯ মি.
শিখন-শেখানো কার্যাবলি		কাজ ২: বস্তুর ভর/ওজন ডেস্কের উপর দিয়ে প্রথমে ১টি পরে ২ টি তারপর ৩টি বই ১ ফুট সরিয়ে নিতে কোনটি সহজ হবে ? কেন? দলীয়ভাবে খাতায় লিখবে। শিক্ষার্থীরা প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানের একটি বই ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এ বইটির উপর তাদের সহপাঠীর আর ১ টি বই রেখে আবার ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এবার এই বই দুইটির উপর তাদের সহপাঠীর আর একটি বই রেখে একইভাবে ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এবার দলীয়ভাবে নিচের প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রশ্ন: কোন বই সরানো সহজ হয়েছে? কোনটির ঘর্ষণ বেশি? কেন? ব্যাখ্যা কর। কাজ ৩: বস্তুর খাঁজ- একই ভরের ও আকৃতির একটি মসৃণ দিয়াশলাই বক্স ও আটা দিয়ে বালু লাগিয়ে অমসৃণ করা একটি অল্প হেলান তলে ছেড়ে দিয়ে কোনটির গতি বেশি হবে বা কোনটি গড়িয়ে আগে পড়বে? কোনটিতে ঘর্ষন বেশি হবে এবং কেন , তা জোড়ায় কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবে। কাজ ৪: টায়ারের পৃষ্ঠ ও রাস্তার মসৃণতা- টায়ারের পৃষ্ঠ, রাস্তার মসৃণতা ও গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে ঘর্ষণ ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্ন গুলো করব- ১. টায়ার ও রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বলের মান কিসের ওপর নির্ভর করে? ২. টায়ারের উপর বিভিন্ন নকশায় দাঁত ও খাঁজ থাকায় রাস্তা ও টায়ারের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বল কীরূপ হবে? এর ফলে সুবিধা ও অসুবিধা কী কী হতে পারে? ৩. পুরানো টায়ারের খাঁজগুলো মিলিয়ে গিয়ে সমতল হলে ঘর্ষণ বল কীরূপ হবে? এরফলে সুবিধা ও অসুবিধা কী কী হতে পারে?	প্রশ্ন- উত্তর	০৮ মি. ০৭ মি.

সোপান	পর্ব	কাজ	পদ্ধতি/ কৌশল	সময়
মূল্যায়ন	পর্ব -গ: সামগ্রিক শিখন অগ্রগতি যাচাই পর্ব- ঘ: প্রয়োগ	কাজ ১- মৌখিক প্রশ্ন: শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করব- • কোন ধরনের পৃষ্ঠে বেশি ঘর্ষণ এবং কোন ধরনের পৃষ্ঠে কম ঘর্ষণ সৃষ্টি হবে? • গতিশীল বস্তুতে ঘর্ষণের প্রভাব কীরূপ হবে? • জিমনাষ্ট তাদের হাতে চক ব্যবহার করে কেন? • বরফজমা হ্রদের উপর দিয়ে চলতে অসুবিধা হবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। • রাস্তা খুব বেশি মসৃণ হলে গাড়ী সামনের দিকে অগ্রসর হবে কি? ব্যাখ্যা কর। কাজ ২- বাড়ির কাজ প্রদান- যদি তোমার স্বাভাবিক জীবন চলার জন্য ঘর্ষণের উপস্থিতি না থাকতো তবে কোন কাজটি সহজ এবং কোন কাজটি কঠিন হতো?	প্রশ্ন- উত্তর	০৮ মি. ০৪ মি.

প্রদর্শন, দলীয় কাজ ও একক কাজ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনার নমুনা (ভিন্নভাবে উপস্থাপন)

পরিচিতি	বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : নবম উপস্থিত শিক্ষার্থী : মোট - জন। বালক- জন, বালিকা - জন শিক্ষার্থীদের গড় বয়স:		বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান সাধারণ পাঠ : বল পাঠ শিরোনাম: গতির উপর ঘর্ষণের প্রভাব সময় : ৫০ মিনিট পিরিয়ড : তারিখ :
রূপরেখা	ক. পূর্বজ্ঞান যাচাই ০৬ মিনিট খ. ১. বিষয়বস্তু শিখন : প্রদর্শন ও একক কাজ ০৮ মিনিট ২.বিষয়বস্তু শিখন : প্রদর্শন ও দলীয় কাজ ০৯ মিনিট ৩. বিষয়বস্তু শিখন: জোড়ায় কাজ ০৮ মিনিট ৪. বিষয়বস্তু শিখন: প্রশ্ন-উত্তর ০৭ মিনিট গ. সামগ্রিক শিখন অগ্রগতি যাচাই ০৮ মিনিট ঘ. প্রয়োগ ০৪ মিনিট		
শিখনফল	এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা- • ঘর্ষণ বলের মান যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে • টায়ারের পৃষ্ঠ, রাস্তার মসৃণতা ও গতি নিয়ন্ত্রণে ঘর্ষণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।		
উপকরণ	মার্বেল, সূঁতা, খসখসে তল, ছোট ইটের টুকরা, মসৃণ তল, খেলনা কার, মসৃণ দিয়াশলাই বক্স ও আটা দিয়ে বালু লাগিয়ে অমসৃণ করা (খাঁজকাটা) দিয়াশলাই বক্স,		
পদ্ধতি ও কৌশল	• প্রদর্শন • একক কাজ • দলীয় কাজ • জোড়ায় কাজ • প্রশ্ন-উত্তর		

কার্যপ্রণালী

পর্ব ক: পাঠ সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান যাচাই **০৬ মিনিট**

কাজ ১: একটি মার্বেল মেঝেতে গড়িয়ে দিয়ে,সূঁতার এক প্রান্তে একটি ছোট ইটের টুকরো বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতে রেখে দুলিয়ে এবং খসখসে তলে কোন কিছু গড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করব: কিসে কিসে গতি বাধাগ্রস্ত হয়?

নিম্নের লিংকে ক্লিক করে ভিডিওটি প্রদর্শন করব:

https://www.youtube.com/watch?v=DULw4dFpcDw (অথবা এই লিংক থেকে পূর্বে নামিয়ে রাখা ভিডিও ক্লিক করে প্রদর্শন করব)

কাজ ২: নিচের প্রশ্নগুলো করব-

- হাতের তালু ঘষলে কী হয়?
- গাড়ীর ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘর্ষণ ঘটলে কী হয়?
- ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মবিল তেল ব্যবহার করা হয় কেন?
- ঘর্ষণ কী? ঘর্ষণ বল গতির কোন দিকে ক্রিয়া করে?
- গতিকে বাধাগ্রস্ত করে কোন বল?

শিক্ষার্থীরা প্রদর্শিত দৃশ্য ও ভিডিও দেখবে এবং চিন্তা করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

সম্ভাব্য উত্তর: ঘর্ষণ হলো এক ধরনের বাধাদানকারী বল, যা বস্তুর গতিকে মন্থর করে। ঘর্ষণ বল সর্বদা গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে এবং গতিকে বাঁধা দেয়।

পর্ব খ: বিষয়বস্তু শিখন (৮মি.+৯ মি.+ ৮ মি.+৭ মি.)= ৩২ মিনিট

কাজ ১: একটি মার্বেল মেঝেতে গড়িয়ে দিয়ে,সূঁতার এক প্রান্তে একটি ছোট ইটের টুকরো বেঁধে অন্য প্রান্ত হাতে রেখে দুলিয়ে এবং খসখসে তলে কোন কিছু গড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করব: কিসে কিসে গতি বাধাগ্রস্ত হয়?

ঘর্ষণ বলের মান যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেগুলো আলোচনা করব

মসৃণ সমতল ও খসখসে তলে খেলনা কারের গতি তুলনা করতে একটি চিত্র বোর্ডে অংকন করে ব্যাখ্যা করব।

আলোচনার পর নিচের কাজ এককভাবে করতে দিব।

একক কাজ. মসৃণ সমতলে অথবা খসখসে তলের কোনটিতে খেলনা কার বেশি গতি পাবে কেন? - খাতায় লিখবে।

এবার একটু হেলিয়ে মসৃন সমতলে খেলনা কারটি ছেড়ে দিব। অতঃপর একটু হেলিয়ে খসখসে তলে খেলনা কারটি ছেড়ে দিব। শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করবে ও এককভাবে নিচের প্রশ্নের উত্তর খাতায় লিখবে।

প্রশ্ন-মসৃণ সমতলে ও খসখসে তলে খেলনা কারের গতির তুলনা কর।

কোনটির ঘর্ষণ বেশি ? কেন? ব্যাখ্যা কর।

কাজ ২: বস্তুর ভর/ওজন

ডেস্কের উপর দিয়ে প্রথমে ১টি পরে ২ টি তারপর ৩টি বই ১ ফুট সরিয়ে নিতে কোনটি সহজ হবে ? কেন? শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে খাতায় লিখবে। শিক্ষার্থীরা প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানের একটি বই ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এ বইটির উপর তাদের সহপাঠীর আর ১ টি বই রেখে আবার ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এবার এই বই দুইটির উপর তাদের সহপাঠীর আর একটি বই রেখে একইভাবে ডেস্কের উপর দিয়ে ১ ফুট সরিয়ে নিবে। এবার দলীয়ভাবে নিচের প্রশ্নের উত্তর দিবে।

প্রশ্ন: কোন বই সরানো সহজ হয়েছে? কোনটির ঘর্ষণ বেশি? কেন? ব্যাখ্যা কর।

দলীয় কাজ শেষে দলনেতা তা উপস্থাপন করবে। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করব।

কাজ ৩: বস্তুর খাঁজ-

একই ভরের ও আকৃতির একটি মসৃণ দিয়াশলাই বক্স ও আটা দিয়ে বালু লাগিয়ে অমসৃণ করা একটি অল্প হেলান তলে ছেড়ে দিয়ে কোনটির গতি বেশি হবে বা কোনটি গড়িয়ে আগে পড়বে? কোনটিতে ঘর্ষণ বেশি হবে এবং কেন ,তা শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে বলব। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েক জোড়ার কাজ উপস্থাপন করতে বলব। উপস্থাপন শেষে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করব।

কাজ ৪: টায়ারের পৃষ্ঠ ও রাস্তার মসৃণতা-

টায়ারের পৃষ্ঠ, রাস্তার মসৃণতা ও গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণে ঘর্ষণ ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্ন গুলো করব-

- টায়ার ও রাস্তার মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বলের মান কিসের ওপর নির্ভর করে?
- টায়ারের উপর বিভিন্ন নকশায় দাঁত ও খাঁজ থাকায় রাস্তা ও টায়ারের মধ্যবর্তী ঘর্ষণ বল কীরূপ হবে? এর ফলে সুবিধা ও অসুবিধা কী কী হতে পারে?
- পুরানো টায়ারের খাঁজগুলো মিলিয়ে গিয়ে সমতল হলে ঘর্ষণ বল কীরূপ হবে? এরফলে সুবিধা ও অসুবিধা কী কী হতে পারে?

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উত্তর সংশোধন করে দিব। নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

পর্ব গ: সামগ্রিক শিখন অগ্রগতি যাচাই ০৮ মিনিট

কাজ ১- মৌখিক প্রশ্ন: শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করব। দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করব। এমনভাবে প্রশ্ন করব যেন শ্রেণির সকল দিকের শিক্ষার্থী প্রশ্ন-উত্তরের আওতায় আসে।

- কোন ধরনের পৃষ্ঠে বেশি ঘর্ষণ এবং কোন ধরনের পৃষ্ঠে কম ঘর্ষণ সৃষ্টি হবে?
- গতিশীল বস্তুতে ঘর্ষণের প্রভাব কীরূপ হবে?
- জিমনেষ্টরা হাতে চক ব্যবহার করে কেন?
- বরফজমা হ্রদের উপর দিয়ে চলতে অসুবিধা হবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
- রাস্তা খুব বেশি মসৃণ হলে গাড়ী সামনের দিকে অগ্রসর হবে কি? ব্যাখ্যা কর।

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে। উত্তর ভুল হলে সংশোধনের ব্যবস্থা করব। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

পর্ব গ: প্রয়োগ ০৪ মিনিট

কাজ ১- বাড়ির কাজ প্রদান

নিম্নের কাজটি বাড়ি থেকে সম্পন্ন করে আনার জন্য বোর্ডে লিখে দিব অথবা পূর্বে লিখিত কার্ড ঝুলিয়ে দিব।

বাড়ির কাজ: যদি তোমার স্বাভাবিক জীবন চলার জন্য ঘর্ষণের উপস্থিতি না থাকতো হবে কোন কাজটি সহজ এবং কোন কাজটি কঠিন হতো?

শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় বাড়ির কাজ লিখে নিবে। খাতায় ঠিকমত লিখছে কিনা তা মনিটর করব।

শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাইয়ের মানদন্ড :

অধিবেশন চলাকালে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে -

- শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের উত্তর সম্পূর্ণ, আংশিক, উত্তরের যথার্থতা ও গুছিয়ে বলতে পারা ;
- সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ;
- আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে কিনা তা নিরূপণ;
- শিক্ষার্থীরা কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে কিনা তা পরিবীক্ষণ;
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাবলীলতা ও সঠিকতা ছিল কিনা?
- বিষয়বস্তু বুঝতে পেরেছে কিনা অর্থাৎ বলে বুঝাতে পারছে কিনা?

৭.৩ ছদ্মশিক্ষণ ও অণুশিক্ষণের মাধ্যমে একক কাজ, জোড়ায় ও দলীয় কাজ, অভিনয়, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন

শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকের নানাবিধ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। যে শিক্ষকের দক্ষতা প্রয়োগ করার যোগ্যতা যত বেশি তিনি শিখন-শেখানো কার্যক্রম তত সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। কোন কোন শিক্ষক জন্মগতভাবেই শিক্ষণ দক্ষতাসমূহের অধিকারী। আবার কোন কোন শিক্ষক নিজের প্রচেষ্টায় দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হন। অনেক শিক্ষকই আছেন যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন। শিক্ষকগণের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন কার্যক্রমও চলে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে। শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত ও আত্মস্থ করার প্রধানতম দুইটি পদ্ধতি হচ্ছে ছদ্ম শিক্ষণ ও অণুশিক্ষণ। ছদ্মশিক্ষণ ও অণুশিক্ষণ আসলে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোর কোন পদ্ধতি বা কৌশল নয়। শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতাসমূহ অর্জনের দু'টি পদ্ধতি হচ্ছে ছদ্মশিক্ষণ ও অণুশিক্ষণ। যদিও কখনও কখনও কেউ ছদ্মশিক্ষণকে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে ব্যবহারের কথাও বলেন। ছদ্মশিক্ষণে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আর কয়েক জন সহপাঠী শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠটি কৃত্রিম শ্রেণি পরিবেশে উপস্থাপনের পর শিক্ষকের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এভাবে শিক্ষককের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে শিক্ষকগণের দক্ষতার উন্নয়নে যে পদ্ধতিটির আশ্রয় নেওয়া হয় তা হল অণুশিক্ষণ।

ছদ্মশিক্ষণের ধারণা

মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিমান বাহিনীর পাইলটদের ট্রেনিংয়ের জন্য ছদ্মশিক্ষণের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার শুরু হয়। তবে অনেকের মতে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছদ্মশিক্ষণ জ্ঞানগত ও আবেগিকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে তৎপর করতে সক্ষম হয়েছে। শিখন-শেখানোর যে কৌশল বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়নের চেষ্টা করে তাকে ছদ্মশিক্ষণ বলে। এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক শিক্ষার্থীর, শিক্ষকের এবং মূল্যায়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এতে প্রশিক্ষক সহায়তাকারী ও প্রেষণাদানকারীর ভূমিকা পালন করেন। ছদ্মশিক্ষণ হলো এমন একটি শিক্ষণ কৌশল যা বয়স্ক অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করে। "ছদ্মশিক্ষণ হলো বাস্তব পরিস্থিতির একটি সরলীকৃত মডেল।" (চ্যাপিন, ১৯৬৯)।

"ছদ্মশিক্ষণ হলো বাস্তব বিশ্ব পরিস্থিতির অবিকল চিত্র যা শিখনে মূল্যবান। শিক্ষামূলক ছদ্মশিক্ষণ একজন ব্যক্তিকে এ ব্যবস্থার একজন কর্মক্ষম সদস্য হিসেবে সৃষ্টি করে এবং লক্ষ্য স্থিরকরণে, কর্মসূচি প্রণয়নে, তথ্য বিশ্লেষণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তোলে (ক্লাইটেস)।"

ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে পাঠ উপস্থাপন করেন। তার পাঠ উপস্থাপনের দুর্বলতাগুলোকে তারই সহকর্মী প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক গঠনমূলক আলোচনা/সমালোচনার মাধ্যমে শুধরিয়ে নিতে সাহায্য করেন। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে দিয়ে যদি একই বিষয়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে কয়েকটি পাঠ উপস্থাপন করানো যায় এবং ফলাবর্তনের মাধ্যমে তাকে শুধরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে শিক্ষক হিসেবে কার্যসম্পাদনের জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, ধীরস্থির ও গতিশীল মনোভাব সৃষ্টি হবে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা শোনার এবং সমাধানের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক, পথ প্রদর্শক, পরামর্শক হিসেবে শিখনকে কর্মকেন্দ্রিক করে তোলেন। এই কর্মকেন্দ্রিকতার কারণেই শিক্ষা হয়ে উঠে আনন্দদায়ক ও ক্লান্তিহীন। তথ্য সরবরাহ, তৎপরতা এবং সংশ্লেষণের দরুণ অংশগ্রহণকারীদের অনেকগুলো ইন্দ্রিয়কে এ ব্যবস্থায় শিখনে ব্যবহার করা যায়। বক্তৃতা ছাড়াও ছদ্মশিক্ষণ প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, আরোহী-অবরোহী, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

ছদ্মশিক্ষণের সুবিধাসমূহ

- ছদ্ম শিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের শিখনে উদ্বুদ্ধ করে;
- শিখন ও শিক্ষণের দুর্বলতা বা ত্রুটিগুলো সংশোধনের সুযোগ করে দেয়;
- অংশগ্রহণকারীদের মাঝে শিখনের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করে;
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মূল্যায়নকারী নিয়োগ করে তাদের গঠনমূলক সমালোচক, কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান করে তোলে;
- অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ তৈরি হয়;
- পর্যায়ক্রমে সকলকে পাঠদানকারী ও মূল্যায়নকারী বানাতে সহায়তা করে;
- অংশগ্রহণকারীদের একাধিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয় সাধনে উৎসাহিত করে;
- অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন সাধন করে;
- অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, দক্ষতার ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করে;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করে;
- বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা সৃষ্টি করে।

ছদ্মশিক্ষণের দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা

- কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষণ কৌশল আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করা হয়, তাই অংশগ্রহণকারীগণ প্রকৃত বা বাস্তব অবস্থার তুলনায় কম মনোযোগী হয়;
- কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপনের কারণে বাস্তবতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে;
- অনেক সময় কম সময় বরাদ্দের কারণে আলোচনা ভালভাবে করা যায় না। ফলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না;
- ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের সম্ভাবনা কমে যায়;
- শিক্ষক যদি এ পদ্ধতি পরিচালনার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ না করে শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করেন , তবে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না;
- প্রয়োজনীয় অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর সহায়তার অভাবে ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়;
- ছদ্মশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের শিখনের আগ্রহকে কোন কোন সময় কমিয়ে দেয়;
- অংশগ্রহণকারীগণ কোন কোন সময় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে;
- ছদ্মশিক্ষণে কখনও কখনও অন্যান্য শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে গুরুত্ব কমে যায়;
- অংশগ্রহণকারীগণ সতীর্থ বিধায় তাদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ছদ্মশিক্ষণের চক্রাকার ধাপ

ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানোর বিভিন্ন কৌশল অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরণ করতে হয়:

- পাঠদান
- ফলাবর্তন
- পুনঃপরিকল্পনা → বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে পাঠদান
- পুনঃফলাবর্তন
- পুনঃপাঠদান
- পুনঃফলাবর্তন

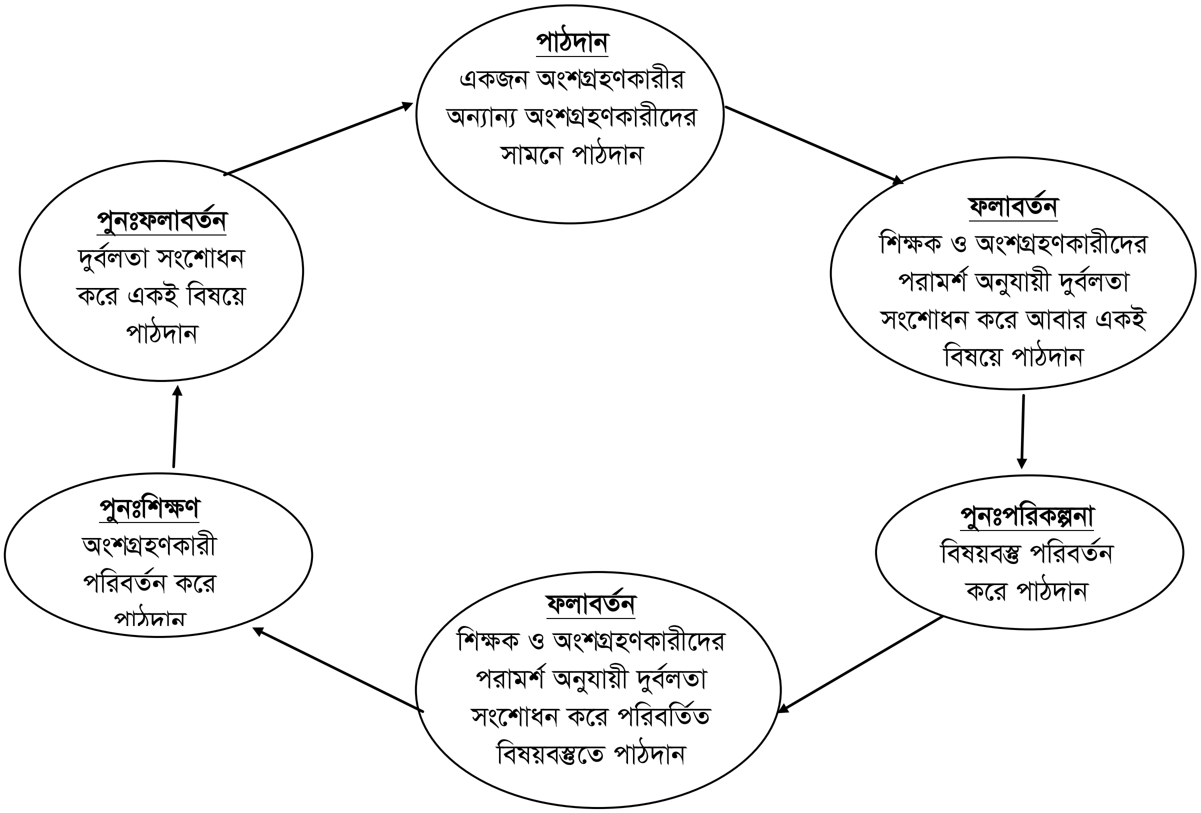

চিত্র ৭: ছদ্মশিক্ষণের চক্রাকার ধাপ

অণুশিক্ষণ পরিচিতি

Micro শব্দের অর্থ হলো খুব ছোট বা অণু এবং Teaching শব্দের অর্থ - শিক্ষাদান। Micro Teaching অর্থ-অণুশিক্ষণ। এ পদ্ধতিতে একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক ৫/৬ মিনিট সময়ে শিক্ষাদান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণের একটি কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। কোন কোন সময় একটি কৌশল আয়ত্ত করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষককে বার বার চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষক শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীকে শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এমসি, নাইট এর মতে,''অণুশিক্ষণ হলো এমন এক শিক্ষণ কৌশল যার মধ্যমে বার বার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত এবং পুরাতন দক্ষতাকে উন্নততর করা যায়।''

এ্যালেন এবং ইভ-এর মতে, ''নির্দিষ্ট কোন শিক্ষামূলক আচরণে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদানের নিয়ন্ত্রিত কৌশলকে অণুশিক্ষণ বলে।''

শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল একবারে আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অণুশিক্ষণ। সুতরাং অণুশিক্ষণ এমন এক নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শিক্ষণ দক্ষতা বারবার অনুশীলন করা যায়।
আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের এটি একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। শিক্ষাদান বিশেষ করে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদানে বাস্তব প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এ কৌশল একটা সাফল্যজনক উপায়।

১৯৬৩ সনে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষণ পদ্ধতিটি উদ্ভাবিত হয়। পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ করতে কিছুটা সময় লাগে। ১৯৬৮ সনে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ পদ্ধতিটির সার্থক প্রয়োগ শুরু হয় এবং শিক্ষকদের পাঠদানের জন্য ১৪টি দক্ষতা বা কৌশল শনাক্ত করা হয়।

অণুশিক্ষণের দক্ষতাসমূহ

১. পাঠ প্রস্তুতি; ২. উদ্দীপনার তারতম্য; ৩. উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন; ৪. উচ্চমানের প্রশ্ন; ৫.বিভিন্নমুখী প্রশ্ন ৬. প্রশ্নকরণে স্বাচ্ছন্দময়তা; ৭.বলবৃদ্ধিকরণ; ৮. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত; ৯. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি; ১০.বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি; ১১.বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার;১২. পরিকল্পিত পুনরুক্তি; ১৩. সংযোগের সম্পূর্ণতা সাধন; ১৪. সমাপ্তিকরণ

পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় আরও ৪টি দক্ষতাসহ মোট ১৮টি দক্ষতা তালিকাভুক্ত করে। সেগুলো হলো -

১৫. শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার
১৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা
১৭. দলগত আলোচনায় উৎসাহ প্রদান
১৮. শিক্ষকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা

অণুশিক্ষণের কৌশল বা দক্ষতাসমূহ কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষককে পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো হলো -

১. পাঠদান
২. ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক
৩. পুনঃপরিকল্পনা
৪. পুনঃপাঠদান
৫. পুনঃফলাবর্তন

এ ধাপ পাঁচটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। চক্রটি নিম্নরূপ-

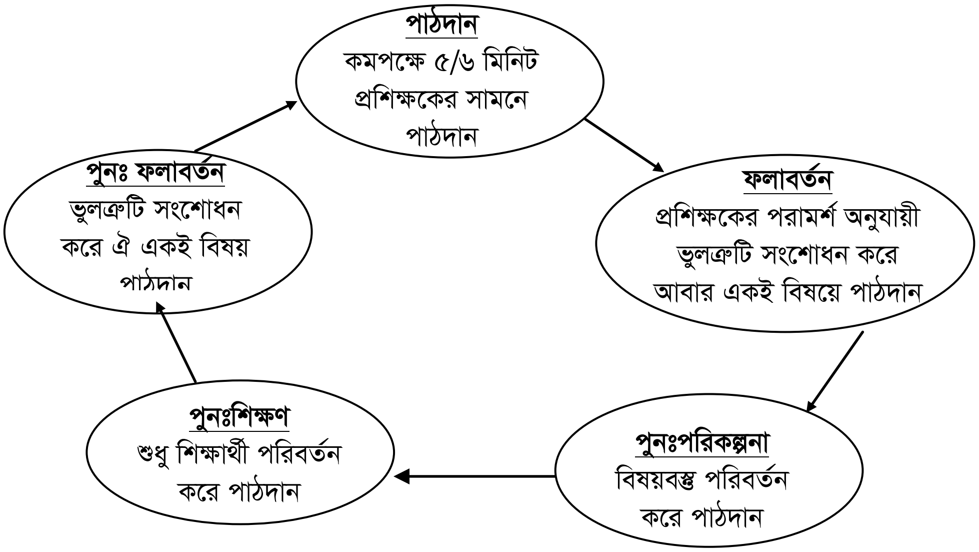

চিত্র ৮: অণুশিক্ষণ চক্র

একক কাজ, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ, অভিনয়, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন কৌশল অনুশীলন: মাধ্যম ছদ্মশিক্ষণও অণুশিক্ষণ

ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণের বা বিদ্যালয় শিক্ষকগণের বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশলের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষ করে তোলা যায়। এজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন করে সে বিষয়বস্তু উপযোগী কৌশল নির্বাচনপূর্বক ছদ্মশিক্ষণ পরিকল্পনা করা। এটা শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে যে কৌশলটির ব্যবহার অনুশীলন করতে হবে পরিকল্পনায় সে কৌশলই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলভিত্তিক অনুশীলনে দলীয় সদস্যদের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এক একটি দলকে এক এক কৌশল প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার নিজ বিষয়বস্তুর ওপর কৌশল প্রয়োগভিত্তিক ১০ মিনিট শিখন উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করবেন। পরিকল্পনা ছকে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে- বিষয়বস্তু, শ্রেণি,শিখনফল, কাজ (একক, জোড়ায়, অভিনয়, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো, দলীয়

আলোচনা ইত্যাদি)। পরিকল্পনা করার পর প্রতিদল ছদ্মশিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠদান করবেন। নির্ধারিত অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারী ফলাবর্তন প্রদান করবেন। ফলাবর্তনের দুর্বলতাসমূহ বিবেচনা করে বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে পুনরায় পরিকল্পনা করবেন। পুনঃপরিকল্পনা অনুযায়ী পুনঃপাঠদান করবেন। পুনঃ ফলাবর্তন দেওয়া হবে। এভাবে চক্রাকারে পুনঃ পরিকল্পনা, পুনঃপাঠদান ও পুনঃফলাবর্তনের মাধ্যমে অনুশীলনের মাধ্যমে কৌশলটি ব্যবহারের দক্ষতা অনুশীলন করবেন। এভাবে দলের প্রত্যেক সদস্য অনুশীলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেহেতু ছদ্মশিক্ষণে শিখন-শেখানোর জন্য নির্ধারিত পুরো সময়টাই ব্যবহার করা যায় সেজন্য ছদ্মশিক্ষণের মাধ্যমে একক কাজ,জোড়ায় কাজ, অভিনয়, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি কৌশলগুলোর ব্যবহার ও অনুশীলন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অনুশীলনের মাধ্যমে কৌশলগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জিত হয়।

ছদ্মশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি ব্যবহারের উপায়সমূহকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যেতে পারে :

- বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টিকরণ;
- কৃত্রিম পরিবেশকে শ্রেণিকক্ষের মডেল হিসেবে বিবেচনা করা;
- কৌশলের দক্ষতা আয়ত্ত করার জন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন,অনুমোদন ও পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- প্রশিক্ষণার্থীদের ২/৩ জন পর্যবেক্ষক হয়ে মূল্যায়ন ছকের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজ মূল্যায়ন করা;
- অন্য সকল প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষার্থীরূপে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণ;
- অধিবেশন শেষে সবার মূল্যায়ন ছক ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দুর্বল ও সবল দিক চিহ্নিতকরণ;
- মূল্যায়ন ছকের ক্ষেত্রে ৩/৫/৭ পয়েন্টের স্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে;
- বিশেষ কোন মন্তব্য থাকলে খোলা মন নিয়ে আলোচনা / সমালোচনা করা;
- সবসময় মনে রাখতে হবে গঠনমূলক সমালোচনা অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন,নমনীয় এবং উদ্দীপনামূলক ভঙ্গীতে প্রকাশ করা ভাল।

অণুশিক্ষণের মাধ্যমে কৌশলসমূহ অনুশীলন

অণুশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণের বা বিদ্যালয় শিক্ষকগণের শিখন-শেখানোর বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করা সহজ হয়। এজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্বাচন করে সে বিষয়বস্তু উপযোগী কৌশল নির্বাচনপূর্বক অণুশিক্ষণ পরিকল্পনা করা। এটা শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে যে কৌশলটির ব্যবহার অনুশীলন করতে হবে পরিকল্পনায় সে কৌশলই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলভিত্তিক অনুশীলনে দলীয় সদস্যদের পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এক একটি দলকে এক এক কৌশল প্রয়োগের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। কোন দল কোন কৌশল অনুশীলণ করবে সে দলের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী তার নিজ বিষয়বস্তুর ওপর কৌশল প্রয়োগভিত্তিক ১০ মিনিট শিখন উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করবেন। শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত না করে অনুশীলনের মাধ্যমে মাত্র একটি করে কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রমকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে অনুশীলন করাই অণুশিক্ষণ। ‘প্রচেষ্টা’ ও ‘ভুল’ এ পদ্ধতি অবলম্বনে একটি একটি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের শিক্ষা দেওয়াই অণুশিক্ষণের প্রধান কাজ।

অণুশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শিখানো কৌশলসমূহ আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া

- একটি কৌশল ছোট একটি পর্যবেক্ষক দল ও শিক্ষার্থী দল (৫/৬ জন) এর সামনে ৭/৮ মিনিট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী উপস্থাপন করবেন। প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিশেষ কৌশল বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়ত্ত করা।
- বিশেষজ্ঞগণ তিন থেকে পাঁচ পয়েন্ট স্কেলের একটি মূল্যায়ন শিট এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থী অল্প কিছুক্ষণ পর ঐ একই কৌশল আবার অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করবেন।
- দ্বিতীয়বার অনুশীলনকালে ঐ কৌশলটি পূর্ববর্তী সমালোচনার ওপর ভিত্তি করে উন্নততর হবে এটাই স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয়।

এভাবে অনুশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে চলার মাধ্যমে যে অনুশীলন হবে তাতে প্রশিক্ষণার্থী বা শিক্ষকগণ একটি শিখন কৌশল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবেন।

অণুশিক্ষণের নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ছক

<table>
<tr><td>প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক :
কৌশল :</td><td>শ্রেণি :
তারিখ :
সময় :</td></tr>
<tr><td colspan="2">১. উদ্দেশ্য :

২.শিক্ষণ পদ্ধতি :
ক. সূচনা :

খ. বিকাশ সাধন :

গ. সমাপ্তি :
ঘ. শিক্ষা উপকরণ :
৩. শিক্ষণ শেষে শিক্ষকের আত্মসমালোচনা :
৪. ভিডিওতে নিজের পাঠ দেখার পর আত্ম সমালোচনা :
৫. পর্যবেক্ষকের সমালোচনা :</td></tr>
</table>

অণুশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিতে একক কাজ, জোড়ায় কাজ, অভিনয়, দলীয় কাজ, মাথা খাটানো, দলীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার ও অনুশীলন করা সম্ভব হয়। কেননা এই প্রক্রিয়াটির মূল বৈশিষ্ট্যই হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দক্ষতাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা। অনুশীলনের মাধ্যমে কৌশলগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জিত হয়।

৭.৪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা অনুসন্ধান এবং শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশল অনুশীলন: সুস্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা, লিখিত ও মৌখিক

বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল পরিচালনার উপযোগী ব্যবস্থা নেই। কিন্তু অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের শিখন ভালো হয়। এসকল বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল পচিালনার ক্ষেত্রে যে সকল সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারমধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী, শ্রেণির আসন ব্যবস্থা অনুকূল নয়, পিরিয়ডের ব্যাপ্তি কম,শ্রেণিকক্ষের আকার আকৃতিগত সমস্যা, শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামের ঘাটতি ইত্যাদি। এসকল কারণে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষককে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জানা উচিত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কোন কোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ উপযোগী। প্রয়োগ উপযোগী এসকল পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে শিক্ষকের কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। আবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ কাজে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। এসকল নির্দেশনা যদি স্পষ্ট না হয় এবং ধারাবাহিকতা না থাকে তাহলে শ্রেণি কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। এ সকল নির্দেশনা লিখিত হতে পারে আবার মৌখিকও হতে পারে।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহ

- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা
- শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা
- যোগাযোগ দক্ষতা
- আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা

- বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা
- মনোবৈজ্ঞানিক দক্ষতা / আচরণ সম্পর্কিত দক্ষতা
- শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর দক্ষতা
- একীভূতকরণ দক্ষতা
- প্রশ্নকরণের দক্ষতা
- ব্যবস্থাপনার দক্ষতা
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ ও সময়োপযোগী ব্যবহার দক্ষতা
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার দক্ষতা

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতাসমূহের বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

• শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার ক্ষেত্র অনেক বড়। তবে সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাদারিত্বকে শিক্ষকের ভাবভঙ্গি, সময়ানুবর্তিতা,শৃঙ্খলাবোধ ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এই ৪টি উপক্ষেত্রের আওতায় আনা যেতে পারে। অর্থাৎ একজন শিক্ষকের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে ইতিবাচক। সময়ানুবর্তিতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রহ করতে হলে শিক্ষকের নিজেকেও শৃঙ্খলার চর্চা করতে হবে। তাছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না পারলে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ যথাযথভাবে করা সম্ভব হবে না। শিক্ষকতা পেশার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষক নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন তিনি কোন কোন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন এবং তা কখন, কীভাবে করবেন। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

• শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নেওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। এর আওতায় পড়ে পাঠ পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি।

➢ **পাঠ পরিকল্পনা:**পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা একজন শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, গতানুগতিক পাঠ পরিকল্পনা নয়,শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর উপযোগী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা থাকতে হবে। প্রতিটি পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পাঠ পরিকল্পনায় কাজগুলো হবে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করে। পাঠের যে কোন অংশের অপারগতার জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা থাকতে হবে।

➢ **পূর্ব প্রস্তুতিঃ** পাঠের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে। পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে পাঠ সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি কাজের প্রস্তুতি আগেই নিয়ে রাখতে হবে। প্রস্তুতির প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে, বিষয়বস্তু সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তুর ধারণা ও তথ্যসমূহ সম্পর্কে দখল থাকতে হবে। পাঠ পরিকল্পনায় উল্লিখিত উপকরণসমূহ পূর্বেই প্রস্তুত করে রাখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। অংশগ্রহণমূলক কাজ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র, কর্মপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত করে রাখতে হবে। লিখিত ও মৌখিকভাবে গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিট প্রস্তুত করে রাখতে পারাও এ দক্ষতার অন্তর্ভুক্ত । কম সামর্থ্যবিশিষ্ট বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

• যোগাযোগ দক্ষতা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারে যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সঠিকভাবে যোগযোগ করতে না পারলে শিখনফল অর্জন সম্ভব হবে না। প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে। দৃষ্টি বিন্যাস কার্যকর যোগযোগের সহায়ক। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী পায়চারী করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে তারপর নিজে বলতে হবে বা উত্তর দিতে হবে।

● আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা

শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অর্জন করানোর যোগ্যতা থাকতে হবে।

● বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিখন-শিখানো কাজ পরিচালনায় কখনও কখনও সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সমস্যা সমাধান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করতে পারা এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দক্ষতা একজন শিক্ষকের থাকতে হবে।

● আচরণ সম্পর্কিত দক্ষতা

শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বুঝে সে অনুযায়ী পদ্ধতি, কৌশল ব্যবহার করলে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আচরণ করলে শিখন-শেখানো কার্যকর, ফলপ্রসূ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে। শিক্ষার্থীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশংসা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয় এমন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়াও আরও যে সকল উপ-দক্ষতা অর্জন করতে হবে তা হলো-

- **শিক্ষার্থীদের পছন্দকে উৎসাহিত করা:** শিক্ষার্থীদেরকে শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকে অনুমোদন দিতে হবে। তাদেরকে বিকল্প কাজ বা ধারণা বিষয়বস্তু পছন্দ করার সুযোগ দিলে শিখন অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং তা কার্যকর হবে। পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে পারলে শিক্ষার্থীরা অধিকতর দায়িত্বশীল হবে এবং শিক্ষার প্রতি যত্নবান হবে।

- **সতীর্থ শিক্ষণের অনুমোদন:** শিক্ষার্থীদেরকে পরস্পর সহযোগিতা করার সুযোগ দিতে হবে। এরফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পায় এবং সতীর্থকে বুঝাতে সক্ষম হয় তাহলে নিজেরা অনুপ্রাণিত, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও উৎসাহী হয়।

- **ধৈর্য্যশীল হওয়া:** বিভিন্ন শিক্ষার্থী ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ক্রম অনুসরণ করে শিখে। যদি কোন শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেওয়া প্যাটার্ণ অনুসরণ না করে ভিন্নভাবে শিখতে পারে, সেজন্য অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যশীল হতে পারার দক্ষতা শিক্ষকের থাকা জরুরি।

- **শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টির দক্ষতা:** শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারলে তারা পাঠ সহজে শিখে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বেশি শিখতে পারে। ইতিবাচক প্রেষণা সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক রয়েছে স্পষ্টভাবে পাঠের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারা, বিষয়বস্তুর সারাংশ উপস্থাপন করতে পারার। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহী করতে হবে, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করাতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে, পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট কৌতুক উপস্থাপনের দক্ষতা থাকতে হবে।

- **শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন অনুধাবনের দক্ষতা :** শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একভাবে শিখে না। কেউ শিখে দেখে, কেউ শিখে শুনে আবার কেউ শিখে কাজ করার মাধ্যমে। কেউ শিখে আরোহী পদ্ধতিতে, কেউ শিখে অবরোহ পদ্ধতিতে। শিক্ষার্থীদের শেখার ধরন কী তা বোঝার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। আর শেখার ধরনের সাথে মিল রেখে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল বাছাই করার দক্ষতা অর্জনের ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে।

- **সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার দক্ষতা :** কিছু আচরণ বা কাজ নির্দেশ করে যে,শিক্ষার্থী সমস্যাগ্রস্ত আছে। যেমন- শিক্ষার্থীর নিম্ন গ্রেড প্রাপ্তি বা উচ্চতর গ্রেড পরিবর্তিত হয়ে নিম্ন গ্রেড এ যাওয়া, অতি মাত্রায় অনুপস্থিতি, বিষন্ন মেজাজ, ক্ষতিকর আবেগিক প্রতিক্রিয়া, আকস্মিক উৎসাহ কমে যাওয়া, খুব বিভ্রান্তিকর আচরণ প্রদর্শন ইত্যাদি। এসকল আচরণ দেখে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থী শনাক্ত করতে পারার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। এধরনের সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষক যেভাবে সহায়তা করতে পারেন তা হচ্ছে, যখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের যথেষ্ট সময় থাকে তখন একান্তে কথা বলা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সত্য উদঘাটনে মনোনিবেশ করা, শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দেওয়া, খুব শান্তভাবে ও শ্রদ্ধার সাথে তার কথা শোনা, তার সমস্যা বুঝা এবং এটা যে সত্যিই সমস্যা তা সমর্থন করা ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

● শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর দক্ষতা

শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর দক্ষতার ওপর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের সফলতা নির্ভর করে। শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর দক্ষতার আওতাভুক্ত উপ-দক্ষতাসমূহের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো -

- **শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে জড়িত করানোর দক্ষতা :** শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে কাজ করতে শেখাতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থী শিক্ষকের সামনে বসা কিন্তু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না কেবল কথা শুনে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে। শিক্ষার্থীদের সর্বদা পরীক্ষণ পরিচালনা, বিষয়বস্তু উপস্থাপনা বা প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে না। তারা শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, আলোচনা করার মাধ্যমেও পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সকল শিক্ষার্থীকে নিজেদের মধ্যে এবং শিক্ষকের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া করতে উৎসাহিত করে।
- **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিখনকে উৎসাহিত করার দক্ষতা:** শিক্ষার্থী যাতে তার ভুলের মাধ্যমে শিখতে পারে শ্রেণিতে সেরকম পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষকের কাজ ও দক্ষতা। শিক্ষার্থী প্রথম পদক্ষেপেই সব কিছু সঠিকভাবে শিখতে পারবে এমন আশা করা উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে।
- **সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান:** যে কোন শিখন-শেখানো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিখনের শুরু থেকে সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সকল কাজের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হতে হবে।

● সমস্যা সমাধানকে গুরুত্ব প্রদানের দক্ষতা

জীবনের একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা হচ্ছে কোন সমস্যা বুঝার সামর্থ্য এবং তা সমাধান করা। এই দক্ষতা অর্জন করা যায় অনুশীলনের মাধ্যমে। অতীতে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক একটি সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধান করে দিতেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে সমস্যা তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে তার সমাধান করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করেন। অংশগ্রহণমূলক শিখনে স্বীকার করা হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং প্রত্যেকের আলাদা দক্ষতা ও সামর্থ্য রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সমস্যা সমাধানে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। একাধিক পদ্ধতিতে সমাধান করা যেতে পারে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম সমাধান খুঁজে বের করার সামর্থ্য থাকতে হবে। অংশগ্রহণমূলক শিখনে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের এরকম পাঠসংশ্লিষ্ট সমস্যা তুলে ধরে সমাধানে দক্ষ করা।

● সিদ্ধান্তগ্রহণ অনুশীলনের দক্ষতা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমন একটি দক্ষতা যা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। বাস্তব এবং কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থী এই দক্ষতার অনুশীলন করার সুযোগ পাবে। যা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

● বাস্তবতার সাথে পাঠের বিষয়বস্তুর সম্পর্ক স্থাপন দক্ষতা

বর্তমান কালে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, শিক্ষার্থী কী শিখছে এবং বাস্তব জীবনে তা কীভাবে কাজে লাগবে তা বুঝতে চায়। অংশগ্রহণমূলক শিখনের লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে শিখন এবং বাস্তব জগতের প্রয়োজনের সাথে যে তফাৎ তার মধ্যে সংযোগ সাধন করা। শ্রেণিকক্ষের শিখন ও বাস্তব জগতের পরিস্থিতির সাথে সংযোগ স্থাপনের মতো পরিবেশ সৃষ্টি করানো শিক্ষকের কাজ।

● একীভূতকরণের দক্ষতা

শিক্ষকগণ অনেক সময় নিজের অজান্তেই বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই যারা সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে ভিন্ন তাদের দিকে সাড়া প্রদান করেন না বা তাদের এড়িয়ে যান। শারীরিক, মানসিক, আর্থনীতিক বা অন্য কোনভাবে পিছিয়ে পড়া বা যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে এড়িয়ে গেলে তা সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণমূলক হবে না। কাজেই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই আলাদা, প্রত্যেকেরই নিজস্ব পটভূমি আলাদা, ব্যক্তিত্ব আলাদা। কাজেই শ্রেণিতে কাউকেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সকল শিক্ষার্থীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাউকেই উপেক্ষা করা যাবে না। সামগ্রিক পদ্ধতিতে (Holistic Approach) পাঠ পরিচালনার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

● প্রশ্নকরণের দক্ষতা

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করা এবং তাদের প্রশ্ন করতে সুযোগ প্রদান শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের একটি উপায়। গঠনমূলক ও প্রান্তিক উভয় ধরনের মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নকরণ গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণমূলক শিখনে এমনভাবে প্রশ্ন করতে হবে যাতে শ্রেণির সকলে সক্রিয় থাকে। এমন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বিকাশ লাভ করে। শিক্ষকের প্রশ্নকরণ এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদান দক্ষতা অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগকে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে নিম্নস্তরের চিন্তনের প্রশ্নের সাথে উচ্চতর ও উন্মুক্ত প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উত্তর ব্যবস্থাপনা করতে হবে এবং উত্তরের ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হবে।

● ব্যবস্থাপনার দক্ষতা

ব্যবস্থাপনার ওপর অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের যথার্থতা নির্ভরশীল। ব্যবস্থাপনার আওতায় রয়েছে অনেক উপক্ষেত্র। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য যেগুলো প্রয়োজন তা হচ্ছে, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ দক্ষতা, সময় ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা।

- **শ্রেণি ব্যবস্থাপনা:** শ্রেণিতে শিক্ষার্থী বসার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সকল বাহ্যিক পরিবেশ বা অবকাঠামোগত দিকের ব্যবস্থাপনা এর অন্তর্ভুক্ত। অংশগ্রহণমূলক শিখনের জন্য সারি ও কলামভিত্তিক নয়, গ্রুপভিত্তিক বা স্টেশনভিত্তিক বসানোর ব্যবস্থা করা ভালো। শিক্ষার্থীর সামাজিক দিকের অর্থাৎ সামাজিক দক্ষতাসমূহ ব্যবস্থাপনা করার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

- **পরিবীক্ষণ দক্ষতা:** শিখন ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষকের পরিবীক্ষণ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। অংশগ্রহণমূলক কাজসমূহ শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে করছে কিনা বা করলেও কতটা করতে পারছে, না পারলে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে।

- **সময় ব্যবস্থাপনা:**একটি পাঠের জন্য মোট কত সময় বরাদ্দ সেই অনুসারে পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা করে সময় বরাদ্দ করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কাজটি শেষ করতে হবে। তবে প্রতিটি কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

- **শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা:** শ্রেণিশৃঙ্খলা রক্ষা করার অনেক রকম প্রক্রিয়া আছে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে যেহেতু শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বা দলীয়ভাবে বা সম্পূর্ণ ক্লাশ একসাথে কাজ করতে হয়, কাজেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ আছে। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাতে শিখন-শেখানো কাজ তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়।

● বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ চিহ্নিতকরণ, সংগ্রহ ও সময়োপযোগী ব্যবহার দক্ষতা

কোন্ বিষয়বস্তু ও কোন্ পদ্ধতির জন্য কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার উপযোগী তা চিহ্নিতকরণ ও সংগ্রহ করার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। বর্তমানকালে শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করানোর জন্য উপকরণ ফিল্ম, ভিডিও, স্লাইড, কম্পিউটার, ইন্টার একটিভ বোর্ড, ডকুমেন্ট ক্যামেরাসহ আরও অনেক সফটওয়ার ও অ্যাপ ব্যবহার করা হয়। যদি এসকল উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণ শিক্ষক যথাযথভাবে ও যথাসময়ে ব্যবহার করতে না পারেন তবে শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে যাবে এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। কিন্তু যদি সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা হয় তাহলে উপকরণ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার যা শিক্ষার্থীদের শিখন কাজে অংশগ্রহণে সহায়তা করে।

●শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার দক্ষতা

শিখনের সাফল্য কেবল একটি মাত্র পরীক্ষার দ্বারা বা পিরিয়ডের শেষের দিকে কয়েকটি গতানুগতিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত শিখন যাচাইয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কাজ চলাকালীন এবং কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের যাচাই করার দক্ষতা শিক্ষকের থাকতে হবে। এসকল মূল্যায়নের মধ্যে দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানের কৌশল অনুশীলন:সুস্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা, লিখিত ও মৌখিক

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাঝে মাঝেই শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন হয়। এসব নির্দেশনা পাঠ সংশ্লিষ্ট বা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোন কাজ দেওয়া বা প্রশ্ন করার দরকার হয়। শিক্ষার্থীদের যে নির্দেশনাই দেওয়া হোক না কেন তা সুস্পষ্ট হতে হবে এবং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রয়োজন। কেননা নির্দেশনা স্পষ্ট কিন্তু কোনটির পর কোনটি হবে তা যদি ক্রম অনুযায়ী না থাকে তাহলে তা অকার্যকর হতে পারে। এই নির্দেশনাসমূহ মৌখিক হতে পারে আবার লিখিত হতে পারে। নির্দেশনা একটু বড় আকার বা কিছুটা জটিল প্রকৃতির হলে তা লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রেণি শিক্ষণকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদানে যে সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হয় এবং যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যায়, তারমধ্যে সুস্পষ্টতা, ধারাবাহিকতা,লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনা অন্যতম।

সুস্পষ্ট নির্দেশনা

সহজে অনুসরণযোগ্য নির্দেশনা থেকে সকল শিক্ষার্থী উপকার পায়। সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধী এবং অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য নয় এমন নির্দেশনা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। নির্দেশনা প্রদানে দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থক শব্দ ও বাক্য পরিহার করতে হবে। শিক্ষক শ্রেণিতে যে নির্দেশনা প্রদান করেন তা অনেক সময় শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর নিকট বোধগম্য নাও হতে পারে। তাই শিক্ষকের উচিত নির্দেশনাটি সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করা। এই যাচাই নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করেও করা যেতে পারে আবার শ্রেণির বিভিন্ন কর্ণারের শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে থেকে জানা যেতে পারে। আবার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করেও নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে, তারা নির্দেশনাটি বুঝতে পেরেছে কিনা। নির্দেশনার সুস্পষ্টতায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হলো-

- নির্দেশনা ব্যাখ্যা করার সময় সংশ্লিষ্ট উদাহরণ ব্যবহার করা;
- শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা বুঝেছে কিনা তা জানার জন্য প্রশ্ন করা;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান;
- যে অংশটুকু শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা , তা পুনরুল্লেখ করা;
- নির্দেশনার বিষয়টি ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা;
- যথোপযুক্ত গতিতে নির্দেশনা প্রদান;
- কিছু অংশ ব্যাখ্যা করার পর চিন্তা করার জন্য একটু সময় দেওয়া;
- পাঠের উদ্দেশ্য কী বা তারা কী করতে সক্ষম হবে নির্দেশনার পর শিক্ষার্থীদের তা অবগত করানো;
- যৌক্তিক পদ্ধতিতে নির্দেশনা প্রদান ও পাঠ উপস্থাপন।

নির্দেশনার ধারাবাহিকতা

শিখন-শেখানো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের নির্দেশনা স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে নির্দেশনার ধারাবাহিকতাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশনাগুলো বা একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি ধারাবাহিকতা না থাকে তাহলে শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজটি সফল না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই নির্দেশনার ক্ষেত্রে শিক্ষককে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। আগের কাজ পরে এবং পরের কাজ আগে করতে বললে শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হবে এবং কাজটির ফলাফল হবে অপ্রত্যাশিত ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিবিহীন। তাছাড়া শিক্ষক যদি প্রথমে একটি কাজের নির্দেশনা দিয়ে পরক্ষণেই অন্য একটি নির্দেশনা দেন তাহলে কাজের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা পরিবর্তন করতে হলে সেটাও সুস্পষ্ট হতে হবে এবং নির্দেশনার মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।

লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনা

লিখিত ও মৌখিক এ দুটি মূলত নির্দেশনা প্রদানের ধরন বা প্রক্রিয়া। অর্থাৎ নির্দেশনার সুস্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নির্দেশনা লিখিত বা মৌখিকভাবে দেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে লিখিত ও মৌখিক নির্দেশনা প্রদানে সুস্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। যখন কোন নির্দেশনা মুখে কথা বলার মাধ্যমে প্রদান করা হয় তাকে মৌখিক নির্দেশনা বলা হয়। আবার যখন কোন নির্দেশনা লিখিতভাবে বা কোন ছবি বা গ্রাফের মাধ্যমে বা শব্দ, ছবি, চিত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার জন্য দেওয়া হয় তখন তাকে লিখিত নির্দেশনা বলে। একটু বড় আকারের বা কোন জটিল বিষয় বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণ করার জন্য লিখিত নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা করে সেমত লিখিত নির্দেশনা প্রদান করলে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সুবিধা হয়। আবার কখনও কখনও লিখিত নির্দেশনাকে অধিকতর স্পষ্ট করার জন্যও মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করতে হয়। শিক্ষার্থীদের মৌখিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য অনেক কৌশল আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কৌশল হলো-

- নির্দেশনা প্রদানের পূর্বে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে বসাতে হবে যাতে মৌখিক নির্দেশনা স্পষ্ট শুনতে পায় এবং নির্দেশনার সহায়ক হিসেবে যা দেখানো হয় তা দেখতে পারে;
- সংক্ষিপ্ত বাক্যে অথবা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নির্দেশনা প্রদান করা;
- ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করে নির্দেশনা প্রদান করা। যেমন- প্রথমত;, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত... সর্বশেষ।
- মৌখিক এবং অমৌখিক ইঙ্গিত বিশ্লেষণ করা;
- শারীরিক অঙ্গভঙ্গির যথাযথ এবং পর্যাপ্ত ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কণ্ঠস্বর উঠানামা করা;
- শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক শোনার আচরণের জন্য তাদেরকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করা।

৭.৫ শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ : ধারণা ও অনুশীলন এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল

শিক্ষার্থীদের মৌখিক প্রশ্নকরণ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কার্যকর নির্দেশনা মৌখিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার জন্য প্রশ্ন করা প্রয়োজন। এই মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থীদের যুক্তি প্রদানের দক্ষতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে। সুগঠিত প্রশ্ন সফল শিক্ষণের একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীকে পাঠের একটি নির্দিষ্ট দিকের ওপর প্রশ্ন করার মাধ্যমে গঠনমূলক মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে পাঠ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট স্তরের কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে পারেন। যথাযথ প্রশ্ন শিখনের প্রসারকে শক্তিশালী করে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। নির্ভরযোগ্য ফলাবর্তনের ওপর নির্ভর করে পাঠে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন করাও শিখন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠের যে কোন পর্যায়ে পাঠের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করেও মৌখিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে, একটি পাঠের কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শিক্ষার্থীদের বুঝতে কঠিন কি না, শিক্ষার্থী সঠিকভাবে প্রেষণা সৃষ্টি হয়েছে কি না, পাঠের গতি খুব দ্রুত কিনা, পাঠের অংশ বিশেষ পুনঃপাঠের প্রয়োজন আছে কিনা, পাঠের আরও ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে কিনা , পাঠ পরিচালনায় অন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা প্রয়োজন বা ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা ইত্যাদি। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর যে পদ্ধতিই ব্যবহার করুন না কেন প্রশ্নকরণের মাধ্যমে ঐ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলপ্রসূতা অনেক বেশি হয় এবং বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য হয়। প্রশ্নকরণ এমন একটি কৌশল যা শ্রেণি কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়। কাজেই শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল জানা অত্যাবশ্যক।

শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নের ধারণা

প্রশ্নকরণ কী, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়- A question is any sentence which has an interrogative form or function". অর্থাৎ প্রশ্নবোধক রূপ অথবা কাজ সংবলিত বাক্যকে প্রশ্ন বলা হয়। শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নকরণ বলতে শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য পরিবহন এবং শিক্ষার্থীরা কী করবে ও কেমন করে করবে তার নির্দেশনার মাধ্যমকে বোঝায়।

প্রশ্নকরণের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

১. শিক্ষার্থী কী জানে না তা জানা;
২. শিক্ষার্থী কী জানে তা জানা;
৩. শিক্ষার্থীকে শিখনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা;
৪. শিক্ষার্থীদের বারবার চর্চা/অনুশীলন করার অভ্যাস গঠন করা;
৫. পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর জোর দেওয়া;
৬. পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা;
৭. শিক্ষার্থীদের জানা বিষয়গুলো ব্যক্ত করতে আগ্রহী করে তোলা;
৮. অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা;
৯. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখনে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা করা;
১০. শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার বিকাশ সাধন করা-

- শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সজ্জিতকরণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা;
- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা;
- কারণ ও ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা;
- পঠনীয় বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা;
- শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটানো;
- অন্যের মতামত/উত্তরের সাথে একমত/ভিন্নমত ব্যক্ত করতে শেখা;
- বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে শেখা।

উত্তম প্রশ্নকরণের ধারণা

উত্তম প্রশ্নকরণ আদর্শ শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কাজেই একজন ভাল শিক্ষককে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। উত্তম প্রশ্নকরণ দক্ষতা থাকলে একজন শিক্ষক তা প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের শিখন মানের উন্নয়ন করতে পারবেন সেইসাথে সহজেই শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকেরও সম্পর্ক উন্নয়ন হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সব প্রশ্নই যে, উত্তম প্রশ্ন হবে একথা বলা যায় না। শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, বিষয়বস্তুর কাঠিন্যতার মাত্রা ও প্রশ্ন করার নীতিমালা মেনে প্রশ্ন করা উত্তম প্রশ্নকরণের শর্ত। শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রে চিন্তন দক্ষতার নিম্নস্তরের প্রশ্ন করেন যা শিক্ষার্থীকে তার স্মৃতি,অনুধাবন ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে উত্তর প্রদান করতে হয়। যেমন-যমুনা সেতুর দৈর্ঘ্য কত? এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ বা কোন নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই। অন্যদিকে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চিন্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সংশ্লেষণ দক্ষতা ও বিচারকরণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান দক্ষতার প্রয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, শ্রেণির সব ধরনের শিক্ষার্থীর জন্য সব সময় এ ধরনের প্রশ্ন করা যায় না। কেননা, নিম্নস্তরের চিন্তন দক্ষতার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের একই সময় দিলে তা যথার্থ হবে না। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার মাত্রাও একই পর্যায়ের নয়। আবার বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার সকল স্তরের অবস্থা যাচাই করার জন্য একই রকম প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়। অতএব একজন শিক্ষক যখন পরিবেশ,পরিস্থিতি ও উত্তম প্রশ্ন করার যথাযথ নিয়ম মেনে বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাইমূলক প্রশ্ন প্রয়োগ করবেন তখন তা-ই হবে উত্তম প্রশ্নকরণ।

শ্রেণিকক্ষে ভালো বা উত্তম প্রশ্নের বিবেচ্য বিষয়

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, প্রশ্ন যেন মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থি না হয়। সে জন্য বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ভালো প্রশ্ন- তথ্যের মূলভাব বহন করে, সুগঠিত ও সহজবোধ্য হয়, শিক্ষক নির্দেশিত বিষয় সম্পর্কিত, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর পূর্ব ও বর্তমান অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত, সুনির্দিষ্ট , অর্থবোধক ও সুনিয়ন্ত্রিত, শিখন ত্বরান্বিত করে, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও সামর্থ্যভুক্ত, উৎসাহব্যঞ্জক, শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের সুযোগ সমৃদ্ধ।

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নকরণের নীতিমালা

- শিক্ষার্থীরা কী জানে বা কতটুকু জানে, শুধু তা জানার জন্য প্রশ্ন না করে সামগ্রিকভাবে পাঠদানের কৌশল হিসেবে প্রশ্ন করা।
- পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রশ্ন হবে স্পষ্ট, সরল ও সুনির্দিষ্ট যেন শিক্ষার্থীরা সহজে তা বুঝতে পারে।
- কোন অবান্তর বা অতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা না করে সরাসরি প্রশ্ন করতে হবে।
- অনিশ্চিত, দ্ব্যর্থবোধক, বিভ্রান্তিমূলক ও বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন প্রশ্ন পরিহার করতে হবে।
- শব্দবাহুল্যের কারণে শিক্ষার্থীরা মূল বিষয় থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তাই এ ধরনের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী সহজে বুঝতে পারে এমন শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হবে।
- ভাল ও উত্তম মানের প্রশ্ন করতে হবে যা শ্রেণির শিখন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করে ও শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ সাধন করে।
- সরাসরি পাঠ্যপুস্তক এর তথ্য বা তত্ত্ব মুখস্থ করে বা ব্যবহার করে উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্নের ও শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার বিকাশে সহায়ক হয় এমন প্রশ্নের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।
- এমন কিছু প্রশ্ন থাকা উচিত যাতে উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীদেরকে পার্থক্য করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার কৌশলসমূহ

কার্যকর প্রশ্নকরণের কৌশলসমূহকে ৫টি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। ক্ষেত্রসমূহ হল-

১. প্রশ্নকরণের জন্য শ্রেণিকে প্রস্তুত করা;
২. প্রশ্ন করার ভঙ্গি বা ধরন;
৩. শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সময় প্রদান;
৪. শিক্ষার্থীকর্তৃক প্রশ্নের উত্তর প্রদান;
৫. শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের উন্নয়ন বা বিকাশ সাধন।

১. **প্রশ্নকরণের জন্য শ্রেণিকে প্রস্তুত করা**

- পাঠ শুরু করার পূর্বে শিক্ষার্থীদের আসন যথাযথভাবে বিন্যাস করতে হবে;
- পাঠ শুরু করার আগে নিশ্চিত করতে হবে যে, শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী শিক্ষককে দেখতে পায় ও শিক্ষকের কথা শুনতে পারে;
- শিক্ষার্থীদের অবিচ্ছেদ্য মনোযোগ ছাড়া পাঠ না আগানো;
- শিক্ষার্থীদের মনোযোগে ছেদ ঘটাতে পারে এমন বস্তু সামগ্রীগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

২.প্রশ্ন করার ভঙ্গি বা ধরন

- প্রশ্নটি সুস্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- সমগ্র শ্রেণির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা। তবে কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষার্থীকে এককভাবেও প্রশ্ন করা যেতে পারে। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করা যেন সকল শিক্ষার্থী সব সময়ে সতর্ক ও পাঠের প্রতি মনোযোগী ও উৎসাহী থাকে;
- প্রথমে শ্রেণির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে একটু সময় বিরতি তারপর যারা হাত তুলবে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নাম ডেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে;
- ডাক নাম বা অস্পষ্ট বাক্যাংশ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে ডাকা উচিত নয়। যদি শ্রেণিতে একাধিক শিক্ষার্থীর একই নাম থাকে সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- তুমি কী উত্তর দিতে চাও না, এমন কথা বলা যাবে না;
- সহজ সরল ভাষায়, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে, আলাপ-আলোচনারত অবস্থায় হাসিমুখে প্রশ্ন করা;
- যে ধরনের প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর নেই বা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই এমন প্রশ্ন এড়িয়ে চলা;
- অমনোযোগী, ক্ষীণ মেধা/পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের নাম ধরে ডাকা, তারপর তাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা;
- অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি (যেমন- একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করা বা সঠিক উত্তর অনেক বার বলা) এড়িয়ে চলতে হবে, যা ধারাবাহিকতায় হস্তক্ষেপ করে ও শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী হতে সহায়তা করে;
- কৌতূহলী প্রশ্ন, চিন্তামূলক প্রশ্ন, দিক নির্দেশনামূলক অগ্রসরমান প্রশ্ন, প্রশ্নের মধ্যে উত্তরের যেন কোন ইঙ্গিত না থাকে এমন প্রশ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা;
- এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন কম করা;
- একসাথে কেবল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, একাধিক নয়;
- প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে একই শব্দের বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করা উচিত;
- তথ্যমূলক এবং চিন্তা উদ্দীপক উভয় ধরনের প্রশ্ন করতে হবে;
- আলঙ্করিক প্রশ্ন এড়িয়ে চলতে হবে।

৩. **শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সময় প্রদান**

- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্ন ও উপযুক্ত উত্তর সম্পর্কে ভাবার জন্য সময় দিতে হবে। প্রশ্ন ও উত্তরের জটিলতা বিবেচনা করে ভাবার সময় বরাদ্দ করা উচিত বা করতে হবে;
- প্রশ্ন ও উত্তর ক্রমাগতভাবে করা যাবে না। একটি প্রশ্নের উত্তরের পর পরবর্তী প্রশ্নের জন্যও সময় দিতে হবে।

৪. **শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রশ্নের উত্তর প্রদান**

- প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে হওয়া উচিত;
- শ্রেণির কেবল কয়েকজন সবল শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এড়িয়ে চলতে হবে। শ্রেণির বিভিন্ন দিকের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা উচিত;
- অধিক জোরে শব্দ করে ও সমস্বরে উত্তর প্রদান নিরুৎসাহিত করতে হবে;
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একটি প্রাণবন্ত শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে এমন সুযোগ দেওয়া;
- সঠিক এবং যথাযথ উত্তর প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণির সকলে শ্রবণযোগ্য মাত্রায় জোরে এবং স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের চিৎকার করে উত্তর প্রদানে অনুমতি প্রদান করা যাবে না;
- আগ্রহী ও অনাগ্রহী উভয় ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে হবে।

৫. **শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের উন্নয়ন বা বিকাশ সাধন**

- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের মাধ্যমে নির্দেশনা ও প্রশ্নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষার্থীদের উত্তরে তথ্যের অপর্যাপ্ততা সমস্যা নির্দেশ করে। সমস্যার মাত্রা এবং ধরন নির্ধারণের জন্য একই প্রশ্ন অন্য শিক্ষার্থীদের করা। যদি উত্তরগুলো অসন্তোষজনক বলে মনে হয় তবে পাঠের কিছু দিক অস্পষ্ট এবং তা পুনরায় শিখানো প্রয়োজন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার জন্য উত্তরের ইঙ্গিত প্রদান করা;
- একই প্রশ্নের উত্তর একজন শিক্ষার্থী না পারলে অন্য যে পারবে বলে সম্মত তাকে জিজ্ঞাসা করা;
- যখন শিক্ষার্থীরা স্পষ্টকরণের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করে তখন অন্য সহপাঠী শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান অতঃপর শিক্ষকের নিজে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

প্রশ্নকরণ প্রক্রিয়াতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ পদ্ধতি

- প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনে;
- প্রশ্নের অর্থ অনুধাবন করে;
- নিজের মনে একটি উত্তর তৈরি করে;
- সঠিক বাক্য গঠন করে উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে;
- একটি সংশোধিত উত্তর তৈরি করে।

শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ অনুশীলন

শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণ অনুশীলনের জন্য শ্রেণির অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দলের একজন পাঠের অংশ বিশেষ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশ্নকরণ অনুশীলন করবেন এবং অন্যরা শিক্ষার্থীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রশ্নকরণের ফলাবর্তন প্রদান করার জন্য একজনকে নির্ধারণ করবেন। ফলাবর্তন প্রদানকারী প্রশ্নকরণের নীতিমালা ও কৌশলের আলোকে পর্যবেক্ষণপূর্বক ফলাবর্তন প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ কিছু বিষয় নিচে দেওয়া হল-

- প্রশ্নের অর্থ ও ভাষা কতটা সহজবোধ্য ছিল?
- প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার কোন স্তরের?
- প্রশ্ন করার পর উত্তর দেওয়ার জন্য কত সময় বিরতি ছিল?
- প্রশ্ন করার সময় প্রশ্নকর্তার অভিব্যক্তি কেমন ছিল?
- উত্তর প্রদানে অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্তকরণে কী কৌশল প্রয়োগ করেছেন?
- অংশগ্রহণকারীগণ শ্রেণি শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালনে কতটা তৎপর ছিলেন?
- প্রশ্নসমূহ পাঠের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল কি না?

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল

একুশ শতকের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করতে চান। উচ্চতর চিন্তন একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা নিয়ে চিন্তা করে। শিক্ষার্থীরা উচ্চতর চিন্তন ব্যবহার করে কেবল মুখস্ত করার পরিবর্তে বিষয়বস্তুর উচ্চস্তরের ধারণা বুঝতে পারে। উচ্চতর চিন্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘটনা বা তথ্য বুঝতে পারে ও অনুমান করতে পারে আবার অন্য ঘটনা বা ধারণার সাথে সংযোগ সাধন করতে পারে ও তুলনা করতে পারে এবং কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উচ্চতর চিন্তন দক্ষতায় পৌঁছাতে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করেন। ফলে শিক্ষার্থী ক্রমশ উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অর্জনে উৎসাহী হয়। আবার শিক্ষক বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এতে করে শিক্ষার্থীরা চিন্তন দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পায়। প্রশ্নকরণসহ শিক্ষক যে সকল প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশে সহায়তা করেন তা হল-

শিখন-শেখানো কৌশলের মাধ্যমে

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা কী তা শিখন-শেখানো কৌশলের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। এমন শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর চিন্তা করার সুযোগ পায়। কীভাবে ভালো মানের প্রশ্ন করতে হয় তা শিক্ষক তাদের দেখাতে পারেন। এটা পরবর্তী কৌশল কী হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

প্রশ্নকরণে উৎসাহিত করা

শ্রেণিকক্ষে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা যে কোন প্রকার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যতীত তাদের সতীর্থদের বা শিক্ষককে নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারে এবং সৃজনশীল হতে স্বাধীনতা অনুভব করে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতে হবে। যদি কোন কারণে শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময় না পাওয়া যায় তবে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তারা নিজেরা কীভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারবে।

ধারণা সংযুক্তকরণ

শিক্ষার্থীদেরকে একটি ধারণার সাথে অন্য একটি ধারণা কীভাবে সংযোগ করতে হয় তা শেখাতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক তাদেরকে শিখাতে পারেন তারা ইতোমধ্যে যা জানে এবং নতুন করে যা শিখছে তার মধ্যে সংযোগ সাধন করা। এই স্তরের চিন্তা শিক্ষার্থীকে একাধিক ধারণার মধ্যে সংযোগ তৈরি করতে শেখাবে যা তাদেরকে ধারণাসমূহ আরও বেশি স্পষ্ট করে বুঝতে সহায়তা করবে। যারফলে তারা আরও উচ্চতর চিন্তনের দিকে ধাবতি হবে।

শিক্ষার্থীদেরকে অনুমান করতে শিখানো

বাস্তব জগতের উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে অনুমান এর ধারণা শিখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার্থীদের আবহাওয়া শিখানোর জন্য তাদেরকে অনুমান করতে বলা যে, যদি গাছপালা না থাকতো তবে আবহাওয়া কেমন হতো?

গ্রাফিক অরগানাইজার ব্যবহার করা

শিক্ষার্থীদের চিন্তা ভাবনা ও ধারণাকে চমৎকারভাবে সাজানোর একটি উপায় হচ্ছে গ্রাফিক অরগানাইজারের ব্যবহার। পাঠের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন ধারণাসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য নানারকম গ্রাফিক অরগানাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। ডায়াগ্রাম বা মাইন্ড ম্যাপ অংকনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সংযোগ সাধন করতে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে শিখে। এটি শিক্ষার্থীদেরকে ধারণার সংযোগের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সমস্যা সমাধান কৌশল শেখানো

সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা ধাপে ধাপে কাজ করার কৌশল শিখে। এই উপায়ে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অনুশীলন হয় যা সমস্যার দ্রুত এবং সহজতর সমাধানে সহায়তা করে। সমস্যা সমাধানের বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরের বিস্তৃতি শেখানো

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উত্তরগুলো বিস্তৃত করতে এবং তারা যা শিখছে তা নিয়ে কথা বলতে হবে । শিক্ষার্থীদেরকে দৃঢ়তার সাথে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের উত্তরগুলো আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এরফলে শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

উচ্চতর স্তরের প্রশ্নকরণ

চিন্তন দক্ষতার স্তরভিত্তিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বেঞ্জামিন ব্লুম কর্তৃক বিভাজিত চিন্তন ক্ষেত্রটি ৬ টি স্তরে বিন্যস্ত। স্তরগুলো হলো– জ্ঞান, অনুধাবন,প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতার বিকাশ ঘটানোই হল উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ। কাজেই শিক্ষককে কেবল নিম্নস্তরের চিন্তন দক্ষতামূলক (জ্ঞান, অনুধান, প্রয়োগ) প্রশ্ন না করে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তরে প্রশ্ন করতে হবে। তাহলেই শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। আবার জ্ঞানমূলক ও সমকেন্দ্রিক প্রশ্নের সাথে সাথে কেন্দ্রচ্যুতি ও মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদেরকে কল্পনা করতে শিখানো

শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উচ্চতর চিন্তনকে প্রসারিত করা যায়। শিক্ষার্থীরা সাধারণত চারপাশে প্রতিনিয়ত যা ঘটছে তা নিয়েই চিন্তা করতে অভ্যস্ত। সর্বক্ষণ চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায় না, অথচ ঘটতে পারে বা ঘটা উচিত এমন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীকে কল্পনা করতে শিখাতে পারলে তার উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অনেক বেশি বিকশিত হবে। শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন শিক্ষক যা করতে পারেন তার একটি উদাহরণ হতে পারে- শিক্ষার্থীদের দেখানো হয় যে, সমভূমি থেকে উচুঁ একটি এলাকা বা টিলাপ্রবণ এলাকা যেখানে বেশ গাছপালা আছে, বাড়িঘর আছে, রাস্তা আছে। তার আশপাশে পর্যাপ্ত জলাভূমি আছে।- এ দৃশ্য দেখানোর পর বা এই তথ্য দেওয়ার পর যদি প্রশ্ন করা হয়-

- দৃশ্যটিতে কী কী ছিল?
- বাড়িঘরগুলো কেমন?
- গাছগুলো কোন ধরনের?

প্রশ্নগুলোর উত্তর উল্লিখিত দৃশ্যের/তথ্যের মধ্যে আছে। শিক্ষার্থী উত্তর জেনেছে, শুধু স্মৃতি হাতড়ে বলতে পারবে। কিন্তু যদি এমন প্রশ্ন করা যায়

- জলাভূমি ও গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করছে-ব্যাখ্যা কর।
- যদি গাছপালা ও পাহাড় না থাকতো তবে জলবায়ু কেমন হতো? ব্যাখ্যা কর।
- এই এলাকাটিতে মাটির তৈরি ঘর থাকার পক্ষে পরিবেশগত উপাদান কীভাবে কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর।

এ প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের ভাবিয়ে তোলে এবং প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দৃশ্যের/ তথ্যের মধ্যে নাই। শিক্ষার্থীকে দিতে হলে তার নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও কল্পনা শক্তি ব্যবহার করতে হবে। যারফলে শিক্ষার্থীর উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশে উৎসাহিতকরণমূলক প্রশ্নের প্রধান লক্ষ্য হ'ল – শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো এবং তাকে তার নিজস্ব মতামতের ওপর ভিত্তি করে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মসচেতন করে গড়ে তোলা।

৭.৬ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন : উন্মুক্ত, বদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন

বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পাঠ থেকে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। শিক্ষার্থীকে এসব জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করানোর জন্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনে যেমন বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়, তেমনি শিখন যাচাই করার জন্য নানা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। শিক্ষার্থীর শিখন যাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের মধ্যে প্রশ্নকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান,দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ে মৌখিক প্রশ্নের ভূমিকা অনন্য। প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা, পূর্বজ্ঞান, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তাছাড়া উপস্থাপিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কী শিখবে, কী অর্জন করবে বা তার কোন ধরনের পরিবর্তন হবে, এ ব্যাপারেও শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয়। কাজেই শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পুরো সময়ব্যাপী একই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করলে একদিকে শ্রেণিকক্ষে একঘেয়েমি ও ক্লান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় আবার অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী ও বিচিত্র দক্ষতা যাচাই করা যায় না। শিখন-শিখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব, সামাজিক গুণাবলি, দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা ও শৃঙ্খলাবোধসহ আরও বহুবিদ দিক বিকাশে সহায়তা করেন। তাই শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশের জন্য শ্রেণি কার্যক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্নের প্রকারভেদ

প্রশ্নকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যায়। প্রথমত: প্রশ্ন দুই প্রকার ঃ

১। বদ্ধ প্রশ্ন(Closed question) এবং

২। উম্মুক্ত প্রশ্ন(Open question)

বদ্ধ প্রশ্ন ও উন্মুক্ত প্রশ্নকে পুনরায় দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে প্রশ্নের এ বিভাজনটি দেখানো হলো-

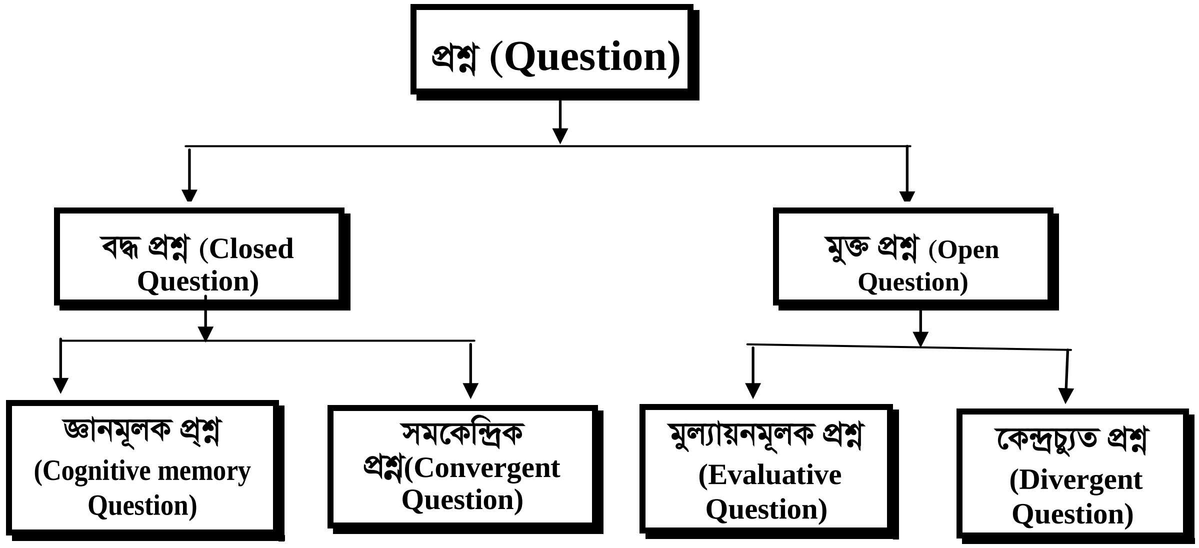

বদ্ধপ্রশ্ন

যে প্রশ্নের একটি মাত্র সঠিক উত্তর থাকে তাকে বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন বলা হয়। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত হ্যাঁ / না বললেই হয় অথবা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হয়। এগুলোকে ইংরেজিতে closed অথবা skinny প্রশ্ন বলা হয়।
বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন দ্বারা স্মৃতির পুনরুদ্রেকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যায় এবং শিখনের পর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা হয়।

কখনও কখনও বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্ন উন্মুক্ত প্রশ্নের রূপ লাভ করতে পারে। বদ্ধ প্রশ্নের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বদ্ধ প্রশ্নের উত্তরের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। যে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে বদ্ধ প্রশ্ন করা হয়, তার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা থাকে। প্রশ্ন বিষয়বস্তুর যেখান থেকে ইচ্ছা করা যাবে না। উত্তরও দিতে হবে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ধারণা থেকে। অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা থাকে না। যদি প্রশ্ন বা উত্তর কোনটারই নির্দিষ্ট কোন সীমা না থাকে তবে তা উন্মুক্ত প্রশ্নের গুণাবলি অর্জন করতে পারে।

বদ্ধ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- উত্তরদাতা সহজে ও দ্রুত উত্তর দিতে পারে;
- বিকল্প উত্তরের সাথে কাঠামোগত আইটেম থাকে;
- উত্তর খুব সহজেই তুলনা করা যায়;
- সকল উত্তরদাতার উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস এক;
- উত্তরদাতা স্মৃতি থেকে তথ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়;
- উত্তরের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নের যথার্থতা নিশ্চিত করে;
- সকল ধরনের মেধার (উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন) শিক্ষার্থীই উত্তর দিতে সক্ষম;
- ভুল উত্তরের সম্ভাবনা থাকে;
- উত্তরের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করা সম্ভব হয় না;
- পাঠের সকল দিক বিবেচনায় নাও আসতে পারে।

বদ্ধ প্রকৃতির প্রশ্নে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে এ প্রশ্ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বদ্ধ প্রশ্নকে দুভাবে ভাগ করা হয়েছে-

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন (Cognitive memory Question)

খ. সমকেন্দ্রিক প্রশ্ন (Convergent Question)

ক. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর স্মৃতি নির্ভর। এ ধরনের প্রশ্নে শিক্ষার্থী জানা কোন তথ্য স্মরণ করে উত্তর দেয়। সম্পূর্ণভাবে জানা তথ্যের জগত থেকে মনে করে শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে পারে সে ধরনের প্রশ্ন এখানে করা হয়। এধরনের প্রশ্নের উত্তরের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় বই, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য রেফারেন্স। মূলত এ প্রশ্নের উত্তর হয় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। যেমন-বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলার নাম কী ? এধরনের প্রশ্ন সাধারণত কে, কী, কোথায়, কেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন- শ্বসন কী? উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কয়টি? সুন্দরবন কোন কোন জেলায় অবস্থিত ?

খ. সমকেন্দ্রিক প্রশ্ন

এধরনের প্রশ্ন বদ্ধ প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত এবং চিন্তামূলক। এ প্রশ্নের একটিই শুদ্ধ উত্তর থাকে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে উত্তর দিতে হয় এবং একটিই সঠিক উত্তর থাকে। প্রদত্ত তথ্যের বা মনে করা তথ্যের বিশ্লেষণ ও একত্রিকরণকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রশ্নই হচ্ছে সমকেন্দ্রিক প্রশ্ন। সমকেন্দ্রিক প্রশ্নের পরিসর জ্ঞানমূলক প্রশ্নের চেয়ে একটু বেশি। ব্যাখ্যা করা, সম্পর্কের বিবরণ দেওয়া, পার্থক্য করা ও তুলনা করার জন্য সমকেন্দ্রিক প্রশ্ন করা হয়। এ ধরনের প্রশ্নে সাধারণত কেন, কীভাবে, কী প্রক্রিয়ায় ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন: আবহাওয়া ও জলবায়ুর দু'টি পার্থক্য বল।

উন্মুক্ত প্রশ্ন

যে প্রশ্ন শিক্ষার্থীর উচ্চতর ও জটিল চিন্তন বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে উন্মুক্ত প্রশ্ন বা মুক্ত প্রশ্ন বলে। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে অনুসন্ধান কাজ জোরালো করা হয়। উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে নতুন কিছু খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালানো হয় । ইংরেজিতে এই প্রকারের প্রশ্নকে Open ended প্রশ্ন বলা হয়।

শিক্ষার্থী যখন কোন বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে, তখন তাকে জটিল প্রকৃতির চিন্তা করতে হয়। বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে শিক্ষার্থী বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে, সেগুলোর পারস্পারিক সম্মন্ধ অনুযায়ী মিল করে এবং এভাবে সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে সে উচ্চতর চিন্তা করার দক্ষতা অর্জন করে ও সুনির্দিষ্ট কাঠামোয় উত্তর প্রস্তুত করে। উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সঞ্চিত হয়,অনেক বেশি ব্যক্তিগত উত্তরের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এর ফলে আলোচনা বা প্রশ্নোত্তরের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পাঠ আরম্ভ করতে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রশ্ন করতে পারেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের নিকট কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর প্রত্যাশা করেন না। এ ধরনের প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর উৎসাহ সঞ্চার করা, তাদের মধ্যে পাঠ সংক্রান্ত তথ্যের প্রতি চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি করা।

উন্মুক্ত প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

- উত্তরদাতা নিজস্ব শব্দ ব্যবহার করে উত্তর প্রদান করতে পারে;
- একাধিক সম্ভাব্য / সঠিক উত্তর হতে পারে;
- উত্তরদাতার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করতে পারে;
- উত্তরাদাতা ইচ্ছামত উত্তরকে গুণান্বিত ও পরিশীলিত করতে পারে;
- আবেগ উপভোগের বিষয়গুলোতে অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ থাকে;
- বিক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া যেতে পারে;
- শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তির গভীরতা ও স্বচ্ছতার প্রকাশ ঘটে;
- শিক্ষার্থীভেদে উত্তরের গভীরতা ভিন্ন হতে পারে;
- উত্তর প্রস্তুত করতে অধিক সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়;
- যুক্তিহীন উত্তর আসার সম্ভাবনা থাকে;
- অমনোযোগী বা অলস প্রকৃতির শিক্ষার্থী এই ধরনের প্রশ্নে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না;
- অন্তর্মুখী শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে সংকোচবোধ করতে পারে।

উম্মুক্ত প্রশ্নের প্রকারভেদ

উন্মুক্ত প্রশ্ন দুই ধরনের। যথা–

ক. **কেন্দ্রচ্যুতি প্রশ্ন (Divergent Question)**

যে প্রশ্নের উত্তর সুনির্দিষ্ট নয়, শিক্ষার্থী চিন্তা ভাবনা করে ও নিজের মত অনুসারে উত্তর দিতে পারে তাকে কেন্দ্রচ্যুতি প্রশ্ন বলে। এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভা বিকশিত হয়। যেমন-দুর্যোগ মোকাবেলায় তোমার এলাকায় কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার? বন্যা সমস্যা মোকাবেলায় সহপাঠীদের সমন্বয়ে তোমরা কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পার? বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে তোমার ভূমিকা কী হবে ?

খ. **মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন (Evaluative Question)**

যে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের মূল্যায়ন করতে শেখে তাকে মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন বলে। এ প্রশ্নের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান, যুক্তি প্রদান, সিদ্ধান্ত দেওয়া, সুপারিশ করা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর পরিপূরক। যেমন- 'জলবায়ুর ওপর কৃষিজ সম্পদ নির্ভরশীল' মূল্যায়ন করুন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যাকে প্রধান অন্তরায় ধরা হয় কেন ? আমাদের দেশের শিল্পোন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা কী ?

বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন

বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এ প্রক্রিয়ার প্রধান চালিকা শক্তি। শিক্ষার্থীরা শিখনের জন্য পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার সুযোগ পায়। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের এধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

বেঞ্জামিন ব্লুম এর ট্যাক্সোনমি অনুসারে শিখন উদ্দেশ্যকে প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রকে আবার উপ-ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখনযাচাই করা হয়। এই শিখনযাচাইয়ের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় তাদের জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানের অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ,

সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি সব স্তর থেকেই প্রশ্ন করা হয়। বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন হিসেবে শ্রেণি শিক্ষণে কেবল প্রধান ক্ষেত্রসমূহ নয় উপক্ষেত্রসমূহ অনুসরণ করেও প্রশ্ন করা হয়। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ ধরে রাখার জন্য শিক্ষককে বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করতে হয়।

মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষক সাধারণত যেসকল কৌশল অবলম্বন করেন তা হল–

- অর্থপূর্ণভাবে সমগ্র পাঠকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা;
- প্রতিটি অংশ থেকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন নির্বাচন করা;
- শিক্ষার্থীর বহুমুখী বিকাশের উদ্দেশ্যে বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করার দিকে খেয়াল রাখা;
- প্রশ্ন করার ফাঁকে বিষয়বস্তুর ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান;
- শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও প্রবণতার প্রতি সতর্ক থেকে প্রশ্ন করা;
- প্রশ্ন করার কৌশল যেমন- কণ্ঠস্বর, বাক্য, শব্দ, বিশেষ শব্দের প্রতি জোর দেওয়া, সময়, আমন্ত্রণ কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন থাকা;
- শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান;
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহ প্রদান;
- উত্তর পাওয়ার পর যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার জন্য দু'টি অনুসরণীয় পদক্ষেপ উল্লেখ করা যায়,

- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন(Probing Question)
- মিথস্ক্রিয়া স্থানান্তর (Shifting interaction)

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নকরণ(Probing Question)

বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে সামগ্রিক তথ্য পরিবেশন করে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন করা তাকে অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন বলে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পুর্ণাঙ্গ উত্তর বের করে আনা হয়। সে কারণে প্রয়োজন সাপেক্ষে মূল প্রশ্নকে ছোট ছোট প্রশ্নে বিভক্ত করা হয়। অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থী যদি পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে না পারে তখন প্রয়োজনবোধে শিক্ষক প্রশ্নটিকে ছোট অংশে ভাঙ্গেন, কোন মতেই তিনি শিক্ষার্থীর ''আমি জানি না" উত্তর গ্রহণ করেন না। Probing-এর অর্থ হল প্রশ্ন করে করে বিষয়বস্তুর সামগ্রিক তথ্য শিক্ষার্থীর উত্তর থেকে ক্রমশঃ বের করে নিয়ে আসা।যেমন-জোয়ার ভাটার কারণ কী?

মিথস্ক্রিয়া স্থানান্তর(Shifting interaction)

এই কৌশলের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ধারণা এক শিক্ষার্থী থেকে অন্য এক শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। প্রথম শিক্ষার্থী যদি সঠিক উত্তর দিতে না পারে তখন শিক্ষক তাকে ভিন্নভাবে অর্থাৎ সহজ করে প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করেন। এভাবে কয়েকবার প্রশ্ন করার পর যদি শিক্ষার্থী উত্তর দিতে অসমর্থ হয়, তখন একই প্রশ্ন তিনি অন্য শিক্ষাথীকে করেন এবং পূর্বের শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিতে বলেন। এই প্রক্রিয়ায় শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমশঃ তথ্য সঞ্চালিত হতে থাকে এবং প্রশ্নোত্তরের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পারিক আদান-প্রদান চলতে থাকে। ফলে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং একইসাথে মনোযোগ দিতে পারে। যেমন, শিক্ষক নিম্নোক্ত প্রশ্ন করতে পারেন

বায়ুদূষণের প্রধান প্রধান কারণ কী ?

শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে না পারে, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন,

বায়ু কীভাবে দূষিত হয় তার একটি কারণ বল।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য তথ্যের অংশবিশেষ মনে করিয়ে দিতে পারেন, এভাবে তার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর আদায় করবেন।

৭.৭ বেঞ্জামিন ব্লুমের শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাস

বেঞ্জামিন ব্লুম (Benjamin S. Bloom)

২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

বেঞ্জামিন ব্লুম একজন বিশ্ব বিখ্যাত মার্কিন অধ্যাপক এবং শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী। তিনি ১৯১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার পেন্সিলভানিয়া অঙ্গ রাজ্যের ল্যান্ডসফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা বোর্ডের ষ্টাফ মেম্বার নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি শিকাগো শিক্ষা বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান এবং ১৯৭০ সালে চার্লস এইচ.সুইফট-এ বিশিষ্ট সার্ভিস অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ব্লম ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

চিত্র ৯: বেঞ্জামিন ব্লুম

ব্লমের তত্ত্ব (Blooms Theory)

শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের কার্যকারিতার প্রতি নিবন্ধ করাকেই ব্লুমসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা যেতে পারে। চিন্তন জটিলতা অনুযায়ী শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগুলো সংগঠিত করার প্রতি তিনি মনোযোগ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাই এবং শিক্ষাগত চর্চার ফলাফল নির্ধারণের জন্য যাতে পরীক্ষাকে অধিক নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির এমন একটি সংঘটন বা অনুক্রম (Hierarchy) নির্ধারণ করা যায়। এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের ফলাফলের মাধ্যমে কেবল মূল্যযাচাই কাজ অর্থাৎ অভীক্ষা প্রণয়নের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নয় বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য তৈরির কাঠামোও প্রদান করে। উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য যাতে সংগতিপূর্ণভাবে বোঝা যায় সেরকম একটি প্রয়োজনীয় টুল সরবরাহ করতে ব্লম আগ্রহী ছিলেন। ব্লুম শিক্ষার উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাসের বাইরেও শিক্ষায় অনেক অবদান রাখেন। তিনি শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও তার বিকাশের ওপরও কাজ করেন। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণায় বেশি মনোযোগী ছিলেন। দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল হিসেবে তার 'শিখন তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন যা ব্লুমের টেক্সোনমি হিসেবে বর্তমান বিশ্বে বহুল অনুসৃত এবং জনপ্রিয়।

বেঞ্জামিন ব্লুম ও তার টেক্সোনমি

বেঞ্জামিন ব্লুম তাঁর শিখন তত্ত্বে একজন শিক্ষার্থী কী শিখবে এবং শিক্ষা শেষে কী করবে, তার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্ট করেছেন। শিখনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম একটি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিযুক্তভাবে প্রথমবারের মত ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বেঞ্জামিন ব্লুম। ১৯৫৬ সালে তিনি টেক্সোনমি শিরোনামে তার শিখন তত্ত্বটির ধারণা ব্যক্ত করেন। পঞ্চাশের দশকে একদল শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে বেঞ্জামিন ব্লুম, মানব শিশুর শিখনের স্তরসমূহকে সুনির্দিষ্টকরণ এবং শ্রেণি বিনস্তকরণের জন্য গবেষণামূলক কর্মপত্র তৈরির কাজ করেন। প্রচেষ্টার ফসল হলো শিখনের প্রধান ৩টি ক্ষেত্রের উপরের বিশ্লেষিত রূপ যা ব্লুমের টেক্সোনমি হিসেবে পরিচিত। তিনি চূড়ান্তভাবে প্রস্তাব করেন যে, যে কোন দেয় কাজ তিনটি মনোবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের একটির অনুকূলে যাবে। ক্ষেত্র তিনটি হচ্ছে, চিন্তন, আবেগ বা অনুভূতি ও মনোপেশীজ। ব্লুমের টেক্সোনমিতে শিখন উদ্দেশ্যসমূহকে ৩টি পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কযুক্ত স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। তিনি শিখনের উদ্দেশ্যসমূহকে ৩টি ক্ষেত্রে ভাগ করেছেন-

১.চিন্তন/ মননশীলতার ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

২. অনুভূতিমূলক বা আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain)

৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

১.চিন্তন/ মননশীলতার ক্ষেত্র (Cognitive Domain)

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয় যাতে স্মরণ, চিন্তন এবং যুক্তির প্রয়োজন হয় ।চিন্তন ক্ষেত্রের মধ্যে আছে জ্ঞান এবং এর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা। এ ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বৌদ্ধিক বিকাশ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। চিন্তন ক্ষেত্রটি জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত। ব্লুম আবার চিন্তন ক্ষেত্রকে ৬টি উপক্ষেত্রে বিভক্ত করেন। সেগুলো হলো-জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। এ ৬ টি উপক্ষেত্রকে পদসোপানিক আকারে সাজানো হয়েছে এবং তা সহজ থেকে কঠিনতম প্রক্রিয়ায়।

২. অনুভূতিমূলক বা আবেগিক ক্ষেত্র (Affective Domain)

এক্ষেত্রে উপলব্ধি, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, অনুধাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র বলতে মানুষের আবেগ প্রকাশের ধরনকে বুঝায়। যেমন- অনুভব, মূল্যবোধ, আবেগ, প্রেষণা ও মনোভঙ্গি।

৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain)

এক্ষেত্রে মন ও পেশী সঞ্চালনী শৈলী ও অনুধাবন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়। হাতে-কলমে কাজ করা অথবা শারীরিক দক্ষতা (skills) এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তু / ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও মূল্যমান appreciation বা প্রশংসামূলক, উচ্ছ্বাস ও আগ্রহ প্রকাশ করে। মনোপেশীজ ক্ষেত্রেরও সহজ থেকে জটিলতর বিভক্তি আছে। মনোপেশীজ ক্ষেত্রে, শারীরিক দক্ষতা অর্জনকে কেন্দ্র করে যা কিছু আবর্তিত হয় তাকেই বুঝায়। যেমন- নড়া-চড়া, সমন্বয়সাধন, প্রাধান্য বিস্তারকরণ। এসব দক্ষতা অর্জনে অনুশীলন দরকার হয় এবং গতি ও সক্ষমতার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়।

সাধারণ শ্রেণিকরণের মত ব্লুমস ট্যাক্সোনোমির উদ্দেশ্যের ধাপ উঁচু থেকে নিচু দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ উঁচু স্তরের শিখন নিচু স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এজন্য ক্ষেত্রগুলোর আবার কতগুলো উপক্ষেত্র আছে যা ব্যক্তির বিকাশে সহজ থেকে জটিল দিকে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীর অর্জনের নির্দিষ্ট স্তর থেকে প্রশ্ন করার জন্য এই শ্রেণিকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

চিন্তন ক্ষেত্র (Cognative Domain)

জ্ঞান, মানসিক দক্ষতা ও তার প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদি চিন্তন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত । সাধারণত একজন শিক্ষক শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ প্রশ্ন চিন্তন ক্ষেত্রের উপস্তর জ্ঞান থেকে করেন। শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশে এই জ্ঞান স্তরের সাথে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন করা প্রয়োজন। উচ্চতর স্তরের চিন্তনমূলক প্রশ্ন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করে। ব্লুমস ট্যাক্সোনমির চিন্তন ক্ষেত্রে নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তরে চিন্তন অগ্রসর হয়। এই চিন্তন ক্ষেত্রকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

(ক) জ্ঞান (Knowledge)

পূর্বে পঠিত কোন বিষয় স্মরণ করা, কোন তথ্য মনে রাখা, কোন প্রক্রিয়া জানা ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে শেখা কোন বিষয়বস্তু থেকে সংজ্ঞা, ধারণা, নীতি, সূত্র ইত্যাদি স্মরণ করা। যেমন, ঢাকার দ্রাঘিমা কত? বিশেষ্য পদ কাকে বলে ? দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কোষ বিভাজনের ধাপগুলো কী? বাজার কাকে বলে?

(খ) উপলব্ধি বা অনুধাবন(Comprehension)

কোন কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা এবং নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারা, বিন্যস্ত করতে পারা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। যে সংজ্ঞা, ধারণা বা নীতি শিক্ষার্থী স্মরণ করেছে, তার অর্থ অনুধাবন করা। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজ ভাষায় বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য উল্লেখ করতে পারে বা উদাহরণ দিতে পারে। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মূল্যবোধের হানি ঘটে কীভাবে- ব্যাখ্যা কর। উদাহরণের সাহায্যে অব্যয় পদ বুঝিয়ে দাও। মানুষের পরিপাক ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। বায়ুচাপের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

(গ) প্রয়োগ (Application)

বুঝে শুনে কোন অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল সুনির্দিষ্ট বা বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগ করতে পারা। কোন তথ্য সম্পর্কিত নীতি, সূত্র, আইন, তত্ত্ব, ধারণা বা নিয়ম অন্য কোন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে বা সমস্যা সমাধানে বা সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ব্যবহার করা। যেমন- প্রাণিকূল বেচেঁ থাকার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন হয় কেন? বাজারে চাল ও তেলের মূল্য বৃদ্ধি সাপেক্ষে চাহিদা ও সরবরাহ সূত্রের প্রভাব বর্ণনা কর। বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে খরাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত কর। শিলা ও খনিজের পার্থক্য নিরূপণ কর।

(ঘ) বিশ্লেষণ (Analysis)

কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশ জানা এবং তা ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করতে পারা। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত উপাদানগুলোকে তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন করা যেন তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। যেমন, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। পল্লী কবি হিসেবে জসীম উদ্দীন-এর কবি প্রতিভার বর্ণনা দাও। উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনকারী বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) সংশ্লেষণ (Synthesis)

কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলোকে সংযোজন/সমন্বয় করতে পারা। কোন বিষয়বস্তুর বিভিন্ন উপাদানের সংগঠনে ভিন্ন আঙ্গিকে নতুন কাঠামো গড়ে তোলা। যেমন, জনগণকে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? স্ফটিকীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে বাড়িতে লবণ তৈরি করবে বর্ণনা কর।

(চ) মূল্যায়ন (Evaluation)

কোন বিষয়, ধারণা বা তত্ত্বের গুণাগুণ সঠিকভাবে বিচার করতে পারা। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন, অতিরিক্ত জনসংখ্যাই একটি দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার-এ প্রসঙ্গে তোমার মতামত দাও। বাল্যবিবাহে পারিবারিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচারিত নাটকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

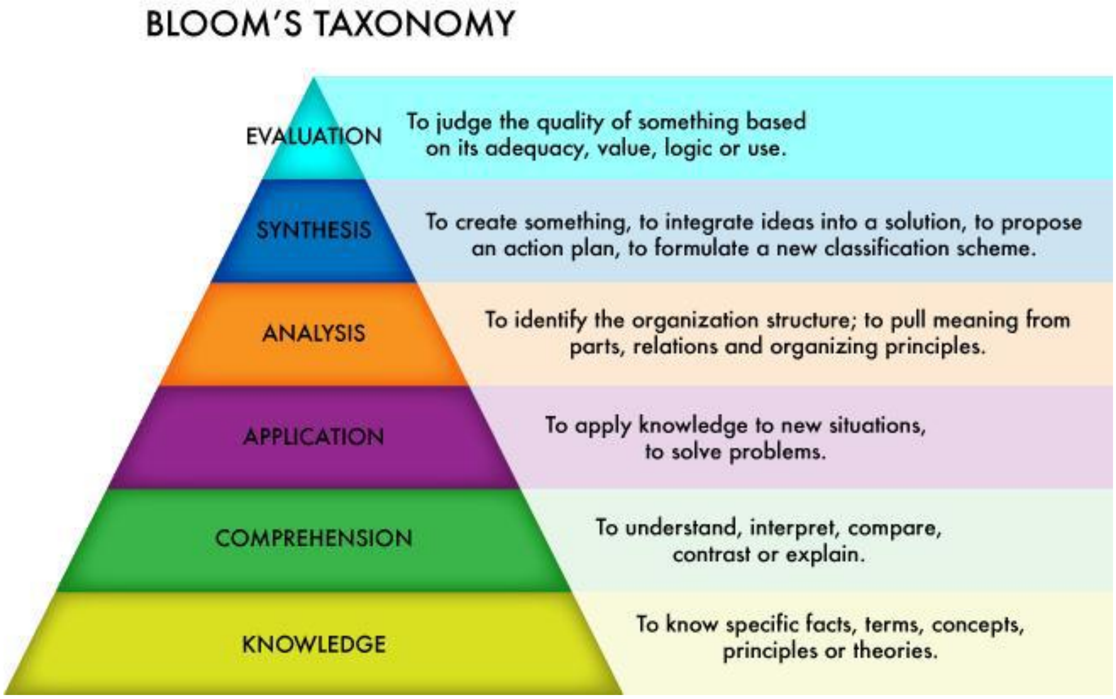

চিত্র ১০ : ব্লুমস টেক্সোনমি (চিন্তন ক্ষেত্র)

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র (Affective Domain)

এই ক্ষেত্রটি কোন বিষয় গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ, অপছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা ইত্যাদি নির্দেশ করা। এই ক্ষেত্রকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলঃ

(ক) গ্রহণ করা (Receiving)

কোন বিষয়, বক্তব্য, বাণী, ঘটনা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা। শ্রদ্ধা সহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা। কোন উদ্দীপকের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব অনুভব করে তাকে না এড়িয়ে গ্রহণেচ্ছা জাগ্রত হলে তার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, ইহাই গ্রহণ প্রক্রিয়া। মূলত কোন বিষয়ের প্রতি সচেতন হওয়ার পর গ্রহণের ইচ্ছা জাগরিত হলেই প্রথমে তার কোন না কোন অংশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হবে এবং সময়ান্তরে এক অংশ থেকে অন্য অংশে মনোযোগ স্থানান্তরিত হবে। এটিই অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের গ্রহণ পর্যায়।

(খ) প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা বা সাড়া প্রদান (Responding)

কোন বিষয়, বস্তু, ঘটনা সম্পর্কে ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। কোন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। কোন বিষয় গ্রহণ তথা মনোযোগের পরবর্তী স্তর হল সাড়া প্রদান। সাড়া প্রদানকে তিনটি উপস্তরে বা প্রক্রিয়ায় ভাগ করা হয়। যথা- সাড়া প্রদানে মৌন সম্মতি, স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও তৃপ্তি। কোন বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হওয়া হল সাড়া প্রদানের প্রথম পর্যায় বা মৌন সম্মতি পর্যায়। বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত পড়াশোনার মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়া হল দ্বিতীয় পর্যায়। বিভিন্ন লোকের সাথে কোন বিষয়ের আলোচনায় আনন্দ পাওয়া বা কোন বিষয়ে পড়াশোনায় আনন্দ পাওয়া ইত্যাদি হল তৃপ্তি পর্যায়।

(গ) মূল্যবিচার বা গুরুত্ব প্রদান (Valuing)

কোন ঘটনা, বিষয়, কার্যক্রমের গুণ বিচার বিশ্লেষণ করার পর গ্রহণযোগ্য হলে এর প্রতি অনুকূল আচরণ করা। কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন- ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসেবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।

(ঘ) সংগঠিত করা (Organizing)

সংগঠন হল বিভিন্ন মূল্যবোধের বৈরিতা দূর করে সকলকে একত্রিত করা। বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন-স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা। শিক্ষার্থী যখন পরপর কিছু মূল্য আত্মস্থ করে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যার সাথে একাধিক মূল্য সংশ্লিষ্ট হয়। তাই প্রয়োজন হয় (১) মূল্যসমূহকে একটি শৃঙ্খলায় বা প্রক্রিয়ায় সংগঠিত করা; (২) মূল্যসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং (৩) প্রধান এবং পরিব্যাপ্ত মূল্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করা।

(ঙ) মূল্যবোধভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবজাতকরণ(Characterizing)

প্রত্যেকের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে যা তার আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। যখন কোন বিশ্বাস আত্মস্থ হয়ে ব্যক্তির নিকট স্থায়ী আসন পেতে নেয় এবং সংশ্লিষ্ট আচরণ স্বভাবজাত হয়ে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আচরণটি ঘটে যায় যদি এ বিষয়ে কোন বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বা ভয়ভীতি না থাকে। বিশ্বাস থেকে স্বভাবজাত আচরণের স্বতঃস্ফূর্ততা এমন পর্যায়েও পৌঁছায় যে, কোন ভয়ভীতি বা দ্বন্দ্বও তাকে সেরূপ আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়।

মনোপেশীজ ক্ষেত্র(Psychomotor Domain)

যে কাজ মন ও পেশীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় তাকে মনোপেশীজ ক্ষেত্র বলা যায়। যেমন– (১) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ, (২) কৃষি শিক্ষায় হালচাষ দিয়ে জমি তৈরি, (৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষায়– সেলাই মেশিন মেরামত করা ইত্যাদি। এর সাথে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া বা গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরনের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশল এর মাধ্যমে এই দক্ষতা পরিমাপ করা যায়। মনোপেশীজ ক্ষেত্রকে পাঁচটি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) অনুকরণ (Imitation)

যে সকল কাজ করতে গিয়ে পেশীর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না। কেবল মন কিংবা পেশীর দ্বারা করা সম্ভব হয়। অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন-অনুকরণ করে টাইপ করা বা চিত্র বা ছবি আঁকা। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।

(খ) অনুচালন বা হাতের কাজ (Manipulation)

আদেশ অনুসারে অথবা নির্দেশনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা। নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন- প্রশিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে টেক্সট লেখা অনুশীলন করে ডকুমেন্ট টাইপ করা।

(গ) খুটিনাটি কাজ নিখুঁতভাবে করা বা নিখুঁতায়ন(Precision)

দ্রুত ও নিখুঁতভাবে কাজ সম্পন্ন করা। কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন-কম্পিউটারে কোন ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।

(ঘ) গ্রন্থনা (Articulation)

বিভিন্ন কার্যাদির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় সাধন করা। একই সিরিজের বা একই সেটের বা একই ধরনের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট টাইপ করা ও প্রিন্ট করা (নির্ভুলভাবে টাইপ করা ও এলাইমেন্ট ঠিক করা)।

(ঙ) স্বাভাবিকরণ(Naturalization)

প্রতিনিয়ত অনুশীলন করতে করতে স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে তা স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। অর্থাৎ কোনো কাজে এমন উচ্চ মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার দরকার হয় না।

৭.৮ ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন বিবেচনা

ব্লুম টেক্সোনমির চিন্তন দক্ষতার ছয়টি উপক্ষেত্রকে বিবেচনা করেই সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এই ছয়টি উপক্ষেত্রকে ৪টি দক্ষতার আওতায় এনে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নিম্নের আলোচনায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নের ধারণা

এক কথায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তা-ই সৃজনশীল প্রশ্ন। অন্যকথায় শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের জন্য বেঞ্জামিন ব্লুম এর টেক্সোনমি অনুযায়ী কয়েকটি প্রশ্ন ও একটি দৃশ্যকল্প সমন্বয়ে যে প্রশ্ন করা হয় সেটাই সৃজনশীল প্রশ্ন।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। উদ্দীপক হিসেবে একটি দৃশ্যকল্প বা ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করা হয়। দৃশ্যকল্প হিসেবে চিত্র ,ডায়াগ্রাম, সারণি ও চার্ট ব্যবহার করা যায়। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে থাকে।

একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকে।

সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে চিন্তন দক্ষতার উপস্তরসমূহকে (ব্লুম টেক্সোনমির ০৬ টি উপস্তরকে) ০৪ টি উপস্তরে কাঠিন্যের মাত্রা অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. জ্ঞান
২. অনুধাবন
৩. প্রয়োগ
৪. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা (বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)

১. জ্ঞান

এটি হলো চিন্তন দক্ষতার সর্বনিম্নস্তর। এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে জানা কোনো কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো- সাধারণ শব্দসমূহ, বিশেষ তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা এবং নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। জ্ঞান স্তরের প্রশ্ন তৈরি করা সহজ। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।

২. অনুধাবন

অনুধাবন হল কোনো বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। তা হতে পারে তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি বুঝতে পারা। বুঝতে পারলে ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ করা যায়। বুঝতে পারলেই মৌখিকভাবে এবং প্রতীক, গ্রাফ, সারণি ও চিত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জ্ঞান স্তরের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন। শিখন এবং মূল্যায়নের জন্য অনুধাবন স্তরের প্রশ্নের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

৩. প্রয়োগ

প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার দক্ষতা। আইন, বিধি, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে। প্রয়োগ দক্ষতা স্তরে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে চার্ট ও গ্রাফ তৈরি করা, পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার ও প্রদর্শন এবং হিসাব-নিকাশ করা।

৪. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা

উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা,যুক্তি)। কোনো সমগ্র বিষয়, ধারণা বা বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন উপাদান বা অংশে বিভক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা। বিষয় সংশ্লিষ্ট একগুচ্ছ তথ্য/উপাদান/অংশ সংগঠিত এবং সমগ্রতে রূপান্তর করা। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা ধারণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটি কাঠামো বা নকশা তৈরি করা। কোনো মতামত, কাজ, সমাধান এবং পদ্ধতির মূল্য বিচার করা। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য বা তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর বন্টন

অংশ/ প্রশ্ন	স্তর	বরাদ্দকৃত নম্বর
ক	জ্ঞান	০১
খ	অনুধাবন	০২
গ	প্রয়োগ	০৩
ঘ	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা	০৪
মোট:		১০

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি **(ক) জ্ঞান স্তরের যা সহজ ও নিতান্তই স্মৃতিনির্ভর**। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ **(খ) হল অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন।** এর মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর বিবরণ দেওয়া থাকে। এ ধরনের প্রশ্নে সরাসরি পাঠ্যবইয়ের অনুরূপ বিবরণ জানতে চাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিতে বলা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি **(গ) হল প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন।** সৃজনশীল প্রশ্নের এ অংশটি ভালোমানের নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপকের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ উদ্দীপক যদি খুব মানসম্পন্ন হয় তবে প্রয়োগ দক্ষতার প্রশ্নটি প্রণয়ন করা সম্ভব। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। পাঠ্যপুস্তকের তথ্য এবং এর অনুধাবন উদ্দীপকে বর্ণিত নতুন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করবে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা হবে এবং সেটা নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ করার ক্ষমতাই প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য ৩ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি **(ঘ) হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন**। এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিচার-বিবেচনা করার দক্ষতা, কোনো বিষয় বা ঘটনা বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে শিক্ষার্থী তার বিচার-বিশ্লেষণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মূল্যায়নের দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাবে। প্রশ্নের চতুর্থ অংশটির জন্য ৪ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

উদ্দীপকের ধারণা

উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে। যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করে বা ব্যবহার করে একটি নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন , সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মূল্যায়ন করতে পারে। উদ্দীপকে যে সকল উপাদান থাকতে পারে তা হচ্ছে, বিষয় সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ,চিত্র, মানচিত্র, সারণি, লেখচিত্র, ছবি, উদ্ধৃতি ও মন্তব্য ইত্যাদি। উদ্দীপক তৈরিতে উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, পত্র পত্রিকা, রেফারেন্স বই, প্রবন্ধ, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত তথ্য বা ঘটনা , প্রামান্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন চিত্র ইত্যাদি।

উদ্দীপকের উপযোগিতা ও নির্দেশনা

সৃজনশীল প্রশ্ন দক্ষতার স্তর অনুযায়ী ও উদ্দীপকের আলোকে প্রণয়ন করা হয়। কাজেই উদ্দীপক এড়িয়ে গিয়ে যেন শিক্ষার্থীরা সকল স্তরের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আবার উদ্দীপকের দৈর্ঘ্য যেন যথাযথ হয় তার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এসব দিক বিবেচনায় রেখে উদ্দীপকের উপযোগিতা ও নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়নে নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে-

১. যে বিষয়বস্তুকে নিয়ে প্রশ্ন করবেন তা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
২. গুরুত্বহীন(Trivial) বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা যাবে না।
৩. প্রশ্নের শুরুতে একটি মৌলিক, আকর্ষণীয় ও সংক্ষিপ্ত উদ্দীপক তৈরি করতে হবে। উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না। তবে উদ্দীপক অবশ্যই শিক্ষাক্রম/সিলেবাস/পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত হতে হবে।
৪. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়স্তুর আলোকেই চারটি প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) তৈরি করতে হবে।
৫. উদ্দীপকে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকবে না। বরং উদ্দীপক শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে।
৬. উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘ক’ ও ‘খ’ অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।
৭. উদ্দীপক বিবেচনায় না রেখে ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশের উত্তর দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হবে না।
৮. একটি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতিটি অংশ তার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী হতে হবে।
৯. একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) উদ্দীপকের আলোকে গঠিত হলেও অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট দক্ষতা পরিমাপের উপযোগী নাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক/প্রশ্ন সংশোধনের প্রয়োজন হয়।
১০. একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশ (‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ও ‘ঘ’ অংশ) এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন বিভিন্ন অংশের উত্তরে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
১১. একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরেও পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
১২. একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ বা আংশিক উত্তরে (পূর্ণ বা আংশিক উত্তর বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে) নম্বর প্রদান কী হবে তা প্রশ্ন প্রণয়নের সময় আগাম বিবেচনা করে নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ঠিক করে নিতে হয়।
১৩. সৃজনশীল প্রশ্নের কোনো অংশের উত্তর প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্থাৎ তথ্য, তত্ত্ব, ধারণা, সূত্র ইত্যাদি অবশ্যই শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে।
১৪. সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরির সময়ে কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে। সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর তৈরি করার সময়ে প্রশ্নের সবলতা ও দুর্বলতা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) দৃশ্যমান হবে এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন সংশোধন করতে হবে।

ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ		
রমিজ মিয়া আলু উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করেন। আলুর দাম যখন ১৫ টাকা তখন তিনি ৩০ কেজি যোগান দিতে ইচ্ছুক। দাম ১৮ টাকা হলে তিনি ৪৫ কেজি যোগান দিতে ইচ্ছুক।		
ক. অর্থনীতিতে যোগান কাকে বলে?	জ্ঞান	১
খ. অর্থনৈতিক দ্রব্যের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।	অনুধাবন	২
গ. উপরের তথ্যের ভিত্তিতে আলুর যোগান রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর	প্রয়োগ	৩
ঘ. অংকিত যোগান রেখার আকৃতির সাথে চাহিদা রেখার আকৃতির পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা	৪

ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও		
আশিক ৫,০০০০০/- টাকা নিয়ে একটি খাবারের দোকান দেন। পুঁজির অভাবে চাহিদা থাকার পরও তিনি দোকানের শাখা খুলতে পারছিলেন না । হঠাৎ এক অগ্নিকান্ডে তার দোকানের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং দেনা পরিশোধের পর তিনি পর্যাপ্ত পুঁজি ব্যবসায় সরবরাহ করতে পারছিলেন না। তখন আশিকের এক বন্ধু তার ব্যবসায় পুনরায় চালুর জন্য লিখিত সমঝোতার মাধ্যমে পুঁজি সরবরাহ করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে ঢাকার কয়েকটি প্রসিদ্ধ এলাকায় তারা শাখা খোলেন। এক পর্যায়ে তাদের ব্যবসায় লোকসান হয়। আশিক ও তার বন্ধু তাদের ব্যবসায়িক দেনা পরিশোধ করার পর আশিক দেখেন যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজে আরেকটি ব্যবসা শুরু করতে সক্ষম।		
ক. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরই ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারে?	জ্ঞান	১
খ. স্থায়ী মূলধন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।	অনুধাবন	২
গ. আশিকের প্রথম পর্যায়ের সাংগঠনিক ব্যবসায়ের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।	প্রয়োগ	৩
ঘ. বন্ধুর সাথে আশিকের ব্যবসায় করার সিদ্ধান্তটি কি সঠিক ছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও ।	উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা	৪

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র মডারেশনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- একটি সৃজনশীল প্রশ্ন বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার চেয়ে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর মূল্যায়নের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে;
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো অনুযায়ী চিন্তন দক্ষতার সকল স্তর প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় কি না তার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের যথার্থতা যাচাই করতে হবে;
- একটি সৃজনশীল প্রশ্নের একটি উদ্দীপক থাকে এবং এর ওপর ভিত্তি করে চারটি অংশে বিভক্ত প্রশ্ন থাকে। উদ্দীপক লিখিত কিছু হতে পারে আবার সারণি, গ্রাফ/লেখচিত্র, ছবি অথবা ডায়াগ্রাম আকারে হতে পারে অথবা এগুলোর সমন্বিত রূপও হতে পারে;
- কোনো বিষয়/ পত্রের একটি অধ্যায়ের আলোকে অথবা একাধিক অধ্যায়ের সমন্বয়ে উদ্দীপক গঠিত হতে পারে।
- উদ্দীপক অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের যথোপযুক্ত হতে হবে কিন্তু এমন দীর্ঘ হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের পড়তে অনেক সময় ব্যয় হয়;
- অপ্রয়োজনীয় বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো তথ্য উদ্দীপক অথবা প্রশ্নের কোনো অংশে থাকবে না।
- শব্দের ব্যবহার, বাক্য গঠন এবং ধারণা সংগঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অস্পষ্টটা/ দ্ব্যর্থকতা পরিহার করতে হবে;
- সৃজনশীল প্রশ্ন এমন কৌশলে প্রণয়ন করতে হবে যে, একটি প্রশ্নের বিভিন্ন অংশের উত্তরের মধ্যে পুনরাবৃত্তি (প্রাবরণ) হবে না। প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেও প্রাবরণ না থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে প্রশ্ন (ক, খ, গ এবং ঘ অংশ) সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। আবার প্রয়োজনে সৃজনশীল প্রশ্নের প্রতি অংশের জন্য নম্বর প্রদান নির্দেশিকা ও নমুনা উত্তর সংশোধন করতে হতে পারে;
- একাধিক প্রশ্নপত্রের সেট তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের কাঠিন্যের বিন্যাসে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেটের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নের ‘ক’ অংশের উত্তর সহজ এবং পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে। শিক্ষার্থী তার শিখনের ধারণাগত দিকে স্পষ্ট কি না, অন্যকে বুঝাতে পারে কি না তা অনুধাবন স্তরের (‘খ’অংশ) উত্তর থেকে যাচাই করে দেখা হয়। প্রয়োগ (‘গ’ অংশ) ও উচ্চতর দক্ষতা (‘ঘ’ অংশ) স্তরের প্রশ্নের উত্তরের গুরুত্ব অনেক বেশি এবং এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের বাইরের পরিস্থিতিতে পাঠ্যপুস্তকের তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীর চিন্তা করার দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। উদ্দীপক নিজ থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করে না কিন্তু একটি পরিস্থিতিতে চিন্তা করতে শিক্ষার্থীকে উদ্দীপ্ত করে।

৭.৯ শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিতকরণের উপায় এবং মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল

শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীকে উত্তম মানের প্রশ্নকরণ। শিখন-শেখানো একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। যার একদিকে থাকে শিক্ষক এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থী। এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ হচ্ছে, বিষয়বস্তু, পরিবেশ, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল , শিখন সামগ্রী বা উপকরণ এবং মূল্যযাচাই কৌশল। শিক্ষককের কাজ হচ্ছে এ সকল উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে বিষয়বস্তু, তথ্য বা অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চালনে সহায়তা করে। শিক্ষকের এ ভূমিকা শিক্ষার্থীদের সাড়া প্রদানে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর সাড়া ব্যবস্থাকরণ অনেক বেশি কার্যকরী হয়, যদি শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। কেবল শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে সম্পূর্ণভাবে শিখন যাচাই করা যায় না। কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষককে প্রশ্ন করা। সাধারণত শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে শিক্ষককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। এমনকি কখনও কখনও শ্রেণি কার্যক্রমের শেষ দিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেও শিক্ষার্থীরা নীরব থাকে। শিক্ষার্থীদের এই নীরবতার অর্থ সবসময় এই নয় যে,শিক্ষার্থী সব বুঝেছে বা কোন প্রশ্ন নেই। পরিস্থিতিকে ভয় পাওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার কারণে তারা নীরব থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণের জন্য উৎসাহিত করা। শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পায় এবং তাদের মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে।

Good learning starts with questions, not answers.

Guy Claxton, Bristol University

শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উৎসাহিতকরণের উপায়সমূহ

কৌতুহল সৃষ্টি করা: শক্তিশালী উদ্দীপক ব্যবহার করে কৌতুহল সৃষ্টি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ছবি, বই, ফটোগ্রাফ এবং শিল্পকর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার হৃদয় স্পর্শ করানো ভিডিও প্রদর্শন করা যেতে পারে। উত্তেজক বিষয়বস্তু পাঠ করা যেতে পারে। সিমুলেশন গেম খেলা যেতে পারে। এগুলো প্রদর্শন করলে বা ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কৌতুহল সৃষ্টি হবে। ফলে প্রশ্নকরণে উৎসাহিত হবে।

ব্রেইনষ্টর্ম সৃষ্টি করা:বিষয় বা ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন-ব্রেইনস্টর্ম সৃষ্টির জন্য বাবল বা মাইন্ড ম্যাপিং করা যেতে পারে। একটি প্রশ্ন অন্য প্রশ্ন সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রশ্নের ব্যাংক তৈরি করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে উৎসাহিত হবে।

চিন্তা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া:শিক্ষার্থীদের চিন্তাকে সংগঠিত করার জন্য সময় দিতে হবে। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের হাত তুলতে বলা যাবে না। কাউকে ডাকার আগে তাদেরকে প্রশ্নগুলো লিখতে বা সংগঠিত করতে দিতে হবে। সতীর্থদের সাথে তাদের চিন্তা বিনিময় করার পূর্বে পার্টনারের সাথে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে। ফলে প্রশ্নকরণে উৎসাহিত হবে।

অনুসন্ধানের সংস্কৃতি সৃষ্টি করা: অন্বেষণ এবং প্রশ্নকরণে উৎসাহিত করতে হবে। বাস্তব জীবনভিত্তিক অর্থপূর্ণ সমস্যা প্রদান করতে হবে। সমস্যার আলোকে ভবিষ্যতবাণী করে, স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করে পূর্বের জ্ঞানের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবে।

ধারণার ওপর ফোকাস করা: ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন না করে ঘটনার পিছনের বড় ধারণাগুলোর ওপর ফোকাস করতে পারলে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নকরণে উৎসাহ বোধ করবে।

উন্মুক্ত প্রশ্ন করা:শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত প্রশ্ন করলে তাদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার বিকাশ ঘটবে। ফলে তারা কল্পনা করতে শিখবে ও নিজের মনে নানা রকম প্রশ্নের উদ্রেক হবে। প্রশ্ন করতে উৎসাহিত হবে।

নতুন পাঠের বিষবস্তুর ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা:নতুন বিষয়বস্তু পড়ানোর শুরুতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানতে চায় বা তাদের ধারণা কী, এসম্পর্কে ৫ টি প্রশ্ন করতে বললে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে এবং প্রশ্ন করবে। শিক্ষক যদি বিষয়বস্তু পড়ানোর সময় এই প্রশ্নগুলো কভার করে পাঠ উপস্থাপন করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে আরও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত হবে।

ইতিবাচক সাড়া প্রদান করা : অর্থহীন বা তুচ্ছ প্রশ্ন করার জন্য শিক্ষার্থীকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না। এর পরিবর্তে বরং শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে বলা যেতে পারে কেন তুমি এরকম বললে একটু সময় নিয়ে ভাব, তারপর আবার প্রশ্ন কর। তখন শিক্ষার্থী নতুন করে ভাববে এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত হবে।

উচ্চতর চিন্তন স্তরের প্রশ্ন করা : শিক্ষার্থীকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যেন সে চিন্তার উপাদান পায়। এক্ষেত্রে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন করা যেতে পারে। চিন্তা করে উত্তর তৈরি করার সময় তার মনে নানা রকম প্রশ্ন জন্ম নিবে। তাকে উৎসাহিত করলে ও প্রশ্ন করণের পরিবেশ তৈরি করলে শিক্ষার্থী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।

এছাড়ার নিম্নের কৌশলগুলো ব্যবহার করতে হবে:

- এমন কিছু প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তরে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।
- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন প্রণয়ণের কাজ দিতে হবে। কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে অথবা শিক্ষককে প্রশ্ন করবে। ফলে প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস গড়ে ওঠবে।
- শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ থেকে প্রশ্ন তৈরি করে আনতে বললে শিক্ষার্থী তা তৈরি করে নিয়ে আসবে । তাঁদের তৈরি প্রশ্নগুলো শ্রেণিকক্ষে একে অপরকে করার সুযোগ দিলে তারা উৎসাহিত হবে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন কোন দ্বিধা, দ্বন্ধ বা ভয় না থাকে।
- শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে কৌতুহলী করে তুলতে পারলেই সে প্রশ্ন করতে আগ্রহী হবে
- শিক্ষার্থী যখন প্রশ্নের উত্তর দেবে বা নিজে প্রশ্ন করবে তখন তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে
- শিক্ষার্থীর যে কোন প্রতিক্রিয়া, প্রশ্ন বা উত্তর সব ক্ষেত্রেই শিক্ষক তাকে আমন্ত্রণ জানাবেন, তার প্রশংসা করবেন। যেমন, "বাঃ! ভারী সুন্দর প্রশ্ন করেছ তো,"
- একজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সেদিকে মনোযোগ দিতে বলা এবং তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকা
- একজনের মতের সাথে অন্যদের মতামতের মিল, অমিল, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমন্বয় করা
- বিষয়বস্ত সংশ্লিষ্ট কোন সমস্যা শিক্ষার্থীদেরকে এককভাবে বা দলীয়ভাবে সমাধান করতে দিতে হবে। সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে একে অপরকে প্রশ্ন করবে আবার অন্যদিকে নিজেদের মধ্যে উপায় খুঁজে না পেলে বা কোন ধারণা সর্ম্পকে স্পষ্টতা না থাকলে শিক্ষককে প্রশ্ন করবে।
- বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শিক্ষক যদি মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সুযোগ দেন তবে তিনি শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার মাত্রা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- মানুষ যখন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তখন তার মধ্যে প্রশ্নের জন্ম হয়। অর্থ্যাৎ প্রশ্নকরণের পূর্বশর্ত হ'ল চিন্তা। তাই শিক্ষার্থীকে প্রশ্নকরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষকের অন্যতম কাজ হবে বিষয়বস্তু সম্মন্ধে শিক্ষার্থীর চিন্তার উদ্রেক ঘটানো।

শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ ধরে রাখার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় মৌখিক প্রশ্নকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখন-শেখানো কাজের প্রতিটি পর্বে বা স্তরে যদি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করেন , তবে শিক্ষার্থী সক্রিয় হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিন্তা করতে হয়, তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের সাথে ভাব বিনিময় করতে হয়, এসব করতে গিয়ে সে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগহী হয়ে পড়ে ও শিখনে মনোযোগী হয়। সুতরাং শিখন-শিখানো কাজে প্রশ্নকরণ প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে-

১. পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা ;
২. পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা ও তথ্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সময় শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করা;

১. পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির একটি উপায় হল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা। এই সম্পৃক্তকরণ উদাহরণের মাধ্যমে তুরে ধরা যেতে পারে, আবার শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। শিখনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে তার মনে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী কিছু প্রশ্নের উত্তর সে নিজে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে খুঁজে বের করে, কিছু তার সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে এবং কিছু শিক্ষকের উপস্থাপিত তথ্যাবলি থেকে সংগ্রহ করে সমন্বয় করে।

২. পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা ও তথ্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সময় শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করা

পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় প্রতিটি ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রশ্ন করা একটি উত্তম কৌশল। শিক্ষক কাঠিন্যের ধারাক্রম বজায় রেখে প্রশ্ন করতে থাকবেন, শিক্ষার্থী প্রথম দিকে তাদের জানা জগৎ থেকে উত্তর দিবে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে উত্তর দিতে দিতে একসময় বিভিন্ন ধারণা ও তথ্যের মধ্যে সমন্বয় বা সংযোগ করতে শিখবে। ফলে জ্ঞানের সার্বিক কাঠামো তৈরি করতে পারবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করতে হলে শিখন-শেখানোর বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকের প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থী একদিকে জ্ঞান অর্জন করবে, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর ওপর দক্ষতা অর্জন করবে। প্রশ্ন করার সময় সহজে বোধগম্য শব্দ ও বাক্যের গঠণও হবে সরল ও সুস্পষ্ট। শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করার জন্য শ্রেণি শিক্ষণের প্রতিটি কাজেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করতে হবে। উত্তম প্রশ্নকরণের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ আকর্ষণীয় হয় এবং শিক্ষক নির্বিঘ্নে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশ্নকরণের কৌশল

- বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট করার জন্য বাস্তব জীবনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে উপস্থাপন;
- মূল ধারণাকে ভিত্তি করে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা;
- প্রশ্ন করা এবং শিক্ষার্থীর উত্তর প্রদানের মধ্যে মধ্যবর্তী সময় বা wait-time হিসেবে ৩ থেকে ৫ সেকেন্ড সময় দেওয়া। নিম্নস্তরের চিন্তন দক্ষতার প্রশ্নের জন্য ৩ সেকেন্ড সময় এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্নের জন্য ৫ সেকেন্ড সময় চিন্তা করার জন্য দিতে হয়;
- শুদ্ধ উত্তর পেলেই সাথে সাথে প্রশংসাসূচক বাক্য উচ্চারণ করা;
- ভুল উত্তরকে সরাসরি ভুল না বলে, সঠিকতার দিকে ধাবিত করার কৌশল অবলম্বন করা।

এছাড়াও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ ধরে রাখার জন্য নিম্নে বর্ণিত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে-

- বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনা করে উপকরণ ব্যবহার করা। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব উপকরণ, চার্ট, মডেল, মানচিত্র ও ইন্টারএকটিভ ডিভাইসের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত করে। অন্যদিকে শিক্ষকের করা প্রশ্নের উত্তর প্রদানেও মনোযোগী হয়;
- বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় ও মনোযোগী করা যায়;
- বিষয়বস্তুর প্রতিটি অংশ থেকে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন করা;
- বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন করা;
- প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সম্পূরক প্রশ্ন করা ;
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করা;
- বিষয়বস্তুর জটিল অংশকে উদাহরণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা;
- প্রশ্নকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ শব্দ ও বাক্য বিন্যাস করা, সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করার প্রতি খেয়াল রাখা;
- প্রশ্নে সরাসরি উত্তর বলে না দিয়ে, শিক্ষার্থীকে উত্তর প্রদানে সহায়তা করা;
- শিক্ষার্থীকে উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করা এবং সঠিক উত্তর প্রদানে প্রশংসা করা;
- বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে বিষয়বস্তুর প্রতি ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা;
- মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করার কৌশল অবলম্বন করে পাঠ পরিচালনা করা;
- উচ্চমার্গীয় চিন্তনে উৎসাহিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- শিক্ষকের শিক্ষণ উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের জন্য শিখনযাচাই ও শিখন পরিবীক্ষণ করা;
- পাঠের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত চিন্তামূলক কিছু লিখতে দেওয়া;
- পাঠসংশ্লিষ্ট কোন ছোট প্রকল্প করতে দেওয়া;
- সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করা;

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ ধরে রাখার জন্য যত রকম কৌশলই প্রয়োগ করা হোক না কেন, তার সফলতার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে, পাঠের বিষয়বস্তু হতে হবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের স্তর অনুযায়ী। শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের চেয়ে সহজ বা কঠিন কোন সমস্যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী ও মনোযোগী করা কষ্টকর এমনকি অসম্ভব। কাজেই বিষয়বস্তু, ধারণা তথ্য ও সমস্যা হতে হবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের স্তর বা সামর্থ্য অনুযায়ী।

৭.১০ অসবেল-এর অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায়

ডেভিড অসবেল (David Ausubel) ও অগ্রগামী সংগঠক

চিত্র ১১: ডেভিড অসবেল

আমেরিকার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. ডেভিড অসবেল ১৯১৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি শিশুর জ্ঞান বিকাশকে কেন্দ্র করে গবেষণা করেছেন। ১৯৬০ সালে তিনি অগ্রগামী সংগঠক প্রবর্তন করেন। শ্রেণিশিক্ষণে তথ্য উপস্থাপনের সময় শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করেন, তবে সে অভিজ্ঞতা নতুন তথ্যের সাথে সমন্বিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে একদিকে যেমন শিখন পরিবেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, অন্যদিকে নতুনভাবে গঠিত শিক্ষার্থীর এ অভিজ্ঞতাও পূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে নতুন তথ্যের সমন্বয় করার জন্য অসবেল যে তথ্য এবং শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠন ও বিন্যাস করেছেন, তাকে অগ্রগামী সংগঠক বলা হয়েছে।

অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে চলমান করে, সেই সাথে নতুন জ্ঞানার্জনের পথ তৈরি করে। শিক্ষার্থী যখন কোন নতুন জ্ঞান বা তথ্য তার নিজস্ব জ্ঞানের স্তরে প্রাসঙ্গিক ধারণার সাথে সচেতন এবং সম্পূর্ণভাবে মেলাতে পারে তখনই তার শেখা সার্থক হয়।

অগ্রগামী সংগঠক

1. A "statement of inclusive concepts to introduce and sum up material that follows" (Woolfolk, 2001).
2. Cognitive instructional strategy used to promote the learning and retention of new information (Ausubel, 1960).
3. It is a method of bridging and linking old information with something new.

সুতারং এ কথা বলা যায় যে অগ্রগামী সংগঠক একটি কৌশল। এ কৌশল ব্যবহার করে

- নতুন তথ্যের সাথে পুরানো তথ্যের সংযোগ ঘটে ও একটি যোগসূত্র রচিত হয়।
- নতুন তথ্য সংরক্ষিত হয় এবং শিখন অগ্রগতি সম্পন্ন হয়।
- প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয় ও একটি সামগ্রিক ধারণা গঠিত হয়।

অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীকে কোন নতুন বিষয় শেখানোর জন্য শিক্ষকের একটি নির্দেশনা কৌশল হিসেবে কাজ করে। নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্যের যে সংগঠন করেন সেটাই অগ্রগামী সংগঠক। অগ্রগামী সংগঠকের কাঠামো নির্মাণের আগে নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার্থীর পূর্ব জ্ঞানকে বিবেচনা করতে হবে। ফলে

- জানা বিষয়টির পুনরুত্থাপন হবে
- নতুন বিষয়টি সম্পর্কে একটি বিমূর্ত ধারণা জন্মাবে
- এ দু'য়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

নিবিড় ও ধারাবাহিকভাবে সম্পর্কযুক্ত কতগুলো ধারণা বা তথ্যকে যখন একটি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত পরিসরে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তখন সেই ধারণা বা তথ্যগুলোর সামগ্রিক বিন্যাসকে অগ্রগামী সংগঠক বলে।

অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য

- অগ্রগামী সংগঠক কোন ধারণার সার্বিক রূপরেখা এবং সারাংশ প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সামগ্রিকভাবে পুরনো ধারণার সমন্বয়ে একটি সাধারণ ধারণার জন্ম দেওয়া ও বিমূর্ত জ্ঞানের বিকাশই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য। সুতরাং অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীর নিজস্ব ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের জন্য যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর পুনর্গঠন এবং বৃদ্ধি এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর পুনর্গঠন ও বৃদ্ধি অগ্রগামী সংগঠকের উদ্দেশ্য।
- শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ভিত্তি উন্নত ও দৃঢ় করার জন্য অগ্রগামী সংগঠক কাজ করে।
- যখন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক তথ্য সংগঠিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করে, শিক্ষক সেখানে অগ্রগামী সংগঠক ব্যবহার করতে পারেন।
- অগ্রগামী সংগঠনের ব্যবহারে শিখনে পূর্ণতা আসার আগে জ্ঞানকাঠামো ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে।
- নতুন জ্ঞানকে প্রয়োগযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্ব জ্ঞানের পূনর্গঠন ও সমন্বয়ের জন্য অগ্রগামী সংগঠক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজে অগ্রগামী সংগঠকের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীকে নতুন কোন বিষয় শেখাতে হলে আপনাকে সর্বাগ্রে যে দিকটিতে গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হলো-

- নতুন তথ্যটির অর্থ যথেষ্ট স্পষ্ট কিনা;
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কাঠামোর সাথে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ।

অসবেলের মতে মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে নতুন কোন তথ্য শেখানোর জন্য তথ্যের অস্পষ্টতা দূর করা প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থীর তথ্য গ্রহণের সামর্থ্য অর্থাৎ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী যেন পরিবেশিত তথ্য সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং সেইসাথে সে তার বৌদ্ধিক ভিত্তি উন্নত ও দৃঢ় করতে পারে, অগ্রগামী সংগঠক সেভাবেই কাজ করে।

শ্রেণি শিখনে শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষকের যাবতীয় কাজকে সমন্বিত করার জন্য অসবেল অগ্রগামী সংগঠককে দু'টি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন-

১. ক্রমবর্ধমান পৃথকীকরণ (Progressive differentiation)
২. সমন্বিত সঙ্গতিবিধান (Integrative reoncillation)

১. **ক্রমবর্ধমান পৃথকীকরণ (Progressive differentiation)** ঃ এ নীতি অনুসারে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংগঠন করতে হবে যেন, জ্ঞানের সহজ থেকে কঠিন ক্ষেত্রে তা উপস্থাপিত হতে পারে। তথ্য ধীরে ধীরে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করবে এবং উদ্দেশ্য অর্জন উপযোগী সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করবে।

২. **সমন্বিত সঙ্গতিবিধান (Integrative reoncillation)** ঃ এ নীতি অনুসারে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর বর্তমান জ্ঞান স্তরের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতি স্থাপিত হতে থাকবে।

পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন নিয়ে শ্রেণিশিক্ষণে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই অসবেল সে দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকে একটি বিষয়ের ধারাবাহিক উপস্থাপন না করে যদি একটি বিষয়বস্তুর ওপর সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে তার বিভিন্ন দিকের ধারাবাহিক উপস্থাপন করা হয় তবে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ভিত্তি গঠনে তা অনেক বেশি সহায়ক হয়। ফলে বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশের জন্য প্রতিক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপনের সময় শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতেই অগ্রসর হওয়া যায়। অগ্রগামী সংগঠক এভাবে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করে, যেখানে নতুন ও অজানা তথ্য শেখার জন্য শিক্ষার্থী তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে এগুলোকে সমন্বিত করতে পারে।

অসবেল বলছেন, কোন নতুন তথ্য বা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক তথ্য যখন সংগঠিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করে, তখন তার প্রতিটি ক্ষেত্র স্পষ্ট, সহজবোধ্য, পারস্পারিক সম্পর্ক ও সমন্বয় এ সবকিছু উপস্থাপনের জন্য অগ্রগামী সংগঠক কার্যকরী হয়।

শ্রেণিশিক্ষণে অগ্রগামী সংগঠক প্রয়োগ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য কতগুলো প্রাসঙ্গিক তথ্যকে শুধুই তালিকাবদ্ধ করে উপস্থাপন না করা হয়। তালিকাবদ্ধ তথ্যগুলো শুধু পারস্পারিক সম্পর্কযুক্তই থাকবে না, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হতে হবে। সংগৃহীত পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই পরবর্তী আলোচনা করতে হবে। শিক্ষক যখন বুঝবেন যে শিক্ষার্থীরা কারণগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে তখন এ সম্পর্কে আরও গভীর ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়ার জন্য বই, অন্য কোন শিখন সামগ্রী, চার্ট বা ছক ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে নতুন যেসব তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলো তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে মেলানোর জন্য সুনির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, এই ছকের ওপর নির্ভর করে পরবতীতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পরিমাপ করা যায়।

তত্ত্বগতভাবে আমরা এ কথা বলতে পারি, অগ্রগামী সংগঠকের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানকে অর্থবহ ও প্রয়োগযোগ্য করে তোলার জন্য পূর্বজ্ঞানের পুনর্গঠন ও সমন্বয় সংঘটিত হয়।

শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের পূনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন জ্ঞানকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করে তোলার জন্য অগ্রগামী সংগঠককে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে অগ্রগামী সংগঠক যেভাবে কাজ করে -

- শিক্ষার্থীরা আগেই বুঝতে পারে কী তথ্য তারা পাচ্ছে;
- সে সম্পর্কে বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার আগেই একটি বিমূর্ত এবং অস্পষ্ট ধারণা তাদের মানসপটে চিত্রিত হয়ে যায়;
- অতএব নতুন ধারণাটিকে স্থাপন করার জন্য সে একটি জায়গা খুঁজে পায়;
- পূর্ব জ্ঞানের আলোকে নতুন তথ্য তখন অর্থবহ হয়, স্পষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীর কাছে তা মূর্তরূপে বিকাশলাভ করে।

অগ্রগামী সংগঠক প্রয়োগ করে মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কাঠামোর পুনর্গঠন করা যায়। তবে বক্তব্যের সাথে সাথে যখন চার্ট, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তখন সংগঠন আরও বেশি জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।
শিখনের সম্পূর্ণতা আসার আগে সম্পূর্ণ জ্ঞান কাঠামো ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন জ্ঞান গ্রহণ প্রক্রিয়ার সূচনা থেকে শিক্ষার্থীর বর্তমান ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়। বর্তমান ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা মিলে যাওয়া অংশটুকু সে গ্রহণ করে, প্রয়োগযোগ্য হলে অর্থাৎ শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট হলে সে নতুন ধারণার অনুশীলন করে। ফলে পুরানো ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজনে ধারণা নতুনভাবে গঠিত হয়। অনুশীলনের ফলে এই নতুন জ্ঞানে সে অভ্যস্ত হয়। বর্তমান ধারণার সাথে নতুন জ্ঞানের কোন অসঙ্গত অংশ শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে না। নতুন নতুন তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর এভাবেই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শিক্ষক যে নতুন তথ্য উপস্থাপন করছেন, শিক্ষার্থীর সহজ ও দ্রুত শিখনের জন্য তার অর্থ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সে কারণে অগ্রগামী সংগঠকের কাঠামো নির্মাণের আগে

- **নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পূর্বজ্ঞানকে বিবেচনা করতে হবে ঃ** শিক্ষক শিক্ষণের জন্য যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা যা শিক্ষার্থী পূর্বের শ্রেণি থেকে বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করেছে সে সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকতে হবে। তখন শিক্ষক শিক্ষার্থীর বর্তমান ধারণার সাথে নতুন বিষয়বস্তুকে সমন্বয় করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
- **নতুন তথ্য এবং শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে ঃ** শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে নতুন বিষয়ের সমন্বয়ের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল দু'য়ের যোগসূত্র স্থাপন করা। অর্থাৎ শিক্ষার্থী নতুন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে যেন পরিচিত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ফলে সে বিভ্রান্ত হবে না এবং শিখনে আনন্দ লাভ করবে ।
- **শিক্ষার্থীর কাছে তথ্যটি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট করতে হবে ঃ** শিক্ষার্থী যখন দেখবে নতুন বিষয়টি তার চেনা বা জানা কোন বিষয়সংশ্লিষ্ট তখন স্বভাবতই সে উৎসাহী হবে। নতুন তথ্যটি সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞান বা কোন তথ্য তাকে আকর্ষণ করবে এবং এভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি পূর্ণ অর্থ নিয়ে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তখনই অগ্রগামী সংগঠক শিক্ষার্থীকে কোন নতুন বিষয় শেখানোর জন্য শিক্ষকের কাছে একটি নির্দেশনা কৌশল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হবে।

সে কারণে নতুন তথ্য এবং শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি যোগসূত্র স্থাপন করা যায় শিক্ষার্থীর কাছে তথ্যটি অনেক বেশি অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হয়। ফলে শিক্ষার্থী তা শিখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপনের উপায়

শেখানোর বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই শিক্ষার্থীদের নিকট পরিচিত থাকে না। অনেক নতুন ও জটিল বিষয়ও শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে বিষয়সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে নতুন জ্ঞান সমন্বয় বা সংযোগ করে উপস্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠটি আকর্ষণীয় হয় ও সহজে বোধগম্য হয়।

পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা বা তথ্য পরিবেশনের আগে শিক্ষার্থী সে সম্পর্কে কী জানে, কতটা জানে, বা জানার গভীরতা কতটা শিক্ষক সে সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নিয়ে থাকেন। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু বিন্যাস করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী পূর্বের শ্রেণিতে যা পড়েছে ঠিক তারপর থেকে বা শেষ ধারণা থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়। অথবা তথ্য এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যেন শিক্ষার্থী আগের শ্রেণিতে যা পড়েছে তার পুনঃরুত্থাপন হয় এবং সেইসাথে এ সম্পর্কে পরবর্তী ও আরও একটু গভীর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকে। মূলত: পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন ধারণার সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অসবেল অগ্রগামী সংগঠনের চারটি প্রকারভেদ দেখিয়েছেন।

১. **বিবরণযোগ্য অগ্রগামী সংগঠন (Expository advance organizers):** এ সংগঠনে শিক্ষক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা পূর্বজ্ঞানের সাথে যোগসূত্র রচনা করে ব্যাখ্যা, বর্ণনা বা বিবৃত করেন।
২. **প্রসঙ্গযুক্ত অগ্রগামী সংগঠন (Narrative advance organizers):** এখানে শিক্ষক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গল্প বা কোন ঘটনার বিবরণের মাধ্যম বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।
৩. **গাঠনিক অগ্রগামী সংগঠন (Graphical advance organizers) :** এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ছক, চিত্র, নকশা বা লেখনীর মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তু ও পূর্ব ধারণার উপস্থাপন করেন।
৪. **মূলভাবসমৃদ্ধ অগ্রগামী সংগঠন (Skimming):** এক্ষেত্রে শিক্ষক অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে শুধুই মূল তথ্য তুলে ধরেন।

বর্তমান পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ব ধারাবাহিকতা রক্ষাকারী কোন ধারণা বা তথ্য যে সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্ব থেকে প্রাপ্ত কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে তাকে পূর্বজ্ঞান বলে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা

শুধু পাঠ্যপুস্তক থেকেই যে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা নয়। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় শ্রেণি পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, তার উপস্থাপিত তথ্য, কৌশল, বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি সবকিছুর সাথে শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ায় তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। বিষয়বস্তুর তথ্য থেকে অর্জিত সে অভিজ্ঞতা শুধু বেশিই নয়, অনেক সময় তার গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এসব কিছু নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষণ কৌশল ও শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতার ওপর। এ ছাড়াও শিক্ষার্থী তার নিজস্ব গ্রহণ ক্ষমতা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। ফলে তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা শ্রেণিকক্ষের নির্দিষ্ট গন্ডী ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং একই শ্রেণির বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে অভিজ্ঞতার ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে শিক্ষক সব সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন।
তাই আগের শ্রেণিতে বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট অংশ উপস্থাপিত থাকলেও শিক্ষক জানেন যে বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। সে কারণে তথ্য পরিবেশনের আগে আপনাকে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার সময় যে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হ'ল-

- শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও শ্রেণি
- শিক্ষার্থীর পরিবেশ, সংস্কৃতি ও পরিবার
- শ্রেণিতে তার অবস্থান, গতিবিধি ও আচরণ
- তার দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও প্রবণতা
- পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর অবস্থান - অধ্যায়, শ্রেণি, বিষয় ,সময় ,পরিসর ও গভীরতা ইত্যাদি।

বিষয়বস্তুর পূর্ব ধারণা যে শুধু আগের শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত থাকে তা নয়, একই শ্রেণির অন্য আরও পাঠ্যপুস্তকেও তথ্য ভিন্নভাবে, ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত থাকতে পারে। আবার একই পাঠ্যপুস্তকের অন্য কোন অধ্যায়ে (পূর্বে বা পরে) ভিন্ন প্রয়োজনে অন্য কোনভাবে পরিবেশিত থাকতে পারে। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার আগে শিক্ষকের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। শিক্ষককে জানতে হবে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোথা থেকে, কী উপায়ে ও কতটা জ্ঞান সংগ্রহ করেছে বা করতে পারে। এসব জানা থাকলে শিক্ষক কী যাচাই করবেন, কীভাবে করবেন, কেন করবেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

যেমন অষ্টম শ্রেণিতে সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু উপস্থাপনার পূর্বে শ্রেণি শিক্ষার্থীর মেধাগত অবস্থা ও মান বিবেচনা করে শিক্ষককে ধারণা করতে হয়, শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কিত জ্ঞান পাঠ্যপুস্তক থেকেও বেশি হতে পারে। তবে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষক সাধারণভাবে একই প্রকার যাচাই কৌশল প্রয়োগ করবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আগ্রহী শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষককে ভিন্ন কোন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে বা পৃথকভাবে সময় দিতে হবে। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার সঙ্গে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ তৈরি করার ভূমিকা আছে। এ সময় শিক্ষার্থী যদি বুঝতে পারে যে, সে যে বিষয়টি জানে শিক্ষক তা নিয়ে প্রশ্ন করছেন বা কথা বলতে যাচ্ছেন তবে সে খুব স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী হবে।

সে কারণে শিক্ষককে খুব সতর্ক হয়ে যাচাই কৌশল নির্বাচন করতে হবে। অন্যদিকে শিক্ষক নির্ধারণ করতে পারেন আজকের বিষয়বস্তুর কোন স্থান বা ধারণার কোন অংশ থেকে শুরু করতে হবে । কেননা কোথা থেকে আরম্ভ করলে শিক্ষার্থী সহজেই বিষয়বস্তুর ধারণার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পাবে বা তার পূর্ব ধারণার সাথে মেলাতে পারবে সে বিষয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুতরাং পূর্বজ্ঞান যাচাই করার সময় শিক্ষককে দুটি কাজ একসাথে করতে হবে – ১.বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা যাচাই; ২. বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ।

শিক্ষক তাঁর পরিকল্পনার এ স্তরে খুব গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করবেন। ব্যবহৃত কৌশল ও কার্যকারিতার ওপর সামগ্রিকভাবে শিক্ষণের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে। যদি একবার শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা যায় তবে তা পরবর্তীতে ধরে রেখে তার শিখন সফল ও কার্যকর করা যায়। পূর্বজ্ঞানের সাথে নতুন ধারণার সমন্বয় সফল শিখনের অন্যতম শর্ত।

পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করার জন্য প্রয়োগযোগ্য কিছু কৌশল

- **প্রশ্নকরণ :** শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষক উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
- **উপকরণ প্রদর্শন বা প্রয়োগ :** শিক্ষার্থীর পূর্ব পরিচিত কোন উপকরণ প্রদর্শন করে বা তাদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের পূর্বজ্ঞানের মাত্রা বোঝা যায়। উপকরণটি যদি শিক্ষার্থীদের হাতে দিতে হয় তবে সকল শিক্ষার্থী যেন তা ভালভাবে দেখতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। তবে এক্ষত্রে প্রদর্শনের সাথে সাথে প্রশ্নকরণ কৌশলও প্রয়োগ করতে হয়।
- **গল্প বা কোন ঘটনা বর্ণনা করা ঃ** বিষয়বস্তু সংশিষ্টতো বটেই শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণার সাথে সম্পর্কিত কোন তথ্য গল্পে বা ঘটনায় থাকতে হবে। এখানেও শিক্ষার্থীর ধারণার সূত্র ধরে প্রশ্ন করতে হয়।
- **কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা ঃ** শ্রেণিকক্ষের কোন অবস্থা বা শিক্ষার্থীদের কোন আচরণ বা অন্য যে কোন প্রসঙ্গ, যা শিক্ষার্থীর আয়ত্তের মধ্যে আছে, এমন কিছু বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলে পূর্ব ধারণা যাচাই করা যায়। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কথোপকথনে যেতে পারেন। শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন, অনেক সময় শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করে।

এভাবে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে জেনে নিতে পারেন।

পূর্বজ্ঞানের সাথে নতুন ধারণা সংযোজন

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ এবং পাঠের বিষয়বস্তু সহজে বোধগম্য করার জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে নতুন ধারণার সাথে সংযোজন করা প্রয়োজন। একাজটি প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথভাবে করতে পারলে শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়বে।

পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে নতুন ধারণার সংযোজনের গুরুত্ব

আমরা অসবেল এর শিখনতত্ত্ব থেকে জেনেছি যে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তরের পুনর্গঠন ও বৃদ্ধি সফল শিখনের অন্যতম শর্ত। শিক্ষার্থী যা জানে তার উপরে তার জ্ঞানের স্তর গড়ে ওঠে। তাই পূর্বজ্ঞানের পুনর্গঠন ও বৃদ্ধি করা শিক্ষণের লক্ষ্য।

শিক্ষার্থীর নিজ আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তার জ্ঞানের স্তর গড়ে ওঠে। বিষয়বস্তু যখন সেই জ্ঞানের স্তর স্পর্শ করে শিক্ষার্থী স্বভাবতই আনন্দিত হয় এবং নিজের ইচ্ছেতেই বিষয়বস্তুর দিকে এগিয়ে আসে। প্রতিটি ধারণা বা তথ্যের উপস্থাপনে সে আগ্রহী হয় এবং নিজের বোধ বা জ্ঞানের সঙ্গে সংযোজন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বিষয়বস্তুর প্রতি নিজ আগ্রহে সাড়া দেওয়াই শিখনের মূল কথা। জানা জগত থেকে শিক্ষক শুরু করেন বলে শিক্ষার্থী আগ্রহী ও মনোযোগী হয় এবং তার শিখনের প্রতিটি ধাপ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে নতুন ধারণার সংযোজন শিখনকে সফল ও ফলপ্রসূ করে তোলে।

অন্যদিকে শিক্ষার্থী নিজ আগ্রহে সাড়া দেয় বলে শিক্ষকের পরিশ্রম অনেক কম হয়। শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে তিনি সচেষ্ট হন, তৃপ্তিলাভ করেন এবং এর জন্য নানাভাবে তিনি পরিকল্পনা করেন, সচেতন থাকেন ও মনোনিবেশ করতে পারেন। এভাবে তিনি তার কাজে সার্থকতা লাভ করেন।

পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে নতুন ধারণার সংযোজন কৌশল

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় ধারণাগুলো একে একে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশ্লেষণের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে তথ্য পরিবেশন করতে হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে সমন্বয়ের এ ধারা রক্ষা করবেন। নিচে পূর্বঅভিজ্ঞতার সাথে নতুন ধারণার সংযোজনের জন্য কয়েকটি কৌশল তুলে ধরা হ'ল-

- **ধারণা মানচিত্র গঠন(Concept mapping)**
  কোন একটি ধারণা নির্বাচন করে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের তথ্যগুলোকে ধারণার চতুর্দিকে বিক্ষিপ্তভাবে বিন্যাস করা হয়। সামগ্রিকভাবে ধারণাটির পূর্ব ও পরবর্তী বহুতথ্যসমৃদ্ধ একটি চিত্র ফুটে ওঠে।
- **অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন(Probing question)**
  কোন ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থী কী জানে তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কে Probing questionবা অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন বলে। এ ধরনের প্রশ্ন করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা যায়। প্রশ্ন করতে করতে শিক্ষক নতুন তথ্য পরিবেশনের সুযোগ করে নেন, ফলে শিক্ষার্থী একাত্ম বোধ করে।
- **মুক্ত আলোচনা**
  এ কৌশল অবলম্বন করে নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীরা খোলামেলা আলোচনা করে। শিক্ষার্থীদের বিচিত্র মতামত, অভিজ্ঞতা, সন্দেহ, যুক্তি ইত্যাদি সহযোগে ধারণা সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়। আলোচনায় শিক্ষক অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং নতুন তথ্য উপস্থাপন করে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন করতে সাহায্য করেন। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা নবরূপে গঠিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- **প্রবাহ চিত্র**

  কোন ধারণার নির্দিষ্ট একটি অবস্থার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ এবং প্রদর্শন করা হয়। তথ্যগুলো সম্পর্কে বক্তব্য লিখিত আকারে অথবা চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়। এভাবে উপস্থাপিত তথ্যসমূহ ধারণার নির্দিষ্ট অবস্থার ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরে। ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর জানা স্তর থেকে অজানা স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।

- **হেরিংবোন কৌশল**

  কোন একটি মূল ধারণা সম্পর্কে যখন কে, কী, কেন, কখন, কোথায় এবং কেমন এই ছয় আঙ্গিকে প্রশ্ন তুলে তার সমাধানের জন্য ধারণাটিকে বিশেষিত করা হয় তখন তা মাছের কাঁটার রূপ নেয়। এভাবে ধারণা বিশ্লেষণ করতে করতে শিক্ষার্থীরা তথ্যের গভীরে পৌঁছতে পারে এবং একটি ধারণা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। প্রশ্ন করতে করতে শিক্ষক গভীরে প্রবেশ করেন। তবে শিক্ষার্থী আটকে গেলে শিক্ষক তার সন্দেহ দূর করে দেন। ফলে ধারণাটি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও বোধগম্য হয় এবং তারা গভীর জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়।

- **মাথা খাটানো (Brain storming)**

  নির্দিষ্ট একটি ধারণার ওপর দলের সকল সদস্য পৃথকভাবে তাদের মতামত বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে। মতামত প্রকাশের সময় তারা মাথা খাটিয়ে, চিন্তা করে যথাসম্ভব যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করে। বিভিন্ন মতামত একে অপরের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও পুনর্গঠনে সাহায্য করে। দলনেতা এসব মতামত সমন্বিত করে। সার্বিক সিদ্ধান্তে সকল সদস্যের অভিমত প্রতিফলিত হয়ে ধারণাটির নতুন রূপ প্রকাশ পায়।

- **পঠন**

  শিক্ষার্থী যা জানে তার ওপর নির্ভর করে কোন বিষয়বস্তুর পরবর্তী অংশবিশেষ তাকে পড়তে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী নিজে পড়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা গড়ে তোলে। পরে শিক্ষকের বক্তব্য, প্রশ্নকরণ বা আলোচনার মাধ্যমে কোন অস্পষ্টতা থাকলে তা দূর হয়ে যায়।

- **মতামত বিনিময়**

  শিক্ষার্থী জানে এমন কোন ধারণার সাথে তার পরবর্তী ধারণা সম্পর্কিত তথ্যমালা উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর মতামত চাওয়া হয়। শিক্ষক তথ্যমালা লিখিতভাবে উপস্থাপন করে মতামত নিতে পারেন অথবা মতামত সংগ্রহ করে বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করতে পারেন।

পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংযোজনের ফল

শিক্ষার্থীর নিজের জগতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন বলে শিক্ষার্থী প্রথমে কৌতূহলী হয়, মনোযোগী হয় এবং ধীরে ধীরে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে উপস্থাপিত তথ্যের সঙ্গে তার দূরত্ব কমতে থাকে এবং একসময় সে একাত্মবোধ করে। শিখনে শিক্ষার্থী নিজের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে, তার প্রয়োজনীয় তথ্য সে নিজেই সংগ্রহ করে। তার অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে এবং বার বার প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করে সে শিখনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে তার শিখন স্থায়ী হয়।

পূর্বজ্ঞান যাচাই শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তোলে। শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে পূর্বজ্ঞান যাচাই অপরিহার্য। এ জন্য শিক্ষার্থীর প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষককে অবগত থাকতে হয়। নির্দিষ্ট কোন তথ্য পরিবেশনের পূর্বে সে সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে হয়। পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে উচ্চমার্গীয় প্রশ্নকরণ কার্যকরী হয় না। ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যায়। একই কৌশল শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কার্যকর হয় না। তথ্য বিশ্লেষণ করতে পূর্বজ্ঞান যাচাই দিক নির্দেশনা দেয়। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্তর অনুসন্ধান করাকে পূর্বজ্ঞান যাচাই বলে। পূর্ববর্তী ধারণা সম্পর্কিত মুক্ত আলোচনা পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের অন্যতম কৌশল। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্নকরণ প্রধান কৌশল। বর্তমান পাঠে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করতে পূর্বজ্ঞান যাচাই করা যায়। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার সময় শিক্ষক পাঠের পরিবেশ রচনা করেন। পূর্ববর্তী শ্রেণির বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতে হয়। পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য উপকরণ ব্যবহার অপরিহার্য।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে হার্বার্টের ৫টি সোপানের নাম লিখুন।
২. উত্তম পাঠ পরিকল্পনার ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. অণুশিক্ষণ ও ছদ্মশিক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
৪. অণুশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কৌশলসমূহ কীভাবে আয়ত্ত করা যায়?
৫. শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের কী কী দক্ষতা থাকা উচিত?
৬. শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার 'সুস্পষ্টতা' উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।
৭. শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্নকরণের ৫টি কৌশলের নাম উল্লেখ করুন।
৮. অনুসন্ধানমূলক প্রশ্নের উদাহরণ দিন।
৯. সৃজনশীল প্রশ্নের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অংশ বুঝিয়ে দিন।
১০. শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টিমূলক প্রশ্নকরণের ৫টি কৌশল উল্লেখ করুন।
১১. পূর্বজ্ঞানের সাথে নতুন ধারণার সংযোজনের উদাহরণ দিন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. একটি উত্তম ও আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো শনাক্ত করুন। এসকল উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২. একক কাজ ও প্রদর্শন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
৩. শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার উপযোগী অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা শনাক্ত করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষার্থীদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল কী হওয়া উচিত? ব্যাখ্যা করুন। উন্মুক্ত ও বদ্ধ প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৫. বেঞ্জামিন ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যার আলোকে সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো তুলে ধরুন। মাধ্যমিক স্তরের যে কোন বিষয় থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।
৬. কী কী উপায়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণে উৎসাহিত করা যায় তা বর্ণনা করুন।
৭. অগ্রগামী সংগঠক কী? শিখন-শেখানো কাজে অগ্রগামী সংগঠকের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ৮ : শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। শত বছরেরও বেশি সময় পূর্বে ইংল্যান্ডে স্যার জন এডাম ১৯০১ সালে সর্বপ্রথম শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয় ও যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। অতীতে পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা প্রদান করাই ছিল শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একমাত্র উপায়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা উপকরণ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সুন্দর, সজীব ও আকর্ষণীয় করে তোলে। চীন দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দশ হাজার শব্দ ব্যবহার করে যা বোঝানো যায় না একটি মাত্র ভাল ছবির সাহায্যে তা অনায়াসে বোঝানো যায়। শিক্ষক উপকরণের সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকের বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে শিক্ষার্থীদের নিকট পরিবেশন করেন এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কৌশল, বোধশক্তি ও ধারণালাভে সাহায্য করেন। এ অধ্যায়কে নিম্নরূপে বিন্যাস করে উপস্থাপন করা হলো:

৮.১ শিখন সামগ্রী ও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের ধারণা;

৮.২ শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ: সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ ও সংগঠন;

৮.৩ শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ: উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার এবং উপকরণ সংরক্ষণের উপায়।

৮.১ শিখন সামগ্রী ও শিক্ষণ সহায়ক উপকরণের ধারণা এবং কার্যকর ব্যবহার

শিক্ষক তার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট থাকেন। আর এর ফলপ্রসূতা আসে আকর্ষণীয়, সঠিক ও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে। শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ফলে যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। এর সাহায্যে শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে যেমন হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় তেমনি অন্যদিকে তার শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়।

শিখন সামগ্রী

সফল, সার্থক ও কার্যকর শিখনে যে সকল শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন সেগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় শিখন সামগ্রী। এসব শিখন সামগ্রীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক, ওয়ার্কবুক, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক সহায়িকা, তথ্যপুস্তক, পাঠ সহায়ক ও পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের বই, সাদাকালো বোর্ড, মানচিত্র, চার্ট, মডেলসহ নানারকম শিখন শেখানো সহায়ক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্তমানে ভিডিও ক্যাসেট, টিভি, মাইক্রোফিল্ম, স্লাইড প্রোজেক্টর, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, ল্যাপটপ ইত্যাদিও ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বিশ্বের সকল দেশে শিখনের প্রধান সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিখনে আগ্রহ সৃষ্টিতে এবং পাঠাভ্যাস গঠনে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব দেশে পাঠযোগ্য অতিরিক্ত বই পুস্তক প্রয়োজনানুযায়ী পাওয়া যায় না সেসব দেশে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব আরও বেশি। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক কারণে একাধিক পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। এসব দেশে প্রতিটি বিষয়ের জন্য মাত্র একটি করে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে এসব দেশে গুণগত মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

শিক্ষার গুণগত মান, বিশেষ করে শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নে যতগুলো হাতিয়ার রয়েছে তন্মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীর উপযোগী গুণগত মানসম্পন্ন, নির্ভুল ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা আবশ্যক। এ ছাড়া শ্রেণি পাঠকে সহজ, বোধগম্য ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় লাগসই উপকরণ এবং এর কার্যকর ব্যবহারে শিক্ষকগণকে পারদর্শী করে তুলতে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রয়োজন।

শিখন সামগ্রী কয়েক ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শিখনসামগ্রী চিহ্নিত করে এগুলোকে একটি প্যাকেজের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। এ প্যাকেজে সাধারণত যে তিন ধরনের উপাদান রয়েছে তা নিম্নরূপ –

- শিক্ষার্থীর জন্য : পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক, ওয়ার্কশিট ইত্যাদি।
- শিক্ষকের জন্য : শিক্ষক নির্দেশিকা, তথ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি।
- শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য : চার্ট, মডেল, মানচিত্র, ফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট স্লাইড, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি।

শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে সহজ, প্রাণবন্ত, কার্যকর ও বৈচিত্র্যময় করার জন্য শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে কতগুলো সহায়ক সামগ্রীর সহায়তা নিতে হয়। শিখনকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষক কতগুলো মূর্ত বস্তু, উপাদান বা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করেন যা শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়সমূহকে উদ্দীপ্ত করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আনন্দ ও আগ্রহভরে শিখতে সাহায্য করে ও শিখন বিষয়কে উপভোগ্য করে তোলে। এগুলোর সহায়তায় শিখন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হয়। শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত এসব দ্রব্যসামগ্রীকে বলা হয় শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ।

শিক্ষণীয় বিষয়কে তাৎপর্যময়, আকর্ষণীয় করে তুলতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ইহা শিখন পরিবেশকে আনন্দময় করে তোলে, বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত রূপ দেয় এবং শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে সহায়তা করে।

শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব

- শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের ফলে পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তু গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে শিখনে বৈচিত্র্য আসে;
- শিক্ষার্থী কল্পনা করতে শেখে এবং সৃজনশীল কাজে উৎসাহী হয়;
- দেখা ও শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তু স্পষ্টতর করে তোলা যায় এবং মুখস্থের চেয়ে মেধা চর্চায় শিক্ষার্থীকে উৎসাহী করে তোলা সম্ভব;
- শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় শিখন ত্বরান্বিত হয়;
- অজানা বিষয়কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় বলে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জগৎ সম্প্রসারিত হয় এবং জ্ঞানের বিকাশ ঘটে;
- বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা সম্ভব হয়;
- শিক্ষার্থী কৌতূহলী হয় এবং মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজতর হয়;
- শিক্ষার্থী হাতে কলমে শেখার সুযোগ পায় এবং বাস্তব জীবনের সাথে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে;
- শ্রেণির দুর্বল ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীকেও বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়;
- একসঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়;
- সমস্যা সমাধানে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ

উপকরণের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে কিছু জানার পূর্বে Edgar Dale এর Cone of Experience মডেল সম্পর্কে দু'একটি তথ্য দেওয়া হল। তিনি 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি ত্রিভুজ তৈরি করেছেন। এর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত **১১**টি প্রকারভেদ দেখিয়েছেন।

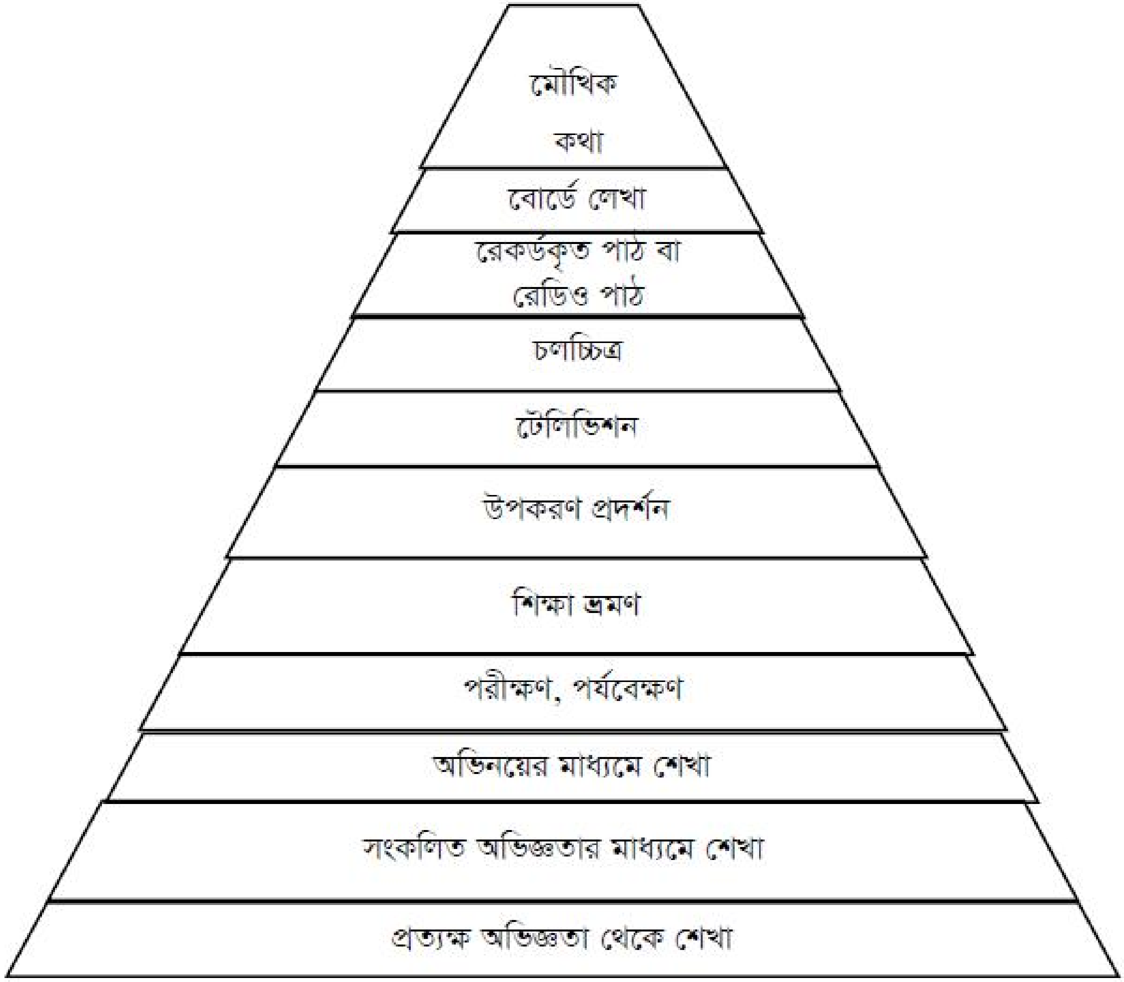

চিত্র ১২: Edgar Dale এর Cone of Experience মডেল

Dale অভিজ্ঞতাসমূহকে মূর্ত থেকে বিমূর্ত হিসেবে সাজিয়েছেন অর্থাৎ সবচেয়ে বিমূর্ত হল মুখের ভাষা। কারণ মুখের কথা শুনে মনে রাখতে হয়। কিন্তু চোখে দেখা সামগ্রী মানসপটে একটি স্থায়ী চিত্র অংকন করে। সেজন্য বিমূর্ত জ্ঞান সম্পর্কিত কথাগুলো উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মূর্ত করা যায়।

লক্ষ্যদলের পাঠদানের বিষয়বস্তুর চাহিদার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

ক) সংগ্রহের উৎস হিসেবে শিক্ষা উপকরণ দু'ধরনের। যথা –
- বাণিজ্যিক উপকরণ
- সহজলভ্য উপকরণ

খ) কার্যকারিতার ধরন অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ দু'ধরনের। যথা –
- প্রক্ষেপণযোগ্য উপকরণ
- প্রক্ষেপহীন উপকরণ

গ) ব্যবহারের গুণাগুণের ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণ পাঁচ প্রকারের। যথা –
- শ্রবণভিত্তিক উপকরণ
- দর্শনভিত্তিক উপকরণ
- শ্রবণ–দর্শনভিত্তিক উপকরণ
- অনুসন্ধানমূলক উপকরণ
- কর্মসম্পাদনমূলক উপকরণ।

নিম্নে ছক আকারে দেখানো হল –

উপকরণ

শ্রবণভিত্তিক
–রেডিও
–ক্যাসেট/সিডি প্লেয়ার
– গ্রামোফোন
–টেপরেকর্ডার
– মাইক্রোফোন
– সাউন্ডবক্স

দর্শনভিত্তিক
– ত্রিমাত্রিক(বস্তু, মডেল, নমুনা)
– মুদ্রিতবস্তু(পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, কর্ম নির্দেশপত্র, কর্মপত্র, পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল)
–চকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/স্মার্ট বোর্ড
– বুলেটিন বোর্ড
– চার্ট/পোস্টার
– ফ্লানেল বোর্ড
– স্থির চিত্র (প্রক্ষেপহীন:
–ফটোগ্রাফ
– অঙ্কিত চিত্র;
প্রক্ষেপনযোগ্য:
– ফিল্ম স্ট্রিপ প্রজেক্টর,
– ওভারহেড প্রজেক্টর
–স্লাইড প্রজেক্টর
– মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর)
– গ্রাফিক্স (গ্লোব, ম্যাপ, নকশা, ছবি/চিত্র, গ্রাফ, প্রবাহ চিত্র, ধারণা মানচিত্র)

শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক
– টেলিভিশন
– ভিসিপি
– চলচ্চিত্র
– কম্পিউটার
– মনিটর
– ডিভিডি প্লেয়ার

কর্মসম্পাদনমূলক
– সামাজিক উৎস (ব্যক্তি/শিক্ষক, দর্শনীয় স্থান, দর্শনীয় বস্তু)
– প্রাতিষ্ঠানিক উৎস(খামার, প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম, পরিবেশ প্রকৃতি)

অনুসন্ধানমূলক
– পরিমাপক যন্ত্র
– পরীক্ষণ যন্ত্র
– কর্মসম্পাদন যন্ত্র
– রাসায়নিক দ্রব্যাদি

শিক্ষা উপকরণের প্রদর্শন ও কার্যকর ব্যবহার

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখনে সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে উৎসাহী করে তুলবেন এবং তাদের মনোযোগ ধরে রাখবেন তার ওপর। উন্নত প্রযুক্তির স্পর্শে শিক্ষার্থীর মনে নানারকম প্রশ্ন জাগ্রত হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তাদের এ কৌতূহলকে কাজে লাগিয়ে শ্রেণি কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন ও এর কার্যকর ব্যবহার।

শিক্ষা উপকরণের প্রদর্শন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর গুণাগুণ বিচার করা আবশ্যক। এ গুণাগুণ বিচারে উপকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এগুলো হলো–

- উপযোগিতা
- নির্ভরযোগ্যতা
- সহজলভ্যতা।

উপযোগিতা

শিক্ষা উপকরণের উপযোগিতা বিচারের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন

- শিক্ষা উপকরণ নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত হওয়া আবশ্যক। যেমন মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটি পড়াতে গিয়ে শহীদ মিনারের ছবি দেখানো প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবির সাথে বিষয়ের সম্পৃক্ততা নেই। অনুরূপভাবে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার রচিত গ্রন্থাবলি দেখানো প্রাসঙ্গিক, রবীন্দ্রনাথের নয়।
- শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর স্তর, বয়স, সামর্থ্য ও শিক্ষার মান বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ উপকরণ শুধু বিষয়বস্তু উপযোগী হলে চলবে না, শ্রেণিরও উপযোগী হতে হবে। প্রাথমিক স্তরে যে ছবি, মডেল বা বাস্তব উপকরণ শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে এবং একই সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতার জগতকে সম্প্রসারিত করে, ঠিক সে উপকরণটি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক নাও হতে পারে। সুতরাং এই স্তরের ঐ একই বিষয়ের জন্য শিক্ষা উপকরণের বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- শিক্ষা উপকরণ দর্শনযোগ্য হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে উপকরণের আকার, রঙের ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে। উপকরণের আকার শ্রেণির আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যেন শ্রেণির সামনে ঝুলিয়ে দিলে সবাই সেটা দেখতে পায়;
- শ্রেণিকক্ষে ঠিক কোন সময়ে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণভাবে প্রস্তুতিপর্বের শেষে এবং উপস্থাপন পর্বের শুরুতে উপকরণ প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় বলে ধরে নেয়া হয়। তবে পাঠ্য বিষয়বস্তু অধিকতর অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ করতে অন্যান্য পর্বেও উপকরণ ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া পাঠের মূল্যায়ন পর্বে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে;
- উপকরণ অবশ্যই আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে হবে। উপকরণের মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব থাকলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে। এতে পাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত অস্পষ্ট ও বিবর্ণ উপকরণ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

উপকরণ সহজে ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। শিক্ষার্থী বা শিক্ষক যেন তা সহজেই বহন করতে সক্ষম হন তা খেয়াল করতে হবে। উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা পাঠকে অর্থবহ করে তোলে।

নির্ভরযোগ্যতা

শ্রেণিতে পঠন পাঠনে সহায়ক উপকরণ নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। নির্ভরযোগ্যতা বিচারে নিম্নের দিকগুলোর ওপর জোর দিতে হবে;

- উপকরণে প্রদর্শিত তথ্য হতে হবে নির্ভুল। তথ্য অবশ্যই সাম্প্রতিক হবে। পুরনো তথ্য পাঠের সহায়ক হবে না বরং তা হবে শিক্ষার্থীর জন্য বিভ্রান্তিকর। যেসব তথ্য সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তা হালনাগাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নিরাপদে ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের পূর্বে এগুলো নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।
- উপকরণ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এর আকার ও আয়তনের দিকটি যেমন দেখা প্রয়োজন তেমনি এর শোভনতা ও ভাবোদ্দীপন ক্ষমতাও বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে আঘাত করে এমন কোন উপকরণ ব্যবহার করা কোনক্রমেই সঠিক হবে না।
- উপকরণের সহজলভ্যতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করে। স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন স্বল্পমূল্যের অথবা বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহারের ওপর বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। এতে একদিকে যেমন উপকরণের সহজলভ্যতা বিবেচনায় আনা হয় অন্যদিকে তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে নিম্নের বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।
- পাঠের সাথে মিল রেখে ধারাবাহিকভাবে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী যেন উপকরণ দেখার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- উপকরণটির সর্বাধিক ব্যবহারযোগ্যতা থাকা।
- এটি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে তৈরি করতে হবে।

- বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে।
- এটি তৈরিতে শৈল্পিকতা থাকবে।
- এর আকর্ষণ ক্ষমতা থাকতে হবে।
- পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীর সহায়ক হতে হবে।

এছাড়া কোন কৌশল অবলম্বন করলে এটি শিক্ষার্থীর সর্বাধিক উপযোগী হবে তা যাচাই করে উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৮.২ শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ: সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ ও সংগঠন

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে সরকারের পক্ষে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ সম্ভব নয়। আবার প্রতিটি বিষয়ের বিভিন্ন পাঠের জন্যে একাধিক শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্য শিক্ষক স্ব-উদ্যোগে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা দেশজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সহজেই বিভিন্ন উপকরণ যেমন- চার্ট, নকশা, মডেল, যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারেন। এসব উপকরণ তিনি অনেক সময় বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করতে পারেন কিংবা বাড়িতে পরিত্যক্ত বিভিন্ন দ্রব্য বা পরিবেশ থেকে স্বল্পমূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে বিষয়সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি করতে পারেন। শিক্ষক কর্তৃক সংগৃহীত বা তৈরিকৃত এসব উপকরণই হল শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ।

শিক্ষা উপকরণ দামী কিংবা বিখ্যাত স্থান থেকে সংগৃহীত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আশেপাশে সহজেই পাওয়া যায় এমন উপাদান বস্তু সামগ্রী সংগ্রহ করে উপকরণ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক উদ্ভাবনীমূলক ক্ষমতার অধিকারী হলে সহজেই নিম্নবর্ণিত উপকরণ তৈরি করতে পারেন:

- কাঠের টুকরা, কাগজ, হার্ডবোর্ড, পেরেক, সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে, বাসগৃহ, আসবাবপত্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি।
- প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, সূর্যের ঋতুভিত্তিক অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কিত চার্ট, বিবরণী ইত্যাদি।
- তামার পাত, বৈদ্যুতিক তারের ছেঁড়া টুকরা, পুরাতন ব্যাটারি ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।
- কৃষি কাজে প্রয়োগ করা যায় এমন তথ্য সম্বলিত চার্ট, নির্দেশনা তালিকা ইত্যাদি।
- বাঁশ, কাঠ ও টিনের খন্ডিত অংশ ব্যবহার করে বিভিন্ন হাতিয়ারের মডেল ইত্যাদি।
- প্লাস্টিকের তৈরি পানির বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, স্যালাইন সেট ইত্যাদি ব্যবহার করে বিজ্ঞানের নানারকম যন্ত্রপাতি, পরিমাপক যন্ত্র, মাপচোঙ, বিকার, সিলিন্ডার, ফানেল ইত্যাদি।
- থার্মোফোম, মোম রঙ, হার্ডবোর্ড ব্যবহার করে নিষেক প্রক্রিয়ার মডেল তৈরি করা যেতে পারে।
- কাঁচের পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে শিক্ষক প্রকৃত বস্তু সংরক্ষণ করতে পারেন।
- বিভিন্ন প্রকার চার্ট, যেমন- পরিসংখ্যান চার্ট, বৃক্ষ চার্ট, প্রবাহ চার্ট তৈরি করে তা শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে পারেন।
- বিভিন্ন প্রকারের বাস্তব উপকরণ যেমন- তাজাফুল, পাতা, পত্রিকার কার্টুন, ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন।
- এছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করেও বাস্তব ধারণা দিতে পারেন।

স্ব-উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল

শিক্ষক বিষয়সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের ও তৈরির জন্য নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারেন:

- বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করা।
- তালিকায় বর্ণিত উপকরণ বা এর উপাদান আশেপাশের পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় কি না অর্থাৎ সহজলভ্য কি না তা বিবেচনা করা।
- বিনামূল্যে উপকরণ সংগ্রহ করার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া।
- সংগৃহীত উপকরণটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় কি না বিবেচনা করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, সামর্থ্য ও রুচির প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করার পরিকল্পনা করতে হবে।
- সম্ভাব্য উপকরণটি শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সহায়ক কি না তা বিবেচনা করতে হবে।
- একই উপকরণ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার করা যায় কি না তা খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষা উপকরণ শ্রেণি উপযোগী কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

শিক্ষক সৃষ্ট উপকরণ সংগঠন

উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করার পর তা সংগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উপকরণ সংগঠনের জন্য শিক্ষকের নিম্নে উল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করতে হয়:

- চার্ট, ছবি ইত্যাদি উপকরণ দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে ভাল থাকে। তাই এর ওপর কাগজ বা পলিথিনের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে
- ঔষধের কার্টুন বা অন্য যে কোন খালি কার্টুনে তৈরিকৃত ছোট ছোট মডেল যত্নে সংরক্ষণ করতে হবে;
- মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি উপকরণগুলো শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কাঠের স্ট্যান্ডে রোল করে সংরক্ষণ করতে হবে;
- অপেক্ষাকৃত মূল্যাবান উপকরণ যেমন- যন্ত্রপাতি, ল্যাপটপ, রেডিও, টিভি ইত্যাদি আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে;
- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য স্টক বই রাখা প্রয়োজন;
- বিভিন্ন প্রাণির ও উদ্ভিদের বাস্তব নমুনা কাঁচের বোতলে ফরমালিন দ্বারা সংরক্ষণ করা যায় এবং বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়ে এদের বৈজ্ঞানিক নাম, সংগ্রহের তারিখ এবং প্রাপ্তিস্থান লিখে আলমারি অথবা খোলা র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা যায়;
- নামের আদ্যক্ষর অনুসারে গ্রুপ অনুযায়ী যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে হবে;
- পরীক্ষাগারেরর ব্যবহারিক কাজের টেবিলের ওপর টেবিলের নিচে, কাঁচ বা স্টীলের আলামারিতে, খোলা র‍্যাক বা দেয়ালের তাকে অথবা মেঝেতে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখতে হবে;
- লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি ভেসলিন লাগিয়ে রাখতে হবে;
- প্রতিবার ব্যবহারের পর যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে রাখা প্রয়োজন;
- সহায়ক গ্রন্থ বা ম্যানুয়াল আলমারিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

উপকরণগুলো সযত্নে সংরক্ষণের জন্য প্রধান শিক্ষক নির্দিষ্ট কোন শিক্ষককে দায়িত্ব দিতে পারেন। উপকরণগুলো সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য উপর্যুক্ত কৌশলগুলো কার্যকর।

৮.৩ শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার এবং উপকরণ সংরক্ষণের উপায়

হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটি আনন্দদায়ক হয়। এর একটি অন্যতম কৌশল হল উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক গৃহ, বিদ্যালয়ের আশেপাশের অব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে তা পরবর্তীতে ব্যবহারের নিমিত্ত সংরক্ষণ করতে পারেন।

শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থী কর্তৃক সংগৃহীত অথবা তৈরিকৃত যেসব শিখন সামগ্রি ব্যবহৃত হয় সেগুলোই হলো শিক্ষার্থী সৃষ্ট উপকরণ। শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রী প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করাতে পারেন বা তৈরি করাতে পারেন। এজন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কলাকৌশল শেখাতে পারেন। পাঠদান অনুশীলন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে তা ব্যবহার করতে পারেন। এসব উপকরণ বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট, সহজলভ্য এবং শ্রেণিতে ব্যবহারযোগ্য হলেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে তা তৈরি ও সংগ্রহ করাতে পারেন।

শিক্ষার্থী কর্তৃক সৃষ্ট শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহের কৌশল

শিক্ষার্থীরা তাদের আশেপাশের পরিবেশ থেকে সহজলভ্য উপকরণ অথবা শিক্ষা সফরে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে ব্যতিক্রমধর্মী উপকরণ বা উপকরণ তৈরির উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে পারেন। এগুলো সংগ্রহের কৌশল নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, মানচিত্র, সংবাদচিত্র;
- বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ক্যালেন্ডারের ছবি;
- মাটির তৈরি বিভিন্ন মডেল;
- ব্যবহৃত খালি বাক্স, টুকরা টিন, তার, লোহার পেরেক , কার্টুন ইত্যাদি;
- বাঁশ ও বেতের তৈরি মডেল;

- পুরাতন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন-বাল্ব, রেডিও, ঘড়ি, কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ, ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি;
- বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সভ্যতা,সংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ পোশাক,আসবাবপত্র, ছবি, চিত্র ইত্যাদি;
- শিক্ষা সফরে গিয়ে বিভিন্ন প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছপালা, গাছের নমুনা, শৈবাল, ছত্রাক,সামুদ্রিক মাছ, কীটপতঙ্গসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

শিক্ষার্থী কর্তৃক উপকরণ (যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম) তৈরির কৌশল

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন উপকরণ তৈরির কৌশল শেখাতে পারেন। বিভিন্ন বিষয়বস্তু পাঠদানের সাথে সংশ্লিষ্ট চার্ট, মডেল, গ্রাফ, সারণি, ছবি,যন্ত্রপাতি,সরঞ্জাম ইত্যাদি হাতের কাজ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি করাতে পারেন। নিম্নে স্বল্পমূল্যের উদ্ভাবনীমূলক কতিপয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম তৈরির উপকরণসহ নির্মাণকৌশল এবং ব্যবহার বর্ণনা করা হলো-

স্বল্পমূল্যে তৈরি বা হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি

হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিখতে পারলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আনন্দ পায় ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় গৃহ বা আশেপাশে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে কিছু কিছু উপকরণ তৈরি করতে পারেন। যেমন –

স্পিরিট ল্যাম্প : ছোট আকারের কাচের বোতল বা কালির দোয়াত, কাপড়ের সলতে ব্যবহার করে এটি তৈরি করা যেতে পারে।

লিবিগ কনডেন্সার : ধাতু বা টিনের মোটা পাইপ, রাবার কর্ক, ধাতুর চিকন পাইপ ব্যবহার করে এটি তৈরি করা যায়। **বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ যন্ত্র :** একটি প্লাস্টিকের বাটি, দু'টি তামার বড় রড বা কার্বন দন্ড, কিছু তামার তার, দু'টি টেস্ট টিউব, হোল্ডারসহ দু'টি ব্যাটারি প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে এটি তৈরি করা যায়।

বুনসেন বার্নার : কাঠের টুকরা বা পরিত্যক্ত লোহা, তামা বা পিতলের নল দ্বারা এটি তৈরি করা যায়।

ফ্লাস্ক : পুরানো ইলেকট্রিক বাল্ব দ্বারা এটি সহজেই তৈরি করা যায়। এছাড়াও কীটপতঙ্গ, জীবজন্তুর নমুনা, পর্বতের মডেল, বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র, থার্মোফ্লাস্ক, বিকার, তারজালি, তেপায়া,চিমটা, গ্যাসজার ইত্যাদি যন্ত্রপাতিও স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহার করে হাতে তৈরি করা সম্ভব।

অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী ও উপকরণ

উপকরণ: কিছুসংখ্যক কম্বাইটিক, প্রোনোপেন বা ঐ জাতীয় ইনজেকশনের খালি বোতল (রাবারের ঢাকনাসহ), ব্যবহৃত বলপেনের রিফিল, কিছু সংখ্যক হোমিও ওষুধের খালি বোতল, মোমবাতি, দেয়াশলাই, পটাসিয়াম ক্লোরেট, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড।

প্রস্তুতপ্রণালী– রবারের ঢাকনাটির মাঝখানে একটি ছিদ্র করতে হবে যাতে রিফিলটি শক্তভাবে আটকানো যায়;

– এবারে বোতলটির ঢাকনা খুলে তাতে সামান্য পরিমাণ পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে একটি করে যন্ত্রের সেট দিয়ে দিতে হবে।

ব্যবহার পদ্ধতি: শিক্ষার্থীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে যন্ত্রটিতে তাপ দিবে এবং খালি হোমিও বোতলগুলোতে অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করবে ও তার ধর্ম পরীক্ষা করবে।

এভাবে একই যন্ত্র দিয়ে হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসও প্রস্তুত করা যায়।

পোস্টার

উপাদান : শক্ত কার্ডবোর্ড, কাপড়, রংতুলি, পেন্সিল, কম্পাস, ট্রাইএঙ্গেল, রবার, সিমেন্ট ইত্যাদি। পোস্টার তৈরির সময় নিম্নের যেসব বিষযের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তা হলো-

- প্রথমেই একটি উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে;
- একটি শিরোনাম থাকবে;
- রঙ্গের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

পোস্টার দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় পোস্টার তৈরি করে তা জমা দিতে পারে।

চার্ট

চার্ট একটি দর্শনযোগ্য উপাদান। এটি একটি দ্বিমাত্রিক শিক্ষা উপকরণ। চার্টের সাহায্যে কোন কিছুর তুলনা করা,পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। শিখনের এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো মৌখিকভাবে বা লিখে বোঝানো যায় না, সেগুলোকে চার্টে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়। একটি কার্যকরি চার্টে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক্স, ছবি, ড্রইং, কার্টুন, নকশা, শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি প্রদর্শন করা যায়।

উপকরণ : আর্ট পেপার বা পোস্টার পেপার, কাপড়, ফেল্ট পেন যা সহজেই স্টেশনারি দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ : চার্ট তৈরি ও সংরক্ষণ একদিকে যেমন সহজ তেমনি আবার গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ। চার্ট সংরক্ষণের সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, চার্টে যেন ভাজ না পড়ে। এজন্যে চার্ট ফ্ল্যাট করে রাখতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ধুলাবালি বা পানির সংস্পর্শ থেকে রক্ষা পায়।

নিষেক প্রক্রিয়ার মডেল

পরাগায়ণ, পরাগরেণু, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের বিভিন্ন অংশ , তাদের কাজ এবং নিষেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্যে এ মডেলটি ব্যবহার করা যায়।

উপকরণ

- ৭০ সেমি দীর্ঘ ও ৬০সেমি চওড়া এক খন্ড থার্মোফোম;
- কাটার নাইফ/ধারালো ছুরি/ব্লেড
- কাঠপেন্সিল
- মোম রং
- সরু ফিতা
- শক্ত কাগজের বোর্ড/হার্ড বোর্ড
- আইকা বা গ্লু

প্রস্তুত প্রণালী

- থার্মোফোমের ওপর একটি উভলিঙ্গ ফুলের লম্বচ্ছেদের চিত্র কাঠ পেন্সিলের সাহায্যে বড় করে একে নিতে হবে;
- কাটার নাইফ/ধারালো ছুরি দিয়ে থার্মোফোম খোদাই করতে হবে;
- মোম রঙের সাহায্যে ফুলের লম্বচ্ছেদের বিভিন্ন অংশ রং করতে হবে। খুব সতর্কতার সাথে রং ব্যবহার করতে হবে যাতে মডেলের বিভিন্ন অংশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে;
- অন্য আর একখন্ড থার্মোফোম(৩০সেমি দীর্ঘ ও ৫০ সেমি চওড়া)-এর ওপর পুং ও স্ত্রীকেশরের বিভিন্ন অংশের নাম লিখতে হবে;
- এবার প্রথমে মডেলটির পেছন দিকে গ্লু লাগিয়ে মডেলটিকে শক্ত কাগজের বোর্ড বা হার্ড বোর্ডের উপর স্থাপন করতে হবে। অংশের নাম সম্বলিত থার্মোফোমটিও একইভাবে পাশাপাশি স্থাপন করতে হবে;
- সরু ফিতা দিয়ে ফুলের লম্বচ্ছেদের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হবে;
- মডেলটি আইকা গাম ও পিনের সাহায্যে আটকে দিতে হবে।

এভাবে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে নিজ উদ্যোগে বাড়ির আশে পাশের পরিবেশ থেকে পাঠ গ্রহণে সহায়ক বিভিন্ন উপাদান, বস্তু, সামগ্রী, সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সরাসরি শিক্ষককে জমা দিতে পারে অথবা তা দ্বারা নানা প্রকার উপকরণ নিজ হাতে তৈরি করে জমা দিতে পারে। প্রতি বছর এসব উপকরণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ব্যাপারে উৎসাহ আরো বেড়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিখন সামগ্রী বলতে কী বোঝায়?
২. শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ বলতে কী বোঝায়?
৩. কার্যকরী শিখনে শিক্ষা উপকরণের ভূমিকা উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষা উপকরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
৫. ব্যবহারের গুণাগুণের ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষক সৃষ্ট কয়েকটি উপকরণের নাম উল্লেখ করুন। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি কীভাবে এ উপকরণগুলো তৈরি করবেন? কীভাবে এ উপকরণগুলো সংরক্ষণ করবেন?
২. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য একজন শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করবেন? শিক্ষার্থী কর্তৃক সৃষ্ট উপকরণ কীভাবে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ৯ : পেশাগত উন্নয়নের উপায় ও দক্ষতা

গুণগত শিক্ষা নিশ্চয়নের সাথে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন জড়িত। প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবসময়েই সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই শিক্ষকের ভূমিকাকে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সহায়তাকারী হিসেবে মানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকের প্রতিনিয়ত পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজন। পেশায় সার্বিক সাফল্য অর্জন ও শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী সদস্য হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। পেশাগত উন্নয়ন একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। কোন ধরনের বিরতি ছাড়াই এটি সবসময় হতে থাকে। তবে কিছু বিষয় পেশাগত উন্নয়নের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে, যেমন- ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক প্রভাব, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য, সুযোগ ইত্যাদি। পেশাগত উন্নয়নের উপায় ও দক্ষতাসমূহ আলোচনার অংশ হিসেবে এই অধ্যায়কে নিম্নোক্তভাবে সাজানো হয়েছে-

৯.১ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারণা, গুরুত্ব ও পেশাগত উন্নয়নের উপাদান;
৯.২ চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন;
৯.৩ পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা;
৯.৪ পেশাগত শিখন সমাজ (পিএলসি) ও এর গুরুত্ব;
৯.৫ ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনলিপির প্রয়োজনীয়তা ও উন্নয়ন কৌশল;
৯.৬ প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিফলন দিনলিপি, পাঠদান অনুশীলন জার্নাল, শিক্ষক প্রশিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, পর্যালোচনা ও অনুশীলন;

৯.১ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারণা, গুরুত্ব ও পেশাগত উন্নয়নের উপাদান

পেশাগত জীবনের প্রতিটি স্তরে একজন শিক্ষক যতটুকু মেধা, মননশীলতা, ভালোবাসা ও সৃজনশীলতা প্রয়োগ করতে পারবেন শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষা ততই নিশ্চিত হবে। সমাজের সকল স্তরের শিক্ষকের দুটি যোগ্যতার প্রয়োজন- বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা। একজন শিক্ষককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য অবশ্যই উচ্চতর একাডেমিক সার্টিফিকেট অর্জন করতে হবে। পেশাগত জীবনের নানা দিক বিবেচনায় যে দক্ষতাগুলোর প্রয়োজন সেগুলো পেশাগত যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত। পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এবং বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের পর পেশাগত সফলতা অর্জনের জন্য প্রতিনিয়ত পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন।

পেশাগত উন্নয়ন

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়, জীবন এখন প্রযুক্তি নির্ভর। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও প্রযুক্তির আশীর্বাদের বাইরে নয়। এর মাধ্যমে তাদের চাহিদার বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটছে বেশি। ফলে একই শ্রেণিতে এখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা শুধুমাত্র প্রযুক্তির মাধ্যমেই হচ্ছে তা নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যত বেশি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে তাদের চাহিদার বৈচিত্র্যের পরিমাণও তত বাড়বে। ক্রমবিকশিত প্রযুক্তি এখানে নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে কারণ এর রয়েছে সুবিশাল তথ্য ভাণ্ডার যার মাধ্যমে নিমিষেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়, আগ্রহের বিষয়বস্তুকে জানার সুযোগ বৃদ্ধি করে দেয় এবং এর মাধ্যমে তাদের মনোযোগ বহুমুখী হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। এইসব বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষার্থীদেরকে নিয়েই শিক্ষকগণকে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিখন উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন ক্রমাগত দক্ষতার উন্নয়ন বা পেশাগত উন্নয়ন।

পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি পেশার সাথে প্রয়োজনীয় এবং নবতর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন সাধন করেন। পেশায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পেশাগত উন্নয়ন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত একজন সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠেন। শিক্ষার্থীরা কী শিখতে চাচ্ছে, কীভাবে শিখতে চাচ্ছে, তাদের আগ্রহ কতটুকু ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকের সচেতন থাকতে হয়। পাশাপাশি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, কোন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষক সাবলীল, তাঁর প্রয়োগকৃত পদ্ধতিগুলো কতটুকু ফলপ্রসূ, শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আরো কী ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন ইত্যাদি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণই হলো পেশাগত উন্নয়ন।

যে কোনো মানুষের জীবনে সাফল্য আনতে হলে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন। পেশাগত দক্ষতা অর্জন ব্যতীত প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা যায় না। অন্যান্য পেশার তুলনায় শিক্ষকতা পেশায় তা অধিক মাত্রায় প্রযোজ্য। কারণ শিক্ষকগণকে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কারিগর হিসেবে কাজ করতে হয়। এই পেশার উন্নয়নে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। একজন শিক্ষককে তাঁর পেশার উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিনিয়ত নব নব জ্ঞান ও কৌশলের সন্ধান করতে হয়। পাঠদানকে সফল করতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার সন্ধানে নিরলস প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়। শিক্ষকের পেশাগত মূল্যবোধ, আত্মপ্রত্যয় ও বোধগম্যতার সমন্বয় ঘটিয়ে শ্রেণি-পাঠদান সার্থক করতে হয়। আর এসব পদ্ধতি ও কৌশলকে আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হয়।

পেশাগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য

কার্যকর শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষক। শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক কাঠামোকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করার জন্য ও শিক্ষার্থীর আবেগকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন। বিষয়জ্ঞান অর্জনের পর পেশাগত দক্ষতার বুনিয়াদি স্তর সম্পন্ন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর পেশায় সফলতা অর্জন করতে পারেন না। শিক্ষককে প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন জ্ঞান, যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যসমূহের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের শিক্ষাদান পদ্ধতিগত ও শিক্ষা বিজ্ঞানের জ্ঞান বৃদ্ধি;
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষাতা বৃদ্ধি;
- পেশার প্রতি দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা;
- পেশায় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করা;
- পেশাগত নীতি জানা ও মেনে চলার অভ্যাস তৈরি করা।

পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক পেশার মানুষের কিছু পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে যা তার পেশাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। একইভাবে যাঁরা শিক্ষক তাঁদের কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তাঁর সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই তার থেকেও তা কীভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেই হবে না, যে বা যারা তা গ্রহণ করছে তা তারা আদৌ গ্রহণ করতে পারছে কিনা, পারলেও কতটা গ্রহণ করতে পারছে ইত্যাদিও দেখার বিষয়। আর তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন- দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান। শিক্ষকগণের সে সকল দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের জন্যই প্রয়োজন পেশাগত উন্নয়ন।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিশুদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন শিশু বিভিন্নভাবে শিখে থাকে। একজন শিক্ষককে একুশ শতকের শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের জন্য সর্বপ্রথম তাঁকেও একুশ শতকের উপযোগী শিক্ষক হতে হবে। চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষকগণের দক্ষতাকে শক্তিশালী করার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে। ফলপ্রসূ পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া একদল শিক্ষককে তাদের শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিশ্লেষণে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্য অর্জনকে নিশ্চিত করে।

মাঝে মাঝে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যেমন- বিষয়ভিত্তিক নতুন নতুন পরিবর্তন, নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, নতুন আইন ও প্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর নিত্যনতুন চাহিদা। যদি শিক্ষক এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ না হন এবং নিজের দক্ষতার উন্নয়ন না করেন তবে শিক্ষার্থী ভোগান্তির শিকার হয়। পাশাপাশি একজন নতুন শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয়ের অনেক ব্যাপারই নতুন থাকে, যেমন-শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, নির্দেশনা, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, আদর্শমান, অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক এবং অন্যান্য শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক। নতুন শিক্ষকের জন্য এই অপরিচিত বিষয়গুলো অনেক সময় বিড়ম্বনা তৈরি করে। তাই তাঁর জন্য পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই।

Arends (2001) বলেছেন - Effective teaching requires careful and reflective thought about what a teacher is doing and the effect of his or her action on students- অর্থাৎ শিক্ষক কী করছেন এবং শিক্ষকের কার্যাবলি শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং একাডেমিক শিখনে কী প্রভাব ফেলছে তার ওপর নির্ভর করে কার্যকর শিখন। কার্যকর শিখনের পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে Wong এবং Wong(১৯৯৮) বলেছেন- Touch the life of a student, and you will have a student who will learn history, physical education and even science and math, clean and erasers, staple all the papers and turn wheel to please you-অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার শিক্ষার্থীর জীবনের স্পন্দনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এতে করে আপনি এমন এক শিক্ষার্থীকে পাবেন যে ইতিহাস, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, গণিত সববিষয় শিখবে, নিজের অন্যসব কাজ করেও আপনাকে খুশি রাখবার সবরকম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। শিক্ষককে তাই তাঁর পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে। শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণের জন্য নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে হবে, শিক্ষার্থীদের চাহিদা বুঝতে হবে, তাদের সামর্থ্য অনুধাবন করতে হবে, নিজের দুর্বলতা অনুসন্ধান করতে হবে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য নিত্য নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ করতে হবে, নতুন জ্ঞান সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। সার্বিকভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজে নিজেকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। অন্যথায় এর প্রভাব পড়বে সরাসরি শিক্ষার্থীদের ওপর। ফলে তারা বিদ্যালয় বিমুখ হবে, বিদ্যালয়ে শেখার তুলনায় প্রাইভেট বা কোচিং এর প্রতি বেশি আগ্রহী হবে, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। সর্বোপরি শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন বিঘ্নিত হবে।

পেশাগত উন্নয়নের ধরন ও উপায়

"Professional development is defined as activities that develop an individual's skills, knowledge, expertise and other characteristics as a teacher."অর্থাৎ পেশাগত উন্নয়ন আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক বিভিন্নভাবে হতে পারে।

এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন কোর্স, ওয়ার্কশপ, আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট কোর্স অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা কিনা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে বা শুধু একটা বিদ্যালয়েও অনুষ্ঠিত হতে পারে। পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে আছে- নিজস্ব পড়াশোনা, অনলাইন কোর্স, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স (যেমন-বি.এড, এম.এড, এম.ফিল,ডক্টরেট), বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত বা দলীয় গবেষণা, নির্ধারিত বিষয়ে সহকর্মীদের মধ্যে আলোচনাচক্র বা পাঠচক্র, জোড়ায় ক্লাস মূল্যায়ন, অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক অন্য শিক্ষকগণের কোচিং, অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক নব্য শিক্ষকগণের মেন্টরিং, শিক্ষা বিষয়ক কনফারেন্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, অন্যান্য সফল বিদ্যালয় পরিদর্শন ইত্যাদি।

শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন বিভিন্ন সময়ে আয়োজন করা যেতে পারে। যেমনঃ স্কুল চলাকালীন, ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে বা পরে, স্কুল ছুটির পরে শিক্ষকগণের নিজস্ব সময়ে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি বা অন্যান্য ছুটির সময়ে। কোথায় আয়োজন করা যেতে পারে? পেশাগত উন্নয়ন কেন্দ্রে, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে, শিক্ষা অফিসের কোনো কক্ষে, কোনো বিদ্যালয়ে, যেকোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অনলাইনে।

পেশাগত উন্নয়নের উপাদান

শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা হলো জন্মগত ও অর্জিত গুণাবলির সমষ্টি। অর্থাৎ একজন শিক্ষক জন্মগতভাবে কিছু গুণ অর্জন করেন যা সংখ্যায় নগন্য। অবশিষ্ট সব গুণ তাকে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যাবলির দ্বারা অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন না করেও কেবল পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা একজন আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হওয়া যায়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হলে তাঁর মধ্যে এমন কিছু গুণের সংযোজন করতে হবে যা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রতিদিন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একইভাবে শ্রেণিপাঠ পরিচালনা করা কোন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকেই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো-

বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

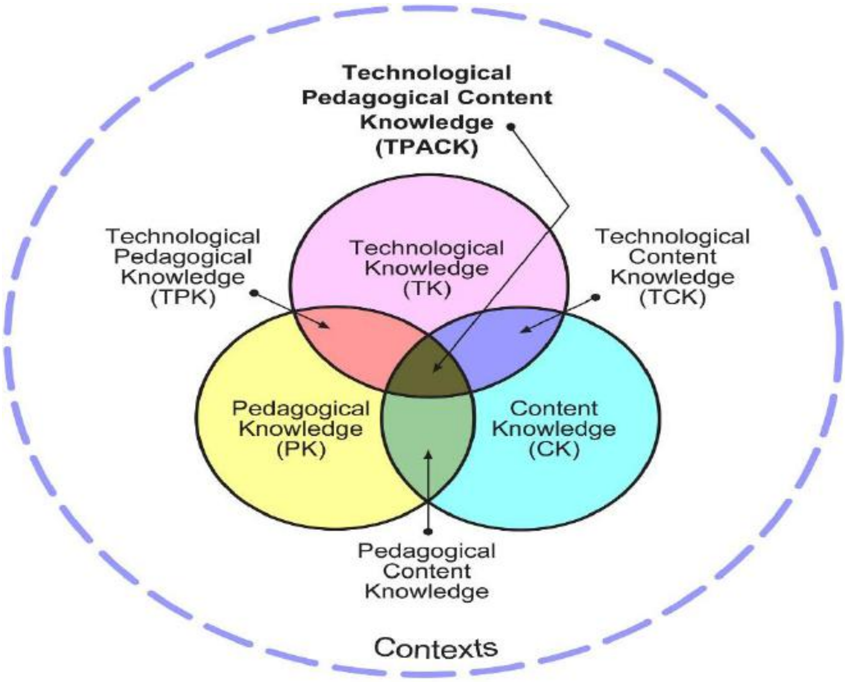

চিত্র ১৩: বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই তাঁর পঠিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হয়। তাই শিক্ষক হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। তবে সব ভালো ছাত্র সবসময় ভালো শিক্ষক হয় না। এর কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপন দক্ষতার ঘাটতি। উপস্থাপন দক্ষতার অভাবের কারণে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন অনেক ভালো ছাত্রও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। শ্রেণিপাঠদানে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী থাকে, শিক্ষার্থীদের আগ্রহের পার্থক্য থাকে, তাদের গ্রহণ কৌশলের বিভিন্নতাও থাকে। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিয়েই সফলভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে শিক্ষককে তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থীর কাছে তা সমানভাবে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে শিখনফল সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলোই হল পেডাগজি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে এই পদ্ধতি ও কৌশল বা পেডাগজি বিভিন্ন রকম, যেমন- গণিতের পেডাগজি ও ইংরেজির পেডাগজি এক হবে না। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর বিষয় সংশ্লিষ্ট পেডাগজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বর্তমানের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করার আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হল আইসিটি। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিমূর্ত বিষয়কে মূর্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের। এই তিনটি বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আনন্দদায়ক পরিবেশে কার্যকর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। তাই বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরুপূর্ণ উপাদান।

সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও দৃষ্টি বিনিময়

শিক্ষকের সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক দৃষ্টি বিনিময় বা Eye Contact শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শিক্ষকের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব বা কোন মুদ্রাদোষ থাকে যা শিক্ষার্থীদের কাছে তার পাঠকে হাস্যরসে পরিণত করে। এরফলে শ্রেণিকার্যক্রম ব্যহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিখন ব্যহত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সঠিক Eye Contact-এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগিতা বা অমনোযোগিতা নির্ভর করে শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact-এর ওপর। শিক্ষক যখন পড়াবেন বা যখন প্রশ্ন করবেন তখন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact-এর মাধ্যমে তা করতে হবে। অঞ্চলিকতা পরিহারপূর্বক সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও সঠিক Eye Contact-এর কৌশল রপ্ত করার জন্য শিক্ষককে সবসময় পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অধ্যবসায়ের মধ্যে থাকতে হয়।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন

শিক্ষককে বিদ্যালয় ও সমাজে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার নেতৃত্বের গুণাবলি। নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ব্যতীত বিদ্যালয় ও সমাজের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার গুলাবলি প্রকাশিত নাহলে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীদের আচরণেও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাবে। তাই শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ নেতা। পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও সহায়ক গ্রন্থাবলি পড়ার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর নেতৃত্বের গুনাবলির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

মূল্যায়ন দক্ষতা

মূল্যায়নের সাহায্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বুঝা যায় তেমনি শিক্ষক কতটুকু সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছেন তা আবিষ্কার করা যায়। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। মূল্যায়ন দুই প্রকার, যথা গাঠনিক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই নির্ভর করে শিক্ষকের মূল্যায়ন দক্ষতার ওপর। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে স্বল্প সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শ্রেণিপাঠের কার্যকারিতা যাচাই ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কতটুকু হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ নির্ভর করে একজন শিক্ষক আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন কিনা তার ওপর। তাই মূল্যায়নের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দক্ষতা

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শিক্ষককে প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু পড়াবেন, পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষার্থীরা কখন, কোথায়, কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কত সময় ধরে পড়াবেন, পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এভাবে একটি সেসনের উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করাকে পাঠ পরিকল্পনা বলে। পাঠ পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে একটি পাঠের প্রতিটি মূহুর্ত সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্বধারণা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। ফলে পাঠদান সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সঠিক পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের শিখনফল অর্জন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বিক্ষিপ্ত শিখন থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখে ও পাঠকে আনন্দদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করে পাঠ পরিকল্পনা । কাজেই পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষকগণের পেশগত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান।

নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা

শিক্ষককে হতে হবে উদার। নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করতে হবে । জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে, নতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, পুরাতন জ্ঞানের পরিমার্জন ও সংশোধন হচ্ছে। শিক্ষককে এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে । শিক্ষার্থী ও সমাজ উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা প্রয়োগ করতে হবে। নতুন জ্ঞান,প্রযুক্তি ও ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, প্রযুক্তি উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন এবং শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কিত নতন নতুন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী হিসেবে তৈরি করবেন।

পেশাগত শিখন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষকগণ তাদের পেশা সম্পর্কিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আদর্শ মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করেন, নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে কর্ম-সম্পর্ক ভালো রাখেন, স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যালয়ের রূপকল্প (Vision), ব্রত (Mission),সংস্কৃতি (Culture)ও দর্শন (Ethos)এর সাথে অভিযোজিত হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন

এমন অনেক মানুষ আছে যারা যেকোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত উন্ননের মাধ্যমে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করবেন যেন যেকোনো ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং যেকোনো ধরনের পরিবর্তনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন।

সহকর্মীদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা

সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক মূলত বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। শিখন পরিবেশ বিঘ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিখন সম্ভব হয় না। তাছাড়া সহকর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন করা যায়। কাজেই সহকর্মীদের সাথে ভালো ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা একজন শিক্ষকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।

৯.২ চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান ও আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রশিক্ষণ হতে পারে শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক বা শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য। আবার প্রশিক্ষণের মেয়াদের ভিত্তিতেও প্রশিক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায় হিসেবে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর উপায়। পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ একজন আদর্শ শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য এখানে পেশাগত উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পেশাগত উন্নয়নের উপায়

সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধন করে চলার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিখন-শেখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন যেন শিশু কিশোর, তরুণদের আচার আচরণে প্রতিফলিত হতে পারে, দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেন দেশের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণের পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যাংকিং মেথড যেখানে শিক্ষক সকল জ্ঞানের আধার এবং তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে জ্ঞান বিতরণ করতেন- যা এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে শিখতে চায়, যেভাবে শেখালে তাদের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে শিক্ষককে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় এবং শিক্ষক হবেন সহায়তাকারী (Facilitator) | নতুন জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে পড়াতে হবে। তাই নবতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষকদের চিন্তা ও কর্মধারা পরিমার্জন করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে হবে। যেমন: প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নিয়মিত অধ্যয়ন, ইন্টারনেট ব্যবহার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি।

এখানে পেশাগত উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

পেশাগত প্রশিক্ষণ

পেশাগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকতাপূর্ব শিক্ষণের ন্যায় শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা শিক্ষকদের জন্য আবশ্যক। শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন শিক্ষকই চলমান দুনিয়ার নবতর চিন্তা ও কর্মধারার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সাম্প্রতিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন না। শিক্ষাবিদ মার্গারেট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে শিক্ষকদের অবিরাম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়- To keep abreast of a changing world ……………..

প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশা নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন নিজেকে সজীব, প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন তেমনি নিজ পেশাকে যুগোপযোগী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করার অবকাশ পাবেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। পেশাগত উন্নয়নের জন্য ২ ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে, যেমন:

- চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ ও
- চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হল পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক পেশার মানুষের কিছু পেশাগত দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে যা তার পেশাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। একইভাবে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তাঁর সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই, তার থেকেও তা কীভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেই হবে না, যে বা যারা তা গ্রহণ করছে তা তারা আদৌ গ্রহণ করতে পারছে কিনা, পারলেও কতটা গ্রহণ করতে পারছে ইত্যাদিও দেখার বিষয়। আর তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান। শিক্ষকদের সে সকল দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষক সুলভ আচরণ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নতমানের শিক্ষক-শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষক তথা টিচার এডুকেটর, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাদি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল, প্রযুক্তির ব্যবহার ও কারিকুলামের সঙ্গে মেলবন্ধন, তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ তথা অনুশীলন, মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মনোজগৎ তৈরির জন্য কাঠামোবদ্ধ বলয়ের মধ্যে প্রস্তুতির পর্বই হল চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ।

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যই চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ । এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্বসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, অভিভাবকদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে হবে, সমাজে কী ধরনের আচরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ পূর্ব ধারণা লাভ করেন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষকতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ

যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের শিক্ষকতা পেশার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকা তথা শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয় শিক্ষকতাপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন

শিক্ষকের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু বুঝতে পারছেন, তাদের আচরণ কতটুকু ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, তাদেরকে কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন, তাদের মনোজগতকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন ইত্যাদির ওপর। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা এবং শিখন প্রক্রিয়াকে সেইভাবে চালিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যেখানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি ও পুনর্গঠনে ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ও তথ্য দিয়ে সহায়তা

করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে- শিশু, প্রেষণা, আবেগ, বুদ্ধিমত্তা, মনঃস্তত্ত্ব, মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদি। শিক্ষকতাকে যারা ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তারা চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপন

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কতগুলো উপাদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপাদান গুলো হলো-শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়,পরিবেশ, পরিবার ইত্যাদি। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। শুধু একটি বা দুটি উপাদান দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, শিক্ষার্থী কোন ধরনের পরিবার ও পরিবেশ থেকে এসেছে, বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ কী রকম ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতি। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণকালীন তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই প্রস্তুতি নেওয়া যায়।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন

চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বেই শিক্ষকতা পেশায় যোগদানে আগ্রহী ব্যক্তিগণ শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। যা পরবর্তীতে তার পেশার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য যোগদানপূর্ব পাঠ পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী একজন নবীন শিক্ষকও শ্রেণিকক্ষের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজেই বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিপাঠে মনোযোগী রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠকে আনন্দদায়ক করতে পারেন। পাঠের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শিখনফল অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন ।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন

নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা শিক্ষকতা পেশার একটি অন্যতম উপাদান। শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ নেতা। একজন শিক্ষককে সামাজে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়। শিক্ষকতা পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা করা হয়।

নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী

শিক্ষকগণের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা এই দুটি গুণ খুব ভালোভাবে আয়ত্তে রাখতে হয়। এজন্য যারা শিক্ষকতাকে ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তাদের পূর্ব থেকেই নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হতে হবে এবং চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও জাতীয় দিবস উদযাপনে পারদর্শিতা অর্জন

বিদ্যালয়ের যেসব রুটিনমাফিক বা দৈনন্দিন কার্যাবলি রয়েছে সেগুলো পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী অর্জন করেন যা একজন নবীন শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে হয়। জাতীয় দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন সম্পর্কে ভবিষৎ শিক্ষকগণ চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

বিদ্যালয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ মোকাবিলার প্রস্তুতি

শিক্ষককের যে কোন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর প্রস্তুতি থাকতে হবে। তা নাহলে বিদ্যালয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ মোকাবিলা করতে পারবেন না, ফলে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষককে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষক এই প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice)ও সিমুলেশন পর্বে প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় যা তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ বলতে মূলত বিএড (B.Ed- Bachelor of Education) কে বুঝায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেশের ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এই ০১ বছর মেয়াদী বিএড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেশকিছু বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিএড চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিএড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে দ্রুত ০১ বছর মেয়াদী বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সকল

এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণকে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য ইতোমধ্যে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণের আওতায় চলে আসবেন। বর্তমানে ১৪টি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ০১ বছর মেয়াদী বিএড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ০১ বছর মেয়াদী এমএড কোর্সও চালু রয়েছে। তাছাড়া সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষা বিষয়ে চার বছর মেয়াদী বিএড (সম্মান) কোর্স চালু হয়েছে। ফলে এখান থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করে বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। বাংলাদেশের সকল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বিএড ও এমএড ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IER-Institute of Education and Research) বাংলাদেশে শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণায় দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ১৯৬০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিয়োজিত রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরও শিক্ষা বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে আরো কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ক অনুষদ বা ইন্সটিটিউট চালু করা হয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনুষদ থেকে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (সম্মান), মাস্টার্স ইন এডুকেশন, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়ে থাকে।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে যে প্রশিক্ষণ তাই চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ। চাকুরিতে যোগদানের পর পেশাগত বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়, যেমন- বিষয়ভিত্তিক, পেডাগজি (Pedagogy) বিষয়ক, আইসিটি বিষয়ক, প্রশাসনিক, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে মূলত শিক্ষকগণকে যুগোপযোগী রাখার জন্য, নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষককে পরিচিত করার জন্য, শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতাসমূহ নতুন করে অর্জন করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন বিষয়সমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজন চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকেন এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করতে সমর্থ্য হন এবং নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ ও নিজের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে তাতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য হলো-

- চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ
- নির্দিষ্ট বিষয় বা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- সব প্রশিক্ষণ সবার জন্য প্রযোজ্য নয় (One shirt does not fit to all)

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

চাকুরিকালীন সময়ে শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি। পেশা সংশ্লিষ্ট সকল নতুন পরিবর্তনের সাথে শিক্ষককে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নতুন চাহিদা পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে জানতে হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ।

- শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা;
- একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি বা অর্জন করা;
- শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা;
- শিক্ষকগণের আচরণে পরিবর্তন সাধন করা;
- শিক্ষকগণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা;
- পেশায় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি;
- সকল বিদ্যালয়ে একই মানের শিক্ষক তৈরি করা;
- Low-cost, No-cost উপকরণ তৈরির দক্ষতা অর্জন;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষকগণের নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারা;
- শিক্ষকগণকে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ করা।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে সাধারণত সব ধরনের শিক্ষকের জন্য একই প্রকার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এটি প্রশিক্ষণের অন্যতম সীমাবদ্ধতা। নবীন শিক্ষক ও প্রবীন শিক্ষক, পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পূর্বপ্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক সবার চাহিদা আলাদা। কিন্তু তাদের জন্য একই ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে কোন শিক্ষকের নিকটই তা পর্যাপ্ত হবে না।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের প্রণোদনার স্বল্পতা রয়েছে। এটি আমাদের দেশের জন্য আরেকটি প্রধান সমস্যা। শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো শিক্ষকদের অনাগ্রহ। শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কোন আগ্রহ তাদের তৈরি হয় না। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য শিক্ষকদের যথাযথভাবে উৎসাহ প্রদান করেন না। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেন।

অনেকক্ষেত্রেই চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণগুলোতে যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয় না। প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত কোর প্রশিক্ষকগণ শিক্ষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত থাকেন না ফলে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়।

প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ যোগ্যতা (Competence) থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একজন প্রশিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ব প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণবিহীন প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। ফলে প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থা বা বিভিন্ন প্রকল্প হতে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হলেও তাদের নিজস্ব ও যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা নেই। ফলে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই করার সুযোগ থাকে না।

প্রশিক্ষণের সাথে সঙ্গতিহীন কারিকুলাম চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের গুণগত মানের অবনমন ঘটায়। প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত অনুশীলনের অভাব, প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সংগে প্রশিক্ষণের প্রকৃতির অসামঞ্জস্যতা, কারিকুলামের সাথে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের সময়ের অসামঞ্জস্যতা, কারিকুলামের সাথে সিলেবাসের অমিল, সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষকের দক্ষতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের মানের অবনমন ঘটায়।

পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণের অভাব চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের অন্যতম সীমাবদ্ধতা। একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেন। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের স্বল্পতা রয়েছে। শিক্ষকগণ খুব অল্প সংখ্যক প্রশিক্ষণের সুযোগ পান।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য প্রধান শিক্ষক অনেক সময় শিক্ষককে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিয়মিত ক্লাস ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এটি প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ ব্যহত হওয়ার অন্যতম কারণ।

অধিকাংশ প্রশিক্ষণই ঢাকাতে আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ অনেকসময় প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ যাতায়ত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা অনেকের নিকট কষ্টকর। এতে করে অর্থ ও সময় দুটোই অপচয় হয়। পাশাপাশি কাম্য সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর সমাবেশ না ঘটায় প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্ধকৃত অর্থেরও অপচয় হয়। তাই সকল প্রশিক্ষণকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক আয়োজন করতে হবে।

ফলো-আপ প্রশিক্ষণের স্বল্পতা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বা দক্ষতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করার পর প্রশিক্ষণার্থীরা তা বাস্তবায়নে কোনরূপ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পূর্ব প্রশিক্ষণকে নতুনরূপে শাণিত করার জন্য ও নতুন কিছু সংযোজনের জন্য প্রয়োজন ফলো-আপ প্রশিক্ষণ। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ফলো-আপ প্রশিক্ষণের স্বল্পতা রয়েছে।

বাংলাদেশের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ পর্যায়ে খুব সীমিত সুবিধা থাকলেও স্কুল পর্যায়ে কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর বা সংস্থা নেই। তবে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভিন্ন সংস্থা যেমন এনসিটিবি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ শাখা ইত্যাদি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলও শিক্ষকগণের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ হল :

- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
- পেডাগজি প্রশিক্ষণ
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ
- সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রশিক্ষণ
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- অটিজম শীর্ষক প্রশিক্ষণ
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ
- জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ
- এডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি।

খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ

খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ স্বল্প সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। এই প্রশিক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রশিক্ষণটি একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের পারদর্শিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন এনজিও, সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর বিভিন্ন শাখা খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সরকারি প্রকল্প ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এর বিভিন্ন শাখা হতে আয়োজিত প্রশিক্ষণে শুধু শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে বিভিন্ন এনজিও, বেসরকারি প্রকল্প ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের কিছু স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণে যারা শিক্ষক নন কিন্তু ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

শিক্ষকতা পেশার জন্য যেসব গুণ ও দক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় যেমন নেতৃত্বের গুণাবলি, আইসিটি দক্ষতা, পেডাগজি, আইসিটি ও পেডাগজির সমন্বয়, সৃজনশীল পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্যই মূলত খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ । খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্নবিশ্বাস তৈরি হয়, পেশাগত দায়িত্ববোধ বাড়ে, শিক্ষকদের পেশাগত যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক তৈরি হয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়নে অগ্রগামী হ'ন এবং সর্বোপরি গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ তৈরি হয়।

শিক্ষকদের জন্য খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে স্বল্প সময়ব্যাপী। কারন দীর্ঘ সময় কোন শিক্ষকের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। এরফলে প্রশিক্ষণের মানও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষকদের জন্য খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের মেয়াদ সর্বনিম্ন ০৩দিন থেকে সর্বোচ্চ ১৫দিন হলে ভালো হয়।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন

ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের (York University) Richard Gardiner প্রথম 1970 সালে Continuous Professional Development বা CPD শব্দটি ব্যবহার করেন। Chartered Institute of Personnel and development ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বা Continuous Professional Development কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-A combination of approaches, ideas and techniques that will help you manage your own learning and growth.

ইংল্যান্ড এর বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান TDA (Training and Development Agency for School) ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

"Continuing professional development (CPD) consists of reflective activity designed to improve an individual's attributes, knowledge, understanding and skills. It supports individual needs and improves professional practice."

উপরোক্ত ধারণাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন হল এমন কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও ধারণার সমষ্টি যা ব্যক্তিকে কোন কিছু শিখতে সহায়তা করে ও এর মাধ্যমে তাঁর পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সাধিত হয়।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলোকে আয়ত্তে রাখার প্রচেষ্টাকে বুঝায়। অনুশীলনের মাধ্যমে এই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কতগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু একজন নিয়মিত শিক্ষককে তাঁর পূর্বে অর্জিত দক্ষতাকে সবসময় শাণিত রাখতে হয়। নিজেকে সবসময় যুগোপযোগী বা Up-to Date রাখতে হয়। এর জন্য শিক্ষককে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মধ্যে থাকতে হয়। প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন সৃষ্ট জ্ঞান, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, নতুন প্রযুক্তি ইত্যাদির সাথে পরিচিত রাখতে হয়। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যা শিক্ষককের পেশাগত বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রতিনিয়ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে শিক্ষককে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল শিক্ষার্থীদের জন্য নতুনভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, পরিবর্তিত সমাজ, পরিবর্তিত চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন এর বৈশিষ্ট্য

- চাকুরিকালীন সময়ে এই উন্নয়ন সংগঠিত হয়;
- এই উন্নয়ন চলমান ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া;
- পূর্ব প্রশিক্ষণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে;
- One Size Doesn’t fit to all- নীতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা শিক্ষক কর্তৃক চলমান সময়ে প্রয়োগ করতে পারেন;
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে খুব সহজেই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় বা কমানো যায়;
- এটি নমনীয় প্রক্রিয়া। শিক্ষক তাঁর সুবিধা অনুযায়ী সময়ে পেশাগত উন্নয়ন এর জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন;
- দ্রুত ফিডব্যাক পাওয়া যায়, তাই কাজের মধ্যেই ফিডব্যাকের আলোকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ থাকে।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের উপায়

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নতুন চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করাই হল ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন। নিম্নে British Council কর্তৃক প্রণীত ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি Framework প্রদান করা হলোঃ

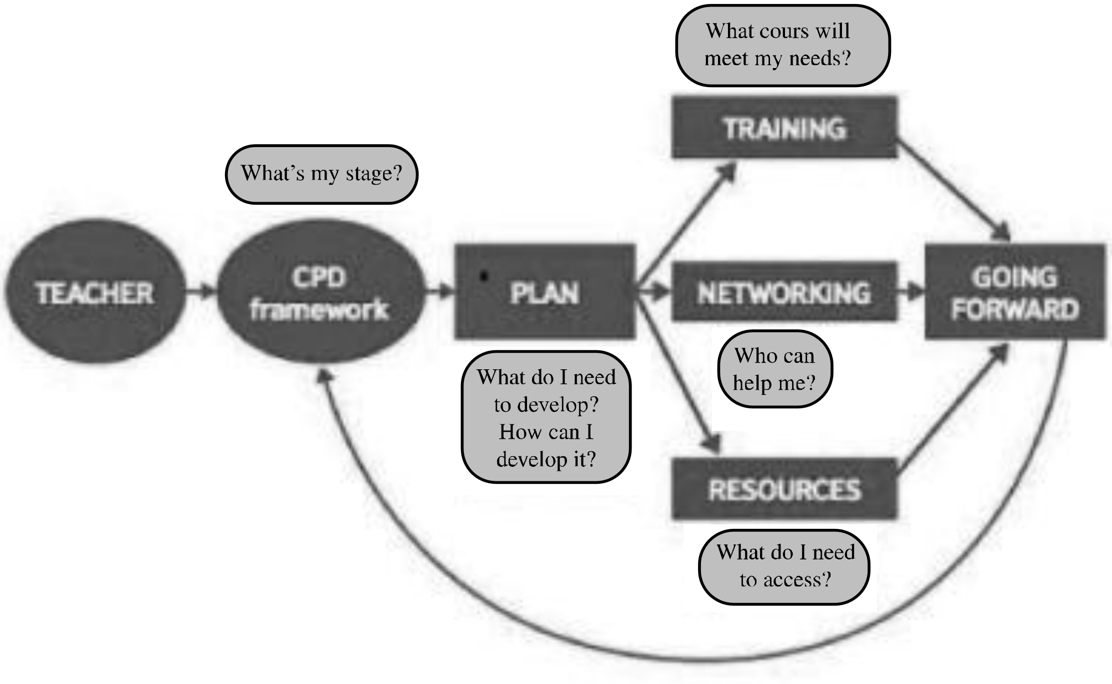

চিত্র ১৪ : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের প্রথম ধাপে শিক্ষককে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা নিতে হবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁর দুর্বলতা কোথায়, কোথায় আরো উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে এগুলো শনাক্ত করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজনে অন্য শিক্ষকের কাছে নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া যেতে পারে, অন্যকে নিজের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে অথবা অন্য শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন করে নিজের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এভাবে একজন শিক্ষক তাঁর উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবেন।

দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক পরিকল্পনা করবেন। প্রথম ধাপে চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোর জন্য তার কী প্রয়োজন, কীভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করা যায় ইত্যাদি পরিকল্পনা করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ হলো বাস্তবায়ন স্তর। পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এই স্তরে শিক্ষক কোন প্রশিক্ষণ, উপকরণ বা ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উপায়ে কোন পরামর্শ বা দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। আবার কোন উপকরণের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হলে ঐ উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। কখনও কখনও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনটি বিষয়েরই (প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিবিশেষের সহায়তা এবং উপকরণ) প্রয়োজন হতে পারে।

বাস্তবায়ন স্তর সম্পন্ন হবার পর শিক্ষক তাঁর কর্মস্থলে তা প্রয়োগ করবেন। এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর নিজেকে যুগোপযোগী রাখার জন্য পুণরায় একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নিজেকে আরও দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন।

শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন বলতে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও কার্যাবলির উন্নয়নকে বুঝায়। এই উন্নয়ন ধারাবাহিক ও প্রবাহমান প্রক্রিয়া। পেশাগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হয়। এখানে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ

পেশাগত উন্নয়নের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পেশাগত প্রশিক্ষণ দুই ধরনের। যথা- দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে পরিচালিত বিএড ও এমএড হল দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ। বর্তমানে বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ এক বছর। শিক্ষকতা পেশার জন্য বিএড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, তারপর কেউ আগ্রহী হলে এমএড প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। বিএড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করা যায়।

স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পাঠদান কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, একীভূত শিক্ষাক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণের মধ্যে সময়োপযোগী দক্ষতার সন্নিবেশ ঘটে।

আত্মবিশ্লেষণমূলক অনুশীলন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণ করবেন এবং এর ফলে প্রাপ্ত ত্রুটিগুলো সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করবেন। শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণের জন্য নিজেকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন-

- আমি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করি?
- আমি কি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর চাহিদা, মেধা ও আগ্রহের প্রতি সচেতন থাকি?
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আচরণ কি সমান থাকে?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার মনোভাব কি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ?
- শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসার প্রতি আমি কি সচেতন থাকি ?
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য আমার প্রচেষ্টা রয়েছে কি?
- সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি কি সচেষ্ট?
- সহপাঠক্রমিক কাজ পরিচালনায় আমার কি কোন ভূমিকা আছে?
- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আমি কি সচেষ্ট?

কর্মসহায়ক গবেষণা

কর্মকে সহায়তা করার জন্য যে গবেষণা তাই কর্মসহায়ক গবেষণা। এটি শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি মাধ্যম হতে পারে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক কোন বহিরাগত পর্যবেক্ষক নন। বরং তিনি ঐ কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কর্ম পদ্ধতির উন্নতি করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই গবেষক। সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক বিদ্যালয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো সমাধানের জন্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুজে বের করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকারের পাশাপাশি শিক্ষকগণের বিশ্লেষণাত্মক আচরণের বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উপযোগী নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের অবতারণা করতে সমর্থ হন, তাঁর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থী কর্তৃক মূল্যায়ন

বর্তমান আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমান ধারায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক কীভাবে পড়াবেন তার পরিবর্তে শিক্ষার্থী কীভাবে শিখতে চায় সেটাই মূখ্য বিষয়। এজন্য শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের আরো উন্নতি করতে হবে, শিক্ষার্থীরা কী চাচ্ছে, কীভাবে চাচ্ছে, কতটুকু চাচ্ছে ইত্যাদি জানা শিক্ষকের জন্য জরুরি। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তিত, সংশোধিত ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

সহকর্মীদের দ্বারা মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক গ্রহণ

বিদ্যালয়ের সহকর্মীগণ শিক্ষকগণের পারস্পরিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। সহকর্মীদের দ্বারা ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন। আবার অন্যের ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেখান থেকে ভালো দিকগুলো শনাক্ত করে তা নিজের ক্লাসে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

আত্মমূল্যায়ন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর নিজের কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্ব-মূল্যায়ন করা দরকার। এই কাজের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত তাঁর নিজের কাজের ভালো ও মন্দ দিক বিশ্লেষণ করে ভালো কাজগুলোর অনুশীলন ও মন্দ কাজ পরিহারের অভ্যাস করবেন। এরফলে একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভালো শিক্ষকে পরিণত হবেন।

নিয়মিত অধ্যয়ন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রেণির পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি নানাধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সময় অধ্যয়নে ব্যয় করলে ক্লাসের প্রস্তুতি যেমন যথাযথ হবে তেমনি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপযোগী উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবেন। একজন শিক্ষক সারা জীবনের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য তাকে নানাধরনের বিষয় অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

নিয়মিত ইন্টারনেট ব্রাউজিং

কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এখন শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে রয়েছে বিশাল তথ্যভান্ডার। ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তরণ করার পাশাপাশি সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষক নিজেকে আপডেট রাখতে পারেন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Continuous Professional Development - CPD) যে কোন পেশার পূর্বশর্ত। বিরাজমান অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনই হলো উন্নয়ন। শিক্ষকতা পেশায় এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শিক্ষককে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। একে আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুব জরুরি। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো:

- বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধিত হয়;
- বিষয়ভিত্তিক সর্বশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সাথে পরিচিতি ঘটে;
- নবতর প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা যায়;
- শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে পরিচিত হওয়া যায়;
- শিক্ষক সমাজের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়;
- প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষকগণের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় ও সমাজে শিক্ষকের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়;
- অর্থ ও সময়ের বিবেচনায় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন শিক্ষকের জন্য সহায়ক।

৯.৩ পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার মত প্রশিক্ষণও জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে গঠিত একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষককে সব সময় আধুনিক ও পরিবর্তনশীল ধ্যান ধারণার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। যদিও বলা হয়ে থাকে Teachers, like poet are born not made। তবে কথাটি সব সময়ের জন্য পুরোপুরি সত্য নয়। একজন জন্মগত শিক্ষকের জন্যও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ একজন জন্মগত শিক্ষককে আরো যোগ্য, দক্ষ ও আধুনিক করে তোলে। পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ জন্যই বলা হয় জীবনের জন্য শিক্ষা এবং পেশার উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ। Training is short term, task oriented and targeted on achieving a change of attitude, skills and knowledge in a specific area. It is usually job related. তবে শুধু প্রশিক্ষণ কর্মী উন্নয়ন নিশ্চিত করে না। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ কর্মী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণতা দান করে। কর্মী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথার্থতা এবং সাফল্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের আচরণ এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন শিক্ষক প্রশিক্ষক। অর্থাৎ পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রশিক্ষণ হলো সুচারুভাবে কর্মী উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণের শুধুমাত্র কর্মসম্পাদনের দক্ষতা এবং যোগ্যতা অর্জনই হয় না, একই সাথে ভবিষ্যতের কঠিনতর এবং ব্যাপকতর কর্মসম্পাদনের এবং দায়িত্বভার গ্রহণের সক্ষমতা অর্জিত হয়। One great characteristic of effective teachers is that they create a positive atmosphere in their classrooms and schools.(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf)। প্রশিক্ষণ সাধারণত কর্মীর বর্তমান দায়িত্ব সুচারুভাবে এবং কর্মসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদনের পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষা দেয়, আর কর্মীকে ভবিষ্যত দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা যোগায়। যিনি শিক্ষক হবেন তিনি শিক্ষকতা পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। তাহলে বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত পেশাজীবীগণ তাদের পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিনিয়ত নানামুখী কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে যে কার্যক্রম অনুশীলন করে থাকেন তাকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Contnuous Professional Development) বা সংক্ষেপে CPD বলা হয়। নিম্নোক্ত কারণে পেশাগত উন্নয়ন দরকার-

- পেশাগত মনোভাব ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়;
- আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক মনোভাব গঠিত হয়;
- শিক্ষা ও শিক্ষকতার গুণগত উন্নয়ন সাধিত হয়;
- বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন হয়;
- পেশাগত সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়;
- দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব তৈরি হয়;
- দেশপ্রেম জাগ্রত হয়;
- ঝুঁকি কমিয়ে আনা যায়;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়;
- কর্মীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়;
- কর্মীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
- দক্ষ শ্রম শক্তি তৈরি হয়;
- বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হয়;
- অন্তঃকর্মী সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে;
- যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন সহজতর হয়;
- দলীয় কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়;
- সময় সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;
- কর্মীরা সংগঠনের প্রতি দায়িত্বশীল ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করতে পারেন ;
- শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের আধুনিক কলাকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারেন ;
- সতীর্থ শিক্ষকগণের পাঠদান কলাকৌশলগুলো দেখে, শুনে, আয়ত্ত করে নিজেকে উন্নত করতে পারেন ;
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহযোগী শিক্ষকের পাঠদান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে ;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনের অভ্যাস গড়ে উঠে ;
- মুদ্রাদোষগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা পরিহারের সুযোগ ঘটে ;
- ক্রমাগত আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় ;
- সর্বোপরি নিজেকে একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত করার সুযোগ লাভ হয়।

পেশাগত উন্নয়ন বৃদ্ধির কৌশল

- ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ ;
- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ ও অনুশীলন ;
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া ;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা পঠন ;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম বিতর্ক ও প্রদশর্নী আয়োজন এবং অংশগ্রহণ ;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি নিয়মিত করা ;
- বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষকের ভূমিকা

প্রশিক্ষক হবেন সহায়ক। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শিখতে বা কোন দক্ষতা আয়ত্ত করতে সহায়তা করবেন। একজন আদর্শ শিক্ষক প্রশিক্ষক কখনও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি শিখনের গুরুত্ব উপলব্ধি করান এবং শিখনের উপায় ব্যাখ্যা করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণও শিক্ষক প্রশিক্ষকদের নিকট থেকে এসব গুণ অর্জন করে তাদের শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করেন।

একজন শিক্ষক প্রশিক্ষক হবেন শিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য আদর্শ। শিক্ষক প্রশিক্ষকের বিভিন্ন গুনাবলির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্নভাবে নিজেকে আলোকিত করতে পারেন। নিজেকে আলোকিত করার কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হলোঃ

- প্রশিক্ষণার্থীর শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় আত্নবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়;
- নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়;
- পেশাগত যোগাযোগ দক্ষতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা উন্নয়নে সচেষ্ট হন;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্নবিশ্বাসী হন;
- নেতৃত্বের গুনাবলি অর্জন করতে পারেন;
- সময়ানুবর্তী, নিয়মানুবর্তী ও অধ্যাবসায়ী হন;
- মুদ্রাদোষ দূরীকরণে সচেতন হন;
- উত্তম চারিত্রিক গুনাবলি অর্জনে আহগ্রী হন।

৯.৪ পেশাগত শিখন সমাজ (পিএলসি) এবং এর গুরুত্ব

পেশাগত শিখন সমাজ ধারণাটি ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান গবেষকগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। ১৯৮০-৯০ সালে শিক্ষক সমাজে বিস্তার লাভ করে। ১৯৮৯ সালে Susan Rosenholtz ৭৮টি বিদ্যালয়ের ওপর গবেষণা করেন এবং দেখেন যে, শিক্ষক সমাজের সামষ্টিক ও সহযোগিতামূলক প্রতিশ্রুতির কারণে বিদ্যালয়গুলো ælearning-enriched schools” হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ‘শিখনসমৃদ্ধ বিদ্যালয়’ হিসেবে প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

পেশাগত শিখন সমাজ এর ধারণা

পেশাগত শিখন সমাজ-এর ধারণা শিক্ষক শিক্ষার ইতিহাসে সাম্প্রতিক ধারণা। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের স্বার্থে এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, আবেগিক ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নকে টেকসই ও যুগোপযোগী করা এবং নিজেদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য কর্মরত শিক্ষকগণের একটি সংগঠন হচ্ছে পেশাগত শিখন সমাজ বা Professional Learning Community (PLC)। মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও মত বিনিময় করে অনেক কিছু শেখে। প্রশিক্ষণ গ্রহণে এবং প্রশিক্ষণদানে নিয়োজিত একদল মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থী-প্রশিক্ষণার্থীর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উভয় দলেরই শিক্ষা ও কার্যকর উন্নয়ন যুগপৎভাবে ঘটে। একদল মানুষ যখন সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত থেকে কোন সাধারণ মূল্যবোধ ও বিশ্বাস বিনিময়ের মাধ্যমে একে অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বা শিক্ষাদান করে তখন একটি শিখন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিখনসমাজ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণবিজ্ঞান বা শিখন-শেখানোর কৌশলগত ধারণার এক প্রকার উন্নত নকশা।

১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান গবেষকগণ তাদের কর্মক্ষেত্রে পিএলসি ব্যবহার করেন। ১৯৮০-৯০ সালে শিক্ষকগণের মধ্যে এর বিস্তার লাভ করে। পেশাগত শিখন সমাজ ধারণাটি আমাদের দেশে এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রচলন শুরু হয়নি। তবে ধীরে ধীরে এর অনুশীলন শুরু হচ্ছে। A professional learning community, or PLC, is a group of educators that meets regularly, shares expertise, and works collaboratively to improve teaching skills and the academic performance of students. (https://www.edglossary.org/professional-learning-community/)। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকমিলান ও সেভিচ (১৯৮৬) এর মতে, সদস্যপদ; প্রভাব, ব্যক্তির চাহিদা পূরণ এবং যৌথ ঘটনা ও আবেগিক সংযুক্তি এই ৪টি মূখ্য উপাদান নিয়ে শিখন সমাজের ধারণা গড়ে ওঠে। সুতরাং শিখন সমাজের সদস্যদের সমাজ বা দলের প্রতি আনুগত্য থাকবে যা কাজের ও পরস্পরকে সাহায্যের তাড়না যোগাবে, সদস্যগণ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া করবে, প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ পরিহার ও শিখন সমাজে নিজস্ব মত প্রকাশ, জিজ্ঞাসা ও তথ্যের চাহিদার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য সুনির্দিষ্ট ঘাটতি মিটাতে সচেষ্ট থাকবে এবং নির্দিষ্ট ইস্যুতে সংঘটিত বিষয়ে আবেগিক অভিজ্ঞতাগুলো বিনিময় করবে। Educators who are building a professional learning community recognize that they must work together to achieve their collective purpose of learning for all. Therefore, they create structures to promote a collaborative culture. (http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/ may04/ vol61/num08/What-Is-a-Professional-Learning-Community%C2%A2.aspx)। কতকগুলো ভিত্তির ওপর পেশাগত শিখন সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেগুলো হলো-

- সম্মিলিত আদর্শ ও বিশ্বাস (Shared norms and beliefs)
- আন্তরিক ও সোহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক (Collegial relations)
- সহযোগিতামূলক মনোভাবের সংস্কৃতি চর্চা (Collaborative cultures)
- প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (Reflective practice)
- পারস্পরিক সমর্থন ও সম্মিলিত দায়বদ্ধতা (Mutual support and mutual obligation)
- পেশাগত উন্নয়ন (Professional growth)

পেশাগত শিখন সমাজ-এর গুরুত্ব (Importance of Professional learning Community)

শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। পেশাজীবী হিসেবে সকল শিক্ষককেই এই পেশার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হতে হয়। যিনি শিক্ষক হবেন তাকে নিয়মিত শিখন-শেখানোর ইচ্ছা দুটোই থাকতে হয়। শিখন আগ্রহ তার জ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে আর শেখানোর ইচ্ছা তাকে একজন যোগ্য শিক্ষক হিসেবে তৈরি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের প্রচার, প্রসার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। শিক্ষককেও নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে মনোযোগী হতে হয়। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাকে জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়। শিখন সমাজ শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের সেই চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক নিজে যা শিখবেন কাল তা শিক্ষার্থীকে শেখাবেন। এভাবে শিখন সমাজ শিক্ষার গুণগত উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ জন্য বলা হয় It is important that professional learning provides rich opportunities for teachers to develop and enhance their professional knowledge and practice, in order to progress the quality of learning and teaching and school improvement.(http://www.gtcs.org.uk/professional-update/ professional-learning/professional-learning.aspx) ধীরে ধীরে শিখন সমাজ শব্দটি আমাদের দেশসহ বিশ্বে এখন বেশ পরিচিত হয়ে উঠছে। শিখন সমাজ অনেকগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত থাকে। শ্রেণিকক্ষ অনুশীলন, শিক্ষাক্রম ও শিখন সমস্যার সমাধানের জন্য সামাজিক বিভিন্ন অংশীজনকে বিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা, সর্বোপরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকসহ সকলকে যুগপৎভাবে শিখনের সাথে সম্পৃক্ত করা পেশাগত শিখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষার্থীদের শিখনকে গুণগতমানে উন্নীত করার প্রয়াসে পেশাগত দক্ষতার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিখন সমাজের সদস্যদের কাজ করতে হয়। এ জন্য এ শিখন সমাজকে "নিরবচ্ছিন্ন অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য সংগঠিত সমাজ" নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পেশাগত শিখন সমাজের গুরুত্ব চিহ্নিত করা হলো-

ক. **সহকর্মীদের জন্য শিখন সমাজের গুরুত্ব**

- সহকর্মী শিক্ষকগণের বিশেষ করে নবীন শিক্ষকগণের নিসঙ্গতা দূর করে;
- বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি শিক্ষকণের প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পায় এবং সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেশি কাজ করতে পারেন;
- শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পারেন;
- সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ফলে শিখন-শেখানোর জন্য উন্নত ও কার্যকর উপায় আবিষ্কার হয়;
- বিষয়বস্তু ও শিখন- শেখানো কার্যাবলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় করা সম্ভব হয় এবং শিক্ষার্থীর অর্জন নিশ্চিত করতে পারেন;

- শিক্ষকগণ নিজেরা বিভিন্ন বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন;
- শিক্ষকগণের কর্মে সন্তুষ্টি থাকে, নৈতিকভাবে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হন এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের অনুপস্থিতি কমে যায়;
- সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি টেকসই উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়।

খ. **শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন সমাজের গুরুত্ব**

- পেশাগত শিখন সমাজ কার্যকর থাকলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে যায় এবং ক্লাস না হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়;
- আনন্দময় বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক ইতিবাচক থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি কমে যায়;
- যেসকল বিদ্যালয়ে শিখন সমাজ নেই তাদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর পাঠদান ও অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে যে সকল বিদ্যালয়ে সংগঠিত শিখন সমাজ থাকে;
- পেশাগত শিখন সমাজ থাকলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের সাধারণ দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

শিক্ষকতার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে তার নিজের প্রচেষ্টার ওপর। নিয়মিত অধ্যয়ন, শিক্ষণে একাগ্রতা ও অভ্যাস গঠন, সহকর্মীদের সাথে ক্রমাগতভাবে অভিজ্ঞতা বিনিময়,পরামর্শ গ্রহণ একে অপরকে সহযোগিতা প্রদান এবং সতীর্থ শিক্ষণ অনুশীলন পেশাগত উন্নয়নের অংশ যা শিখন সমাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ পদ্ধতিতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক একযোগে কাজ করবেন, পাঠদানের পরিকল্পনা তৈরি থেকে শুরু করে প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাঠ উপস্থাপনে একে অপরকে সহযোগিতা করবেন, একজনের ভুল অন্যজন ধরিয়ে দেবেন। এভাবে অনুশীলন চালিয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকই এক সময় দক্ষ হয়ে উঠবেন। সর্বোপরি পেশাগত শিখন সমাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে নতুন যুগের সূচনা হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ বিষয়ে কথা না বলে শিখন নিয়ে আলোচনা করে, সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন প্রত্যাশা নিয়ে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠে।

৯.৫ ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনলিপির প্রয়োজনীয়তা ও উন্নয়ন কৌশল

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার অন্যতম মাধ্যম হল ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনিলিপি রক্ষণাবেক্ষণ। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটে এই প্রতিফলন দিনলিপিতে। বর্ণিত অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষক শ্রেণিশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যাবলির সার্থকতা যাচাই করবেন, বাস্তব অবস্থার বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, ব্যক্তিগত অভাব, দোষ-ত্রুটি ইত্যাদি চিহ্নিত করবেন, শিক্ষণ যোগ্যতার কোন বিশেষ দিকটির উন্নয়ন করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন, সহকর্মীদের সাথে মতবিনিময়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। ব্যক্তিগত প্রতিফলন দিনলিপি শিক্ষকের ব্যক্তিগত উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

প্রতিফলন দিনলিপি (Reflective Diary)

শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যক্রমের ওপর শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক যে দিনলিপি তৈরি করেন তাই প্রতিফলন দিনলিপি। প্রতিফলন দিনলিপি শিক্ষকের কর্মক্ষমতার প্রকাশক যা শিক্ষকের ক্রমোন্নতির দিক নির্দেশক। এই দিনলিপি অনুসরণ করে শিক্ষক নিজেই তাঁর শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ক্রমোন্নতি বুঝতে পারেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত সকল শিক্ষককে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মধ্যে থাকতে হয়। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে শিক্ষক প্রতিদিন কোন একটি ভালো পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে পাশাপাশি নিজের পাঠের ভালো-মন্দ দিকগুলো দিনলিপিতে তালিকাভুক্ত করতে পারেন। প্রতিফলন দিনলিপিতে নিজের পাঠ ও সহকর্মীদের পাঠের আলোকে নিজের উন্নয়নের জন্য মন্তব্য উল্লেখ করা হয়। এটা শিক্ষক ক্লাস শেষে করতে পারেন আবার সারাদিন কাজের শেষে রাতেও সম্পন্ন করতে পারেন। প্রতিফলন দিনলিপির বর্ণনাতে পাঠ শিরোনাম, দিন, তারিখসহ পাঠদানের বিভিন্ন উপাদান যেমন- উপকরণ, পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। সেই সাথে ক্লাসের প্রয়োজনীয় মন্তব্য-ভাল দিক ও মন্দ দিক উল্লেখসহ কীভাবে আরো ভালো করা যেত সেই সম্পর্কে নির্দেশনা লিখে রাখতে হবে। শিক্ষক যদি পরবর্তী ক্লাসে আসার আগে দিনলিপি দেখে পাঠদানের ভালো দিক, মন্দ দিক, নিজের সবলতা ও দুর্বলতা ও ভালো পাঠদানের পরামর্শগুলো দেখে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং সেই অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনা তৈরি করেন তাহলে ক্রমান্বয়ে অবশ্যই শিক্ষকের পাঠদানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

প্রতিফলন দিনলিপি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রতি পেশারই কিছু নীতিমালা বা দায়বদ্ধতা থাকে, শিক্ষকগণেরও তেমনি কিছু দায়বদ্ধতা আছে যা পালন করা শিক্ষকের জন্য আবশ্যিক। শিক্ষকের প্রধান দায়বদ্ধতা হলো সুন্দর ও কার্যকরভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা। এর জন্য শিক্ষককে প্রতিনিয়ত পেশার উন্নয়ন সাধন করতে হয়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধনের অন্যতম উপায় হল প্রতিফলন দিনলিপির মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করা। এখানে প্রতিফলন দিনলিপি রক্ষাণাবেক্ষণের কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল-

- পেশাগত উন্নয়ন সাধন করা ;
- আত্মমূল্যায়ন করা ;
- সমস্যা সম্বলিত অধিবেশন শনাক্তকরণ ;
- সহকর্মীর পাঠ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

প্রতিফলন দিনলিপির প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষকের পেশাগত মানোন্নয়নে প্রতিফলন দিনলিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক প্রতিদিনের কার্যক্রম এই দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যেমন- কোন বিষয়ে পাঠদান করা হয়েছে, কী কী দুর্বল দিক পরিলক্ষিত হয়েছে, কীভাবে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে কার্যকর ও সাবলীল পাঠ উপস্থাপন করা যায় ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলন দিনলিপিতে তালিকাভুক্ত থাকে। এই দিনলিপি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থী সহায়ক বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবিহিত হয়, ভালো কৌশলগুলো ব্যবহারে ও শিক্ষকের দুর্বলদিকগুলো সংশোধনে উদ্বুদ্ধ হয়। এখানে প্রতিফলন দিনলিপি সংরক্ষণের কিছু প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো :

- প্রতিফলন দিনলিপির মাধ্যমে শিক্ষক নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো শনাক্ত করতে পারেন ;
- শিক্ষকগণের নিজেদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও সুসম্পর্ক তৈরি হয় ;
- প্রতিফলন দিনলিপির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও সামর্থ্য উপযোগী পদ্ধতি ও উপকরণের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হয় ;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি হয় ;
- প্রতিফলন দিনলিপি শিক্ষককে পাঠপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে ;
- পূর্ব প্রস্তুতির জন্য প্রতিফলন দিনলিপি সহায়ক ;
- প্রতিফলন দিনলিপির মাধ্যমে শিক্ষক স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের (Low cost / No cost) উপকরণ তৈরির ধারণা লাভ করতে পারেন।

প্রতিফলন দিনলিপির ব্যবহার

প্রতিফলন দিনলিপিলব্ধ অভিজ্ঞতা শ্রেণি কার্যক্রমে প্রয়োগ করতে হবে। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিখনফল তৈরি, উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার, পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিফলন দিনলিপির জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। আরো কিছু দিক হল-

- প্রতিফলন দিনলিপি শ্রেণিকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হতে পারে ;
- এটি শ্রেণিকক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হতে পারে ;
- প্রতিফলন দিনলিপি হবে আবর্তনশীল ঘটনার মূল্যায়ন ;
- প্রতিফলন দিনলিপি হবে স্বভাবগত আচরণের ওপর একটি প্রতিক্রিয়া ;
- প্রতিফলন দিনলিপি উন্নত ও নির্ধারিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচেষ্টা।

প্রতিফলন দিনলিপি লেখার পদ্ধতি

প্রতিফলন দিনলিপি লেখার সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এই দিনলিপি লেখার কাজ সম্পন্ন করেন। প্রতিফলন দিনলিপি লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবহার উপযোগী রেকর্ড, আন্তরিকতাপূর্ণ লেখনি, সহজভাষা, আনন্দধর্মী উপস্থাপনা ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে।

- নিজের পাঠদানের যে বিষয় সম্পর্কে দিনলিপি লিখতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে ;
- পর্যবেক্ষণাধীন সতীর্থ ও সহকর্মীর পাঠের যেসব দিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে ;
- ক্লাসে উদ্ভুত সমস্যাবলি চিহ্নিত করতে হবে ;
- অন্য শ্রেণিতে বিদ্যালয়ের কোন ঘটনা যা আমার ভালো লেগেছে ;
- অন্য শ্রেণিতে বিদ্যালয়ের কোন ঘটনা যা আমার ভালো লাগেনি ;
- আজ বিদ্যালয় থেকে আমি যা শিখেছি ;
- আজ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাদান বিষয়ক আমি যা শিখেছি ;
- আজ বিদ্যালয় থেকে শিখন বিষয়ক আমি যা শিখেছি ;

- আজকের পাঠদানের পর আমার ভিতর যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে ;
- দিনলিপি লেখার জন্য সময় নির্ধারণ করে রাখতে হবে ;
- উপস্থাপনায় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সময় ব্যয় করা যাবে না ;
- যা লেখা হয়েছে তার সত্যতা থাকতে হবে ;
- মনে রাখতে হবে পাঠদানের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রাপ্তিই এই দিনলিপি সংরক্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রতিফলন দিনলিপি লেখার মডেল

প্রতিফলন দিনলিপি ব্যবহারের জন্য এমন মডেল ব্যবহার করা উচিত যা আমাদের দৈনন্দিন ঘটনা চিন্তা করতে এবং প্রতিফলন দিনলিপি লিখতে সহায়ক হবে। পাঠদান একটি সৃষ্টিশীল কাজ। সারাদিনের পাঠদান কার্যক্রম চিত্রায়নের মাধ্যমে পাঠদান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, ধারণা, পাঠদানে সমস্যা ইত্যাদি যে দিনলিপিতে লেখা হয় তাই প্রতিফলন দিনলিপি। প্রতিফলন দিনলিপি লেখার মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর পেশাগত কাজের সূক্ষ্ম দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। অনেক সময় নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো ধরার জন্য শিক্ষক পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আত্মকর্ম অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেন।

শিক্ষক তাঁর প্রতিফলন দিনলিপিতে কাজের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, সেগুলো বিশ্লেষণ করেন এবং নতুন কৌশল উদ্ভাবনের সুযোগ লাভ করেন। প্রতিফলন দিনলিপি লেখার ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে।

- ঘটনা শনাক্তকরণ ;
- ঘটনা বর্ণনা ;
- ঘটনা বিশ্লেষণ ;
- ঘটনা থেকে অর্জন ;

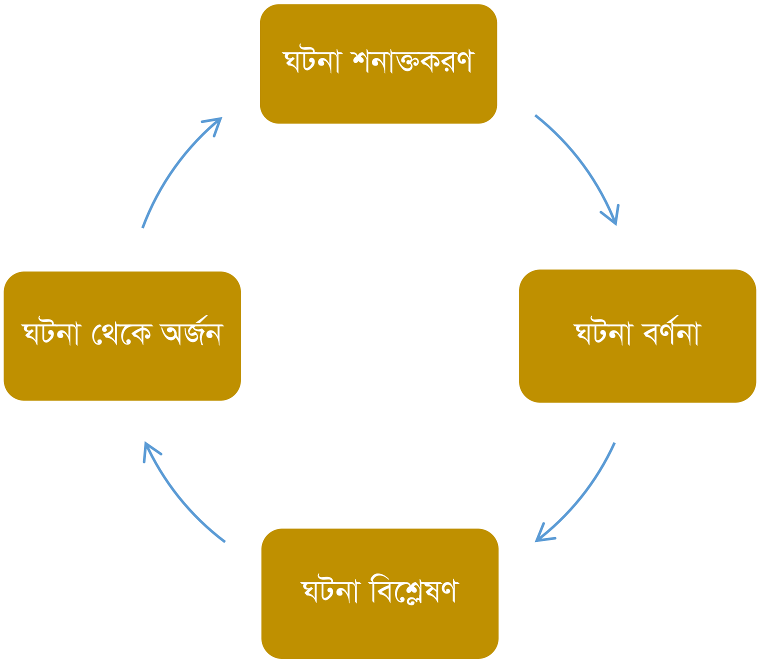

চিত্র ১৫ : প্রতিফলন দিনলিপি লিখন মডেল

১) ঘটনা শনাক্তকরণ

প্রতিফলন দিনলিপিতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকার্যক্রমের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি ঘটনা যে প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল সেই অনুযায়ী লিখতে হবে।

২) ঘটনা বর্ণনা

প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা বা খুঁটিনাটি উল্লেখ করতে হবে, যেমন- কী ঘটেছিল? কে কে জড়িত ছিল? শিক্ষক কী করেছিলেন? শিক্ষক যা করেছিলেন তা কেন করেছিলেন?

৩) ঘটনা বিশ্লেষণ

ঘটনার বিশ্লেষণ দিনলিপিতে উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। ঘটনার বিশ্লেষণে শিক্ষককে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হল-

শিক্ষক কী চিন্তা বা অনুভব করেছিলেন?
এই অভিজ্ঞতার ভালো বা খারাপ দিক কী ছিল?
শিক্ষকের কোন দক্ষতা ব্যবহার করা হয়েছিল?
সহকর্মীদের জন্য এবং শিক্ষকের নিজের জন্য শিক্ষকের কাজের ধারাবাহিকতা কেমন ছিল?

৪) ঘটনা থেকে অর্জন

শনাক্তকৃত ঘটনা থেকে শিক্ষকের শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাকে ভবিষ্যতে শিক্ষককে ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি নিজেকে আরো কিছু বিষয়ে প্রস্তুত করতে হবে, যেমন-
শিক্ষক আর কী করতে পারতেন তা শনাক্ত করতে হবে?
একই ঘটনা পুনরায় ঘটলে শিক্ষক কী করবেন?
কীভাবে শিক্ষক নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারেন?
শিক্ষক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবহার করবেন?

প্রতিফলন প্রশ্নমালা

সুষ্ঠু, সাবলীল এবং কার্যকর পাঠদানের জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা, পেশাদারী মনোভাব ও পুনঃ পুনঃ আত্মমূল্যায়ন। শিক্ষক যদি তাঁর নিজের পেশার প্রতি আন্তরিক থেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠ পরিচালনা করেন তবে তা কার্যকর হতে বাধ্য। তবে এর জন্য শিক্ষককে আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের পাঠের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। নিচের প্রতিফলন প্রশ্নমালাটি শিক্ষকগণের আত্মমূল্যায়নে সহায়তা করবে:

- শ্রেণিকক্ষে আমি যা করেছি তা কোন উদ্দেশ্যে করেছিলাম?
- কেন আমি ঐ বিশেষ কাজটি করেছিলাম?
- আমি যা করেছি তার মাধ্যমে আমি কী অর্জনের চেষ্টা করেছি?
- ঐ পরিস্থিতিতে আমি এর চেয়ে ভালো আর কী করতে পারতাম?
- আমি যা করেছি তা কতটুকু সফল হয়েছে?
- সফলতা যাচাইয়ের জন্য আমি কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি? বিকল্প পদ্ধতি কী ছিল ?
- আমি যে কাজ করেছি ভবিষ্যতে তা আমাকে কীভাবে সাহায্য করবে?
- আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সে বিষয়ে আমার সহকর্মীদের মতামত কী?

৯.৬ প্রশিক্ষণার্থীর প্রতিফলন দিনলিপি, পাঠদান অনুশীলন জার্নাল,শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

সাধারণভাবে দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়মিতভাবে যেখানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে দিনলিপি বা Diary বলে। শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীর পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে দৈনন্দিন বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, ধারণা, পাঠদানে সমস্যা ইত্যাদি যে দিনলিপিতে লিখে রাখা হয় তাকে প্রতিফলন দিনলিপি বলে। একজন প্রশিক্ষণার্থী যখন পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির একটি ধারাবাহিক বিবরণ একটি নির্দিষ্ট দিনলিপিতে তৈরি করেন তখন তাকে প্রতিফলন দিনলিপি বলা যেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিফলন দিনলিপির ধারণা নতুন নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বহুকাল আগে থেকেই আত্মপ্রতিফলনের কাজটি চলে আসছে। প্রতিফলন দিনলিপি ব্যবহারের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে পেশাগত অভিজ্ঞতা ও সমস্যার বিবরণ লিখে রাখেন এবং পরবর্তীতে এটি পর্যালোচনার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে নিজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রশিক্ষকের সহায়তায় বার বার প্রতিফলন ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী তার নিজের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও গুণাবলি অর্জন করে থাকেন। প্রতিফলন যত বেশি বাস্তবসম্মত হবে পেশাগত দক্ষতা ও গুণাবলির উন্নয়ন তত বেশি সহজ ও ইতিবাচক হবে। প্রতিফলন দিনলিপি লেখার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী তার পেশাগত কাজের সূক্ষ্ম দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। অনেক সময় নিজের ভুলত্রুটিগুলো ধরা পড়ার জন্য প্রশিক্ষণার্থী পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আত্মকর্ম অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেন। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষণ দিনলিপিতে তার কাজের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, সেগুলো বিশ্লেষণ করেন এবং নতুন কৌশল উদ্ভাবনের সুযোগ লাভ করেন। প্রতিফলন পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থী নিম্নবর্ণিত কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারেন:

- আত্মমূল্যায়ন, সতীর্থ ও সহকর্মী পর্যবেক্ষণ;
- সমস্যাসম্বলিত শিক্ষণ অধিবেশন;
- পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

প্রশিক্ষণার্থীর আত্মমূল্যায়ন

প্রশিক্ষণার্থীর পেশাগত মনোভাব উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আত্মপ্রতিফলন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। আত্মপ্রতিফলনে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। মূলত সমস্যাগুলো কখনও সুনির্দিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণার্থীর আত্মপ্রতিফলনে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। প্রশিক্ষণার্থীগণকে সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে আত্মমূল্যায়ন করতে হয়। এই আত্মমূল্যায়নে সতীর্থ ও সহকর্মী পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পর্যালোচনা, প্রতিফলন ডায়েরি পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতে হয়। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর নিকট থেকেও পাঠদান সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মমূল্যায়ন করা যায়। পাঠদান কার্যক্রমের কোন ভিডিও চিত্র ধারণ করে থাকলে সেটিও বিশ্লেষণ করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীগণ আত্মমূল্যায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন:

- শিখন-শেখানো পরিবেশ;
- ভৌত পরিবেশ;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক;
- শিক্ষার্থীর প্রেষণা;
- একীভূত শিক্ষার চর্চা ও ধারণার প্রয়োগ;
- বড় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা কৌশল;
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল;
- শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার;
- মূল্যযাচাই ইত্যাদি।

পাঠদান অনুশীলন জার্নাল

পাঠদান অনুশীলন জার্নাল হল শিক্ষকগণের জন্য সহায়ক সামগ্রী। সমগ্র বিশ্বেই শিক্ষকগণের জন্য এই ধরনের সহায়ক সামগ্রীর প্রচলন রয়েছে। শিক্ষকগণ এর সহায়তায় পাঠদান চর্চা করতে পারেন, পাঠদানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন এবং নতুন উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহারের কৌশল রপ্ত করতে পারেন। পাঠদান অনুশীলন জার্নালের ব্যবহার শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের সাথে জড়িত। শিক্ষকগণের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য পাঠদান অনুশীলন জার্নালে বিভিন্ন বিষয়ের করা হয়। যার সহায়তায় শিক্ষকগণ তাদের পাঠদান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি সাধন করতে পারেন। পাঠদান অনুশীলন জার্নালে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হল-

- পাঠ পরিকল্পনার সংখ্যা;
- পাঠ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য;
- পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ;
- পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার;
- পাঠ পরিকল্পনার মডেল;
- শিক্ষা উপকরণ ;
- বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার;
- বিভিন্ন বিষয়সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশলের বর্ণনা ।

পাঠদান অনুশীলন জার্নালের সুবিধা

- পাঠদান কৌশল উদ্ভাবনে সহায়তা করে;
- পাঠদান কৌশল প্রয়োগের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ

শিক্ষকতা পেশায় সফলতা লাভের জন্য বিষয়বস্তু শ্রেণিকক্ষে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কাজটি শিক্ষককে নানাভাবে পূর্ব পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে করতে হয়। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক বিভিন্ন করণীয় নির্ধারণ করেন। এ করণীয়গুলো শিক্ষকের প্রধান কাজ,যেমন- পাঠগ্রহণে তিনি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পেরেছেন কিনা, শিক্ষার্থীর সাড়া যথেষ্ট ছিল কিনা, পাঠদানে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলগুলো যথাযথ ছিল কিনা ইত্যাদি। এই কাজগুলো সম্পর্কে শিক্ষক নিজেকে যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণের আশ্রয় নিতে পারেন। পর্যবেক্ষণ শব্দের অর্থ পরিদর্শন,

নিরীক্ষণ, মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা। শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম উপায় হল পাঠদানের মাধ্যমে নিজের পাঠদানের ভুলত্রুটি শনাক্ত করে পর্যবেক্ষকের নিকট থেকে ফিডব্যাক সংগ্রহ করে তা সংশোধন করতে পারা। এখানে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের একটি মনচিত্র তুলে ধরা হল:

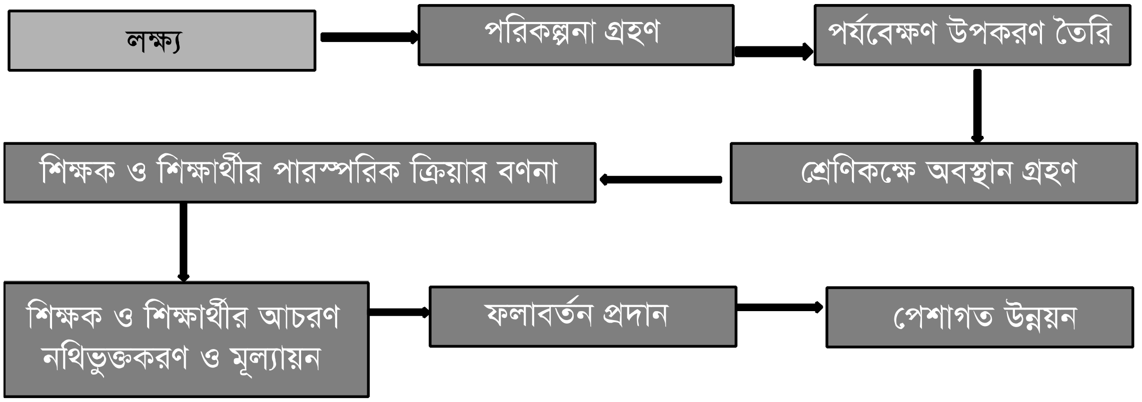

চিত্র ১৬: শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের একটি মনচিত্র

ক্লাসরুম পর্যবেক্ষণ মূলত বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ। ক্লাসরুম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ যেন অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয় সেজন্য পর্যবেক্ষককে খুবই সচেতন থাকতে হয়। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষককে শ্রেণিকক্ষের যেসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হয় সেগুলো হল:

- বিষয়জ্ঞান;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক;
- উপস্থাপনা ও উদ্দীপনা;
- মূল্যায়ন;
- শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ;
- শিখনফলের আলোকে পাঠ উপস্থাপন;
- শিক্ষকের সময় ব্যবস্থাপনা।

পর্যবেক্ষণের সাধারণ নীতিমালা

- শ্রেণিশিক্ষকের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে;
- পর্যবেক্ষণের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে;
- শ্রেণিকক্ষে মনোযোগী হতে হবে;
- শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাতে হবে;
- দ্রুত এবং বিনীতভাবে শিক্ষককে পর্যবেক্ষণের ফিডব্যাক জানাতে হবে;
- পর্যবেক্ষকের নিকট শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ এটা বুঝাতে হবে।

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের প্রকারভেদ

সমগ্র ক্লাস পর্যবেক্ষণ

- নতুন শিক্ষকগণের জন্য;
- শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ করার কারণে;
- শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে;
- শিক্ষকগণের দক্ষতা যাচাই করার ক্ষেত্রে;
- শিক্ষকগণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য।

একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার পর্যবেক্ষণ

- শিক্ষকের কোন সুনির্দিষ্ট আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য
- কোন নির্দিষ্ট পদক্ষেপের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্য

শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের সুবিধা

- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়;
- পর্যবেক্ষকের ফিডব্যাকের আলোকে দুর্বলতা সংশোধন করা যায়;
- পর্যবেক্ষণ বাস্তব অবস্থায় সংঘটিত হয় বলে প্রকৃত অবস্থা জানা যায়;
- পর্যবেক্ষণের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকে। তাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়
- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষকের উন্নতির সুযোগ থাকে।

পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা

- পর্যবেক্ষকের দক্ষতার অভাবের কারণে যথাযথ ফিডব্যাক পাওয়া যায় না;
- পর্যবেক্ষকের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের কারণে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ নষ্ট হয়;
- পর্যবেক্ষক নিজের জ্ঞাত পদ্ধতির বাহিরে মতামত প্রদান করতে ব্যর্থ হন;
- পর্যবক্ষক নিজের মতামত চাপিয়ে দিতে চান;
- পূর্ব হতে অবহিত থাকার কারণে শিক্ষক বাড়তি প্রস্তুতি নিয়ে আসেন।

পর্যবেক্ষণ পরবর্তী মতামত প্রদান

পর্যবেক্ষণ পরবর্তী মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নে আলোচিত নীতিমালা মেনে চলা উচিত।

১. ব্যক্তিকে নয়, সমস্যাটিকে সামনে তুলে ধরুন
কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকের উপস্থাপনা খারাপ হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কোন আচরণের সরাসরি নিন্দা প্রকাশ করলে বা তার সমালোচনা করলে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তাই এক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর দোষ না চাপিয়ে সমস্যাটির গভীরতা তাকে অনুভব করতে সহায়তা করতে হবে এবং কীভাবে তা দ্রুত দূর করা যায় তা বলতে হবে। এতে করে যার ভেতরে সেই সমস্যাটি রয়েছে তিনি নিজ থেকে পর্যবেক্ষকের মূল্যায়নকে গুরুত্ব সহকারে নিবেন এবং তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২. সমালোচনাটির ফলাফলকে ভাবুন
পর্যবেক্ষক কেন শিক্ষকের পাঠের কোন বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট নন বা ভাবছেন যে তা কার্যকর শিখনের অন্তরায় তা শিক্ষককে বুঝাতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তা বলতে হবে। সমস্যাটির সমাধান কীভাবে করা যায় ,সেই দক্ষতাগুলো কীভাবে আয়ত্ত করতে হবে , কীভাবে শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগ করবেন এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে লাভবান হবে তা বলতে হবে।

৩. ফিডব্যাক স্যান্ডউইচ
ফিডব্যাক স্যান্ডউইচ হচ্ছে তিনটি স্তরে কাউকে সমালোচনার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথমে শিক্ষককে তার ভালো ও খারাপ দিকগুলো বলতে হবে। এরপর তার ভালো দিকগুলো আবার বলুন এবং শেষটায় গিয়ে কোন কোন দিকে লক্ষ্য রাখলে ব্যাপারটা আরো ভালো হতে পারে সেটা বলুন। অর্থাৎ, শিক্ষকের ইতিবাচক দিকগুলোকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে যেন শিক্ষক মনে করেন যে তার ভালোর জন্যেই এমনটা বলছেন।

পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট	
শ্রেণি পরিচিতি	
বিদ্যালয়ের নাম:	
শ্রেণি:	
বিষয়:	সময়:
মোট শিক্ষার্থী:	উপস্থিত শিক্ষার্থী:
শিক্ষকের নাম:	

ক্রমিক নং	মন্তব্য উপাদান (শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক)	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
১	পূর্ব পাঠের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে				
২	পাঠের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বলা হয়েছে				
৩	পাঠের সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে				
৪	পাঠ শেষে পাঠের সংক্ষিপ্তসার পুনরায় বলা হয়েছে				
৫	পরবর্তী ক্লাসের নির্দেশনা দিয়ে পাঠের সমাপ্তি টানা হয়েছে				
মন্তব্য:					
ক্রমিক নং	মন্তব্য উপাদান (পদ্ধতি, কৌশল ও উপকরণ বিষয়ক)	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
	পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে				
	পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে				
	শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সক্রিয় রাখা হয়েছে				
	পাঠ উপস্থাপনে আইসিটি ব্যবহার করা হয়েছে				
	পাঠের কঠিন বিষয়গুলো সহজ ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে				
	পাঠ উপস্থাপনকালীন মূল্যায়ন করা হয়েছে				
	সঠিকভাবে সময় ব্যবহার করা হয়েছে				
	পাঠ সমাপ্তির পর শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে				
	সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য সঠিকভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে				

	মূল্যায়নের প্রশ্ন বোধগম্য ছিল				
	চিন্তন ক্ষেত্রের সকল স্তরের প্রশ্ন করা হয়েছে				
মন্তব্য:					
ক্রমিক নং	মন্তব্য / উপাদান (ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য)	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
	যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে				
	সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে				
মন্তব্য:					
ক্রমিক নং	মন্তব্য / উপাদান (শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথষ্ক্রিয়া)	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
	শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট মতামত জানতে চেয়েছেন				
	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন				
	শিক্ষার্থীদের কৌতুহল পূরণে সক্ষম হয়েছেন				
	সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছেন				
	শিক্ষার্থীদের ভুলকে স্বাভাবিক ঘটনা গণ্য করে সঠিক তথ্য দিতে পেরেছেন				
	দলীয় কাজ/ জোড়ায় কাজ/ একক কাজ তথা শ্রেণি কার্যক্রম তদারক করেছেন				
মন্তব্য:					

ক্রমিক নং	মন্তব্য উপাদান (বিষয় সংশ্লিষ্ট)	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
	শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান				
	এই বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের আগ্রহ				
	বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন				
	শিক্ষার্থীদের উক্ত বিষয়ের চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন				
	বিষয়জ্ঞান যুগোপযোগী				
মন্তব্য:					

প্রশিক্ষণার্থীর কোন কাজটি খুব ভালো হয়েছে?

প্রশিক্ষণার্থীর কোন কাজটি সঠিক হয়নি? কীভাবে সঠিক করা যেত?

আপনার সুপারিশসমূহ :

ক্রমিক নং	পারদর্শিতা উপাদান	উন্নতি করতে হবে	সন্তোষজনক	খুব ভালো	বাস্তবায়িত হয়নি
	বিষয়জ্ঞানের পারদর্শিতা				
	শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক				
	পূর্ব পাঠ ও পূর্বজ্ঞানের সাথে সংযোগ স্থাপন				
	যথাযথ পাঠ ঘোষণা (বোর্ডে পাঠের শিরোনাম উল্লেখকরণ, পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবৃতকরণ)				
	শ্রেণি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা				
	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার				
	পাঠ উপস্থাপনায় পারদর্শিতা (শিক্ষার্থীদের সাথে দৃষ্টি বিনিময়, ক্লাসের মধ্যে হাঁটা, কঠিন বিষয়গুলো সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন)				
	শিক্ষকের কণ্ঠস্বরের উঠানামা ও মানভাষার ব্যবহার				

	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার				
	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করায় উৎসাহ প্রদান				
	শিক্ষার্থীদের প্রতি সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি				
	শিক্ষকের প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস				
	শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে মনিটরিং				
	শিক্ষকের একীভূত ও জেন্ডার নিরপেক্ষ মনোভাব				
	পাঠ শেষে শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়েছে				

সবল দিকসমূহ :

উন্নয়নের জন্য সুপারিশ :

টিকিউআই-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত শ্রেণি শিক্ষকের পাঠদান পরিবীক্ষণ চেকলিষ্ট

এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিকিউআই-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত শ্রেণিশিক্ষকের পাঠদান পরিবীক্ষণ চেকলিষ্ট এর একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলো। টিকিউআই-২ প্রকল্প শ্রেণিশিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রমকে প্রধান শিক্ষক/ একাডেমিক সুপারভাইজার/ সহকর্মী কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রণয়ন করে। এই চেকলিস্টে একটি শ্রেণিকক্ষের ১৮টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন শ্রেণিশিক্ষকের আচরণকে ১-৪ স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে ০১ হলো সর্বনিম্ন স্কোর ও ০৪ হলো সর্বোচ্চ স্কোর। এই চেকলিস্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষক শ্রেণিশিক্ষকের আচরণকে মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় মন্তব্য প্রদান করতে পারবেন।

একইভাবে এই চেকলিস্ট ব্যবহার করে একজন শিক্ষক স্বমূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে তাঁর আচরণকে পরিমাপ করতে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন ।

টিকিউআই-২ প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত শ্রেণি শিক্ষকের পাঠদান পরিবীক্ষণ চেকলিষ্ট

প্রয়োজনীয় ঘরে টিক (√) দিন।

মূল্যায়ন স্কেলঃ চমৎকার = ৪; খুব ভাল=৩; ভাল = ২; উন্নয়ন প্রয়োজন = ১

ক্র. নং	নির্দেশক	চমৎকার (৪)	খুব ভাল (৩)	ভাল (২)	উন্নয়ন প্রয়োজন (১)
পাঠদানের সূচনা পর্যায়					
১	পাঠের সূত্রপাত করা	আকর্ষনীয় মাথা খাটানো কাজ ও পাঠের পূর্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করে পাঠ ঘোষনা করেন এবং বোর্ডে বিষয়বস্তুর শিরোনাম লেখেন	পূর্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করে পাঠ ঘোষনা করেন এবং বোর্ডে বিষয়বস্তুর শিরোনাম লেখেন	বোর্ডে বিষয়বস্তুর শিরোনাম লেখেন তবে তা পাঠের পূর্বজ্ঞান জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নয়	বিষয়বস্তুর শিরোনাম লেখেন কিন্তু তা পড়া যায় না
২	পূর্ব পাঠ থেকে শিখনের পুনরালোচনা	শিক্ষার্থীকে দিয়ে পূর্ব পাঠের প্রাপ্ত ধারণা পুনরালোচনা করান এবং সে ধারণাকে বর্তমান বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত করেন	পূর্ব পাঠের ধারণা জানার জন্য ঐ বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন করেন	পূর্ব পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা আছে কিনা তাই শুধু জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন না	পূর্ব পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা আছে কিনা তা জিজ্ঞাসাও করেন না

ক্র. নং	নির্দেশক	চমৎকার (৪)	খুব ভাল (৩)	ভাল (২)	উন্নয়ন প্রয়োজন (১)
পাঠ উপস্থাপন পর্যায়					
৩	বিষয়বস্তুর ধারণা প্রদান	বিষয়বস্তু ব্যাখ্যাদানে বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ দেন এবং পাঠে বর্ণিত তথ্যের সম্পূরক হিসাবে স্থানীয় এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করেন এবং বর্তমান পাঠের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন	অতিরিক্ত তথ্য ও ধারণা দিয়ে পাঠে বর্ণিত তথ্যকে সমৃদ্ধ করেন	পাঠদানে কোন ভুলভ্রান্তি থাকে না তবে তা শুধু পাঠ্য বইকেন্দ্রিক হয়	পাঠদানের সময় মাঝে মধ্যে ভুল তথ্য প্রদান করেন
৪	প্রশ্ন করার কৌশল	উন্মুক্ত প্রশ্ন করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এসব প্রশ্নের সমাধান বের করে আনেন	উন্মুক্ত প্রশ্ন করেন তবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে প্রশ্নের সমাধান বের করে আনেন না	শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক প্রশ্ন করেন এবং তাও মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন	পাঠদানে শিক্ষার্থীকে সামান্যই প্রশ্ন করেন
৫	কথা বলার ধরন (উচ্চারণে স্পষ্টতা/কণ্ঠের উঠানামা)	শিক্ষক স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেন। কণ্ঠ উঠানামা করে এবং সব শিক্ষার্থীই কথা শুনতে পায়	অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শুনতে পায় তবে পিছনের সারির শিক্ষার্থীদের শুনতে অসুবিধা হয়	পরিষ্কারভাবে কথা বলেন, তবে স্বর এত নিম্ন যে কিছু শিক্ষার্থী শুনতে পায়না	পরিষ্কারভাবে শুনা কষ্টকর এমনকি শ্রেণির সামনের সারির শিক্ষার্থীরাও ঠিকমত শুনতে পায়না।
৬	উপকরণের ব্যবহার	যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করেন (স্বল্পমূল্য বা ব্যয়হীন উদ্ভাবনীমূলক উপকরণসহ) এবং শিক্ষার্থীদেরকে এসবের ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট করেন	উপকরণ ব্যবহার করেন তবে তা উদ্ভাবনীমূলক নয় এবং শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট করেন	মাঝে মধ্যে উপকরণ ব্যবহার করেন কিন্তু তা মূলত নিজে প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন	নামমাত্র উপকরণ ব্যবহার করেন
৭	ব্লাকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার	ব্লাকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড থেকে যেন শিক্ষার্থীরা ভালভাবে বুঝতে পারে সেজন্য বিভিন্ন রং এর চক/মার্কার ব্যবহার করে বোর্ডে লেখেন	শুধু সাদা চক/কালো মার্কার ব্যবহার করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বোর্ডে লেখেন	ব্লাকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ডে লিখেন বটে কিন্তু তা শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু বুঝতে সহায়ক হয় না।	ব্লাকবোর্ড/হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করেন কিন্তু লেখা পড়া যায় না / বোর্ড ব্যবহারই করেন না।
৮	শ্রেণি তদারকি	শ্রেণি তদারকি করে সব শিক্ষার্থীকে মনোযোগী রাখেন, শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল থাকে এবং শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করে	অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে মনোযাগী ও সুশৃঙ্খল রাখতে সমর্থ হন	তদারকি করেন তথাপি কিছু শিক্ষার্থী পাঠ বহির্ভূত কাজে লিপ্ত থাকে	শ্রেণি সুশৃঙ্খলার ব্যাপারে শিক্ষক উদাসীন
৯	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিদান	সকল ধরনের প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেন	অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দেন	শুধুমাত্র পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি দেন	শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি দেন

ক্র. নং	নির্দেশক	চমৎকার (৪)	খুব ভাল (৩)	ভাল (২)	উন্নয়ন প্রয়োজন (১)
১০	ছেলে ও মেয়েদের সাথে সমআচরণ	ভাষা ব্যবহার, প্রশ্ন করা, প্রশ্ন করতে দেওয়া ও মর্যাদাহানিকর শব্দ ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের সাথে সমআচরণ করেন	অধিকাংশ ছেলে ও মেয়েদের সাথে সমআচরণ করেন	মেধাবী,ভদ্র ও শান্ত ছেলে মেয়েদের সাথে ভাল আচরণ করেন	শুধুমাত্র মেধাবী ছেলে মেয়েদের সাথে ভাল আচরণ করেন
১১	পাঠ উপস্থাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ব্যবহার	সংশ্লিষ্ট ইমেজ, ভিডিও ক্লীপ, ডায়াগ্রাম,চিন্তামূলক প্রশ্ন সহ পাঠ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন	সংশ্লিষ্ট ইমেজ, ডায়াগ্রাম ও চিন্তামূলক প্রশ্ন সহ পাঠ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন	সংশ্লিষ্ট ইমেজ ও চিন্তামূলক প্রশ্ন সহ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন	পাঠ উপস্থাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহার করেন না
শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়ন					
১২	শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের পাঠের বোধগম্যতা যাচাই	শিক্ষার্থীদেরকে এমনভাবে চিন্তামূলক প্রশ্ন করেন যা বিষয় সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি এবং বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয়	শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানকৃত বিষয়বস্তুর সারমর্ম মূলক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন	শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়ভিত্তিক অল্প সংখ্যক জ্ঞানমূলক প্রশ্ন করেন	শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্ন করেন তবে তা শিখনফল অনুযায়ী নয়
শিক্ষকের পেশাদারিত্ব					
১৩	শিক্ষকের বেশভূষা	শিক্ষক পরিষ্কার এবং পেশা উপযোগী পোশাক পরেন	শিক্ষক পরিষ্কার পোশাক পরেন তবে তা পেশা উপযোগী নয়	শিক্ষক মোটামুটি পরিস্কার পোশাক পরেন কিন্তু তা পেশা উপযোগী নয়	শিক্ষকের বেশভূষার ব্যপারে শিক্ষকের সচেতনতা দরকার
১৪	শ্রেণিকক্ষে আচরণ	শিক্ষার্থীদের সাথে দৃঢ় কিন্তু বন্ধুসুলভ আরচণ প্রদর্শন করেন	শিক্ষার্থীদের সাথে কিছুটা দৃঢ় এবং বন্ধুসুলভ আরচণ করেন	আচরণে দৃঢ়তা কম এবং ততটা বন্ধুসুলভ নয়	শ্রেণিকক্ষে আচরণের ব্যাপারে শিক্ষকের সচেতনতা প্রয়োজন
১৫	পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন	উত্তম মানের পাঠ পরিকল্পনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন	পাঠ পরিকল্পনা করেন তবে হাতে-কলমের কাজ দেন না	পাঠ পরিকল্পনা করেন তবে শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করেন	পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদেরকে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা থাকে না
শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা					
১৬	শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষককে প্রশ্ন করা	সব ধরনের শিক্ষার্থীই তাদের চাহিদা পূরনে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়	অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার সুযোগ পায়	শুধুমাত্র ভাল শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার সুযোগ পায়	শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করতে ভয় পায়
১৭	একক কাজ/ /জোড়ায় কাজ /দলীয় কাজ	সব শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করে	অধিকাংশ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে	স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে	শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে শিক্ষক উদাসীন

ক্র. নং	নির্দেশক	চমৎকার (৪)	খুব ভাল (৩)	ভাল (২)	উন্নয়ন প্রয়োজন (১)
১৮	শিক্ষার্থীর ব্লাকবোর্ড/ হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার	শ্রেণির সব অংশ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে বোর্ডে লেখানো হয়	শ্রেণির অধিকাংশ অংশের শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে বোর্ডে লেখানো হয়	শ্রেণির একটি বা দুটি অংশের শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে বোর্ডে লেখানো হয়েছে	শিক্ষার্থীকে দিয়ে বোর্ডে কিছু লেখানোর ব্যপারে শিক্ষক উদাসীন

উক্ত চেকলিস্টের আলোকে একজন শিক্ষকের শ্রেণিকার্যক্রম মুল্যায়নের একটি নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হলো-

Name of Month: ____

Name of Institution:_________________________Upazila: _______________District: _________

Name of HT/ USEO/AS: _________________________________

Total No. of Teacher monitored: _________Male_______ Female_________

S.I.	Indicators	Excellent (4)	Very Good (3)	Good (2)	Needs Improvement (1)
Lesson Start					
1	Lesson Start	X			
2	Recapitulation of previous lesson		X		
Lesson Presentation					
3	Conception on subject matter	X			
4	Techniques of questioning		X		
5	Clarity of voice (Pronunciation/ dialect / accent)			X	
6	Use of teaching aid		X		
7	Use of black board / white board		X		
8	Facilitation of classroom activities	X			
9	Attention on special need child	X			
10	Equal behavewithBoys and girls	X			
11	Use of ICT in lesson presentation	X			
Evaluation of achieved Learning outcome					
12	Assess achieved learning outcome			X	
Teachers Professionalism					
13	Teacher's dress	X			
14	Teachers behaviour in the classroom	X			
15	Formulation of Lesson plan				X
Student activeness					
16	Ask question to teacher		X		
17	Engage in Individual work/pair work/group work		X		
18	Use of black/white board by the student		X		
	Total Score	**32**	**21**	**4**	**1**

Total Score=58

Remarks of the Monitor: Teacher's teaching performance rating was 58 out of 72, means performance is good.

Signature of the HT/ USEO/ AS: _____________________________________

Date of Reporting: ____

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রতিফলন দিনলিপি কী?

২. চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা দূর করার উপায় কী?

৩. বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

৪. পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

৫. পেশাগত শিখন সমাজ এর ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাঠদান অনুশীলন জার্নালের রূপরেখা তৈরি করুন।

২. চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের অনুপস্থিতিতে একজন নতুন শিক্ষক কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন তার তালিকা তৈরি করুন ।

৩. একটা নমুনা প্রতিফলন দিনলিপি তৈরি করুন ।

৪. একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি ক্লাসরুম পর্যবেক্ষণে কোন কোন দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন তার তালিকা তৈরি করুন ।

৫. ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত ফ্রেমওয়ার্কটি ব্যাখ্যা করুন।

৬. পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৭. পেশাগত শিখন সমাজ এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

হোসেন, শেখ আমজাদ ও রহমান, মোঃ মুজিবুর, শিখন-শেখানো দক্ষতা ও কৌশল, বাংলাবাজার, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, মে ২০১৭।

শাহ,ডি.এম. ফিরোজ, মাধ্যমিক শিক্ষা, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ মিতা ট্রেডার্স, মার্চ, ২০১৭।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর, মাধ্যমিক শিক্ষা, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, মার্চ, ২০১৭।

মালেক, মরিয়ম, ইসলাম ও রিয়াদ, শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা, ঢাকাঃ র‍্যামন পাবলিসার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৬।

রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা,৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, এপ্রিল,২০১০।

হোসেন, শেখ আমজাদ, জেণ্ডার স্টাডিজ, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০১০।

হোসেন,শেখ আমজাদ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা , ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০০৯।

ইসলাম, মোঃ সিরাজুল;জামান, কামরুজ ও হোসেন, মোঃ আইউব, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, ২৬ বাংলা বাজার, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, জুলাই, ২০০৬।

হোসেন, শেখ আমজাদ ও মনিরুজ্জামান, মোঃ, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ মিতা ট্রেডার্স বুক এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, আগষ্ট,২০০৬।

নূরনবী, মোহাম্মদ; ফওজিয়া ও চম্পা, লাইলা পারভীন, শিক্ষাদর্শনের কথা, ৩৮/২ বাংলাবাজার,ঢাকাঃ চয়নিকা, প্রথম প্রকাশ মে/২০০৬।

রহমান, মোঃ মুজিবুর, শ্রেণি পাঠদানের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকাঃ প্রভাতী লাইব্রেরী, মার্চ,২০০৫।

রায়, সুশীল, *শিক্ষণ ও শিক্ষা প্রসঙ্গ*, কলিকাতা:সোমা বুক এজেন্সি, ২০০৫।

আহমদ, মোঃ রমিজ উদ্দীন; রহমান, মোঃ মফিজুর ও হোসেন, মোঃ মোশাররফ, শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন, ঢাকাঃ স্মৃতি প্রকাশনী, ২০০৫।

মিয়া ,ওহাব, এম এ , শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন, ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

রায়, সুশীল, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, কলিকাতাঃ সোমা বুক এজেন্সি, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ২০০১।

খান, মোঃ লুৎফর রহমান; মালেক, আব্দুল ও বেগম, প্রফেসর রওশন আরা (সম্পাদনায়), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ, ঢাকা: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ২০০০।

রায়,সুশীল, শিক্ষণ ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ, কলিকাতাঃ সোমা বুক এজেন্সী, ২০০০।

এহসান, ড. মোঃ আবুল ও আখতার, সৈয়দা তাহমিনা ,রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষণ, ঢাকা: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, জুন ২০০০।

আলী,এম, এইচ, শিক্ষণে জীববিজ্ঞান, ৬৩ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত , ঢাকা-১২০৫ঃ প্রভাতী লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০০০।

মুত্তাকী,ইকবাল আজিজ ও আরা, কাজী আফরোজ জাহান, জীববিজ্ঞান শিক্ষণ, ঢাকা:মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, জুন ২০০০।

শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা,২০০০।

এহসান, মোঃ আবুল , শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ নীতি ও পদ্ধতি, ঢাকা:ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি, ১৯৯৭।

চৌধুরী, রওশন আরা, শিক্ষা প্রশাসনের মূলনীতি, ঢাকা:১৯৯৭।

চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী, সুশিক্ষক, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩।

Gopsil, G.H., Teaching of Geography , Patna: Machmillan India Ltd.,1994.

Martine, Barbara & Briggs, Leslie. J, The Affective and Cognitive Domains: Integration for Instruction and Research, New Jersey: Educational Technology Publication, 1986Henriksen, A. B. (2010).

সহায়ক ম্যানুয়াল, মডিউল, রিপোর্ট, প্রবন্ধ, জার্ণাল, পত্রিকা ও ওয়েবসাইট

আহমেদ, ফারুক, একুশ শতকের শিখন দক্ষতা, ঢাকাঃ এটুআই, ২০১৭

বাশার, মোঃ আবুল, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষকের দক্ষতা, ঢাকাঃ দৈনিক সংবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

মাওলানা হোসেন আলী, ধর্ম ও জীবন, এনটিভি সামাজিক নেটওয়ার্ক, ঢাকাঃ ২৪ জুলাই, ২০১৭।

শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা , বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকবোর্ড, বাংলাদেশ, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, ২০১৬।

শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য , অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, ২০১৬

হক,নাজনীন আফরোজ; করিম, শেখ মোঃ রেজাউল; বাশার, মোঃ আবুল; ওয়াহিদুজ্জামান, মোঃ ও মাহমুদ, মোঃ শাহাবুদ্দীন, শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা, ভূগোল ও পরিবেশ, নবম ও দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকাঃ প্রথম প্রকাশ- মে, ২০১৬।

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ঢাকাঃ টিকিউআই-২ ইন সেকেণ্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জুন-২০১৬ ।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকগদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলা, ঢাকা:টিকিউআই-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জুন- ২০১৬।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সবোর্ড বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকাঃ জানুয়ারী-২০১৫।

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকাঃ টিকিউআই-২, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এপ্রিল-২০১৫।

মাওলানা হোসেন আলী, মূল্যবোধের প্রথম সোপান বিশ্বাস, এনটিভি সামাজিক নেটওয়ার্ক, ঢাকাঃ ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ঢাকা: বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ), সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, আগস্ট ২০১৪।
মূল্যবোধে জীবন গঠন, নর্থব্রুক হল রোড, ৪২০ বাংলাবাজার, ঢাকা: একুশে বইমেলা , ২০১৪।
বাশার, মোঃ আবুল, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ নিয়ে কথা, ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ১৫ জুন ২০১৩।
জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২,জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ২০১২।
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা, ২০১০।
বাশার, মোঃ আবুল, মাধ্যমিক স্তরের সৃজনশীল প্রশ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সুচিন্তিত ও সমন্বিত পরিকল্পনা, সিলেট: দৈনিক যুগভেরী, ২০ জানুয়ারী ২০১০।
বানু, সেলিনা; মরতুজা, এ.এস.এম গোলাম; আখতার, শিরীন ও বাশার, মোঃ আবুল; আখতার, প্রফেসর সালমা ও মালেক, আব্দুল (সম্পাদনায়), সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ (প্রশিক্ষক নির্দেশিকা),ঢাকা: টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ২০০৮।
হোসেন , মনিরা; সুলতানা, নাসরিন জাকিয়া; মহসীন, মোঃ ; রহমান, মোঃ মুজিবুর, আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা-মডিউল-১,২,৩ ও ৪ (প্রশিক্ষক নির্দেশিকা), ঢাকা: টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ২০০৮।
সিপিডি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ, ঢাকা:টিকিউআই-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮।
বাণিজ্যিক ভূগোল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল , ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষণ, ঢাকা:টিকিউআই-২ ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮।
রায়, ডক্টর সত্যব্রত, মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ: সাধারণ বিজ্ঞান ম্যানুয়েল, ঢাকা, ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট: দ্বিতীয় পর্যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা, মার্চ ২০০৪।
মালেক, আব্দুল ও আসফা বানু, *প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল*, শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামুলক শিক্ষা, হায়ার সেকেন্ডারী এডুকেশন প্রজেক্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৫।

10 Ways to encourage good Questions: https://whatedsaid.wordpress.com/2010/10/10/10-ways-to-encourage-good-questions/
Effective Questioning and Classroom Talk:http://www.nsead.org/downloads/Effective_Questioning&Talk.pdf

https://teaching.uncc.edu/sites/teaching.uncc.edu/files/media/files/file/InstructionalMethods/HigherOrderActivities.pdf
https://theinspiredclassroom.com/2013/11/how-to-encourage-your-pupils-to-ask-more-questions/
https://www.keansburg.k12.nj.us/cms/lib/NJ01001933/Centricity/Domain/63/Strategies%20for%20Effective%20Lesson%20Planning%20copy.pdf

Lower Secondary Teacher Guide, Social Science, Department of Education,Papua New Guinea,2006.

Teaching approaches: Questioning: http://oer.educ.cam.ac.uk/wiki/Teaching_Approaches/Questioning
https://tccl.arcc.albany.edu/knilt/index.php/UNIT_1-What_are_Advance_Organizers_and_why_do_we_use_them%3F

Student ownership: Learning in a student-centered art room. Retrieved from https://ecampus.phoenix.edu/classroom/ic/library.aspx